যশোর জেলার লোকসংগীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ

দেবপ্রসাদ দাঁ

মে, ২০১৮
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

যশোর জেলার লোকসংগীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

গবেষক

দেবপ্রসাদ দাঁ

পিএইচ.ডি

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৬৫

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-১৪

সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা

অধ্যাপক

সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক

ড. এম মতিউর রহমান

অধ্যাপক

দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, **যশোর জেলার লোকসংগীত** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব রচনা। আমার জানা মতে এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে কোনো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি। অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য রচিত। এই গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

(দেবপ্রসাদ দাঁ)
পিএইচ.ডি
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৬৫
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-১৪
সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

DEPARTMENT OF MUSIC
UNIVERSITY OF DHAKA
Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: PABX 9661900-73/6406, Fax: 880-2-9667222, E-mail: chairmusicdu@yahoo.com

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, **দেবপ্রসাদ দাঁ** (রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৬৫, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-১৪, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক উপস্থাপিত **যশোর জেলার লোকসংগীত** শীর্ষক পিএইচ.ডি পর্যায়ের গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ কোথাও মুদ্রিত হয়নি এবং গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য ইতঃপূর্বে উপস্থাপন করেননি।

(ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

DR. M. MATIUR RAHMAN
PROFESSOR
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA- 1000, BANGLADESH

ডক্টর এম. মতিউর রহমান
বি.এ. অনার্স, এম.এ. (ঢাকা)
পিএইচডি. (রবীন্দ্রভারতী)
পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো (বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন)
দর্শন-শাস্ত্রী (সংস্কৃত প্রজ্ঞামহাবিহার, কলি:)
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

Phone : PABX 9661900-59/6258,6240; Res : 861-4617; Cell: 01720-484848, 01980-484848, Fax : 880-2-8615583; E-mail : phil@bangla.net

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, **দেবপ্রসাদ দাঁ** (রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৬৫, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-১৪, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক উপস্থাপিত **যশোর জেলার লোকসংগীত** শীর্ষক পিএইচ.ডি পর্যায়ের গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার যুগ্ম-তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ কোথাও মুদ্রিত হয়নি এবং গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য ইতঃপূর্বে উপস্থাপন করেননি।

(ড. এম মতিউর রহমান)
গবেষণা যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

প্রসঙ্গকথা

প্রত্যেকটি গবেষণায় কোনো না কোনো ভাবে নতুন কিছু উদ্ভাবনের লক্ষ্যে করা হয়ে থাকে। 'যশোর জেলার লোকসংগীত' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি তেমনই একটি বিষয়। যা এই জেলার বিলুপ্ত প্রায় এবং নতুন কিছু লোকসংগীত সম্পর্কে সর্ব সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে দেশের সংস্কৃতি বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এবং সংগীতানুরাগী শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। জন্ম সূত্রে যশোর জেলার মানুষ হিসেবে জেলার লোকসংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে আমার এই প্রচেষ্টা।

এবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পালা। প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সংগীত বিভাগের প্রাক্তন সভাপতি এবং এই গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা এবং যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. এম মতিউর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক মহোদয়ের প্রতি। যাদের তত্ত্বাবধান ও সার্বক্ষণিক পরামর্শ আমার এ গবেষণাকর্মে প্রাণ সঞ্চার করেছে।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার সহকর্মীদের প্রতি যারা সর্বক্ষণ কাজের জন্য উৎসাহিত করেছেন। যেসকল সহকর্মী বই দিয়ে সহযোগিতা করেছেন— জনাব আজিজুর রহমান তুহিন, জনাব এনামুল হক। বিশেষ কৃতজ্ঞতা ড. তপন কুমার সরকার যিনি বই দিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন এবং মাঠ পর্যায়ের কাজেও সহযোগীতার হাত বাড়িয়েছেন। কৃতজ্ঞতা আমার শুভানুধ্যায়ী সংগীত বিভাগের সেমিনার এবং অফিস কর্মকর্তাদের প্রতি। আমার সকল কাজের সহযোগিতা ও উৎসাহ দানে যার অক্লান্ত শ্রম সহধর্মিণী প্রীতি রানী ঘোষ তার প্রতি শুভেচ্ছা। সব সময় সকল ভালো কাজে যিনি প্রতিনিয়ত উৎসাহ দান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য জনাব বাহালুল মজনুন চুন্নু ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা। জগন্নাথ হল পরিবারের প্রাধ্যক্ষসহ সহকর্মী আবাসিক শিক্ষকবৃন্দের প্রতি শুভেচ্ছা এবং বিশেষ কৃতজ্ঞতা ড. মলয় বালাকে।

মাঠপর্যায়ের কাজে যারা সাথে থেকে সহযোগিতা করেছেন— অলোক কুমার বসু, বিশ্বজিৎ বৈরাগী, প্রবীর দেবনাথ, বাবু সুপ্রীতি রঞ্জন শিকদার এবং কৃষ্ণ রায় সহ লোকশিল্পীবৃন্দ, বিশেষভাবে যে সকল গুণীজনের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কাজগুলি তথ্য নির্ভর হয়ে উঠেছে তাদের প্রতিও রইলো অশেষ কৃতজ্ঞতা।

ধন্যবাদ জানাই সুশান্ত কুমার শীলকে যিনি অভিসন্দর্ভটি কম্পিউটার কম্পোজ ও সুসজ্জিত করেছেন। অভিসন্দর্ভটি সুসংগঠন কালে শব্দ এবং বানানগত বিষয়ে শতচেষ্টা ও পরিশ্রমকে ছাপিয়ে প্রমাদজনিত ভুল যদি দৃষ্টিগোচর হয় তার জন্য নত মস্তক।

সূচিপত্র

ভূমিকা ৭

প্রথম অধ্যায় : যশোর জেলার উদ্ভব ও বিকাশ ১০

দ্বিতীয় অধ্যায় : যশোর জেলার লোকসংগীতের ধারা ১৯-৮৯

প্রথম পরিচ্ছেদ : বালা গান ২০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অষ্টক গান ২৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কবিগান ৩৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জারিগান ৪৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বাউল গান ৫৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : জাগগান ৬১

সপ্তম পরিচ্ছেদ : হালই গান ৬৬

অষ্টম পরিচ্ছেদ : যাত্রাগান ৭২

তৃতীয় অধ্যায় : সুরবৈশিষ্ট্য ৯১

চতুর্থ অধ্যায় : যশোর জেলার লোকসংগীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র ১০৪

পঞ্চম অধ্যায় : যশোর জেলার উল্লেখযোগ্য লোককবি ১১৭

উপসংহার ১৪৩

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ১৪৪

পরিশিষ্ট ১৪৮-২২৭

পরিশিষ্ট ১ ॥ আলোকচিত্র ১৪৯

পরিশিষ্ট ২ ॥ সংগৃহীত গান ১৬১

পরিশিষ্ট ৩ ॥ গান ও স্বরলিপি ২১১

পরিশিষ্ট ৪ ॥ সাক্ষাৎকার ২২০

ভূমিকা

শ্যামল প্রকৃতির রূপ-রসে আকৃষ্ট হয়ে গ্রাম বাংলার স্বশিক্ষিত কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী সমাজের মঙ্গল কামনায় বিভিন্ন উৎসব পার্বণাদি সংঘটন করেছে। সংগীতই এই উৎসব পার্বণকে সুরারোপে প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম। আধুনিক মনস্কতার ভাবধারায় পরিচালিত নয় এমন একটি গীতরীতিই লোকসংগীত। যা স্বশিক্ষিত কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবী জনমানস দ্বারাই সৃষ্ট।

সংগীতের মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। গ্রামবাংলার সংস্কৃতির নানা উপকরণে গঠিত হয় লোকসংগীত। সেজন্য এর বিষয় বৈচিত্র্য অনেক। বাংলাদেশে প্রায় শতাধিক প্রকার লোকগীতি প্রচলিত ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, জারিগান, আনুষ্ঠানিক গীতি, কবিগান, সারিগান, বাউল গান, ধুয়া গান, গম্ভীরা গান, ঝুমুর গান, বারাসে (বারোমাসী) গান, পাঁচালি, পটুয়া গান (পট চিত্রের গান), জাগগান, মেয়েলিগীত, বিয়ের গান, মুর্শিদি, মারফতি, মাইজভান্ডারি গান, গাজীর গান, আলকাফ গান, কৃষি সংগীত, চটকা গান, বৃষ্টির গান, বেদের গান, সাঁওতালি গান, নাটুয়াগীতি, অষ্টক গান, বালা গান, কাদামাটির গান, মান্দার গীত, মতুয়া গান, বাওয়ালীর গান, ভজন গান, এ্যাঁচড়া পূজার গান, পৌষ সংক্রান্তির গান, লক্ষ্মীর পাঁচালি গীত, ধান ভানার গীত, শাড়ী গান, আগমনী গীত, মানিকপীরের গান, ভাব গান, কীর্তন গান, রামায়ণ গান, দেহতত্ত্ব গান, ছাদ পিটানোর গান, চিড়া কোটার গান, পিঠে তৈরির গান, নৌকা বাইচের গান, পুতুল বিয়ের গান, ত্রিনাথ ঠাকুরের মেলার গান, হালই গান, এছাড়াও রয়েছে নানা ধরণের আঞ্চলিক গান যা আজও গ্রাম বাংলার লোকসংস্কৃতিকে করে চলেছে সমৃদ্ধ ও বেগবান।

মানুষ আর গান, গান আর মানুষ এই নিয়েই যেন বাংলাদেশ। বাংলার লোকগানের ভাইণ্ডারে রয়েছে নানা ধরনের গান। সে গানের কিছু প্রচলিত আবার কিছু অপ্রচলিত। কিছু কিছু আবার বিলুপ্ত প্রায়। গানের সুরের ভিতর দিয়েই এদেশের পরিচয় মেলে। পূর্বোল্লিখিত গানগুলো ছাড়াও অনেক গান রয়েছে। যেমন: ছড়া গান, বিচার গান, সয়লা, রসিক গান, বৈঠকী গান, সুরেশ্বরী গান, পালকিওয়ালেদের গান, ফসল কাটার গান, নবান্নের গান, গারোদের গান, চাকমাদের গান, মামা গান, মণিপুরী সংগীত, বারাসীয়া মৈসালের গান, বেরাগ গুরু, জাগ পাঁচালি, মূল পাঁচালি, ছড়া পাঁচালি, ফুলের নাচের গান, গাড়োয়ানী গান, খড় গীত, গোসাই গানা, মনোশিক্ষা গান, গোষ্ঠের গান, খৎনার জারি, বিড়ালী গান, খেপু বয়াতীর গান, গানের যেন আর শেষ নেই। আবহমানকাল ধরে এ গান চলে আসছে আর অনন্তকাল ধরে নদীর ধারার মতোই এ গান বয়ে চলতে থাকবে।

এবারে আসা যাক গবেষণা পত্রের আলোচনায়। প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে যশোর জেলার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে তথ্যাদি। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে জেলার ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, জনসংখ্যা ও সংগীতাঞ্চল সহ সকল উপজেলার অবস্থান। দ্বিতীয় অধ্যায় যশোর জেলার লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারা। এই জেলার যে সকল গান আজ বিলুপ্তির পথে সে সকল গান নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি পরিচ্ছেদানুক্রমে

সাজানো হয়েছে। এ গবেষণার মাধ্যমে উঠে এসেছে যশোর জেলার অন্যতম গান যথা — বালা গান, অষ্টক গান, কবিগান, জারিগান, বাউল গান, জাগগান বা জাগরণের গান, হালই গান এবং যাত্রাগান বা যাত্রাপালা। যা বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিতে এক নতুন মাত্রার সৃষ্টি করবে বলে আমার বিশ্বাস। তৃতীয় অধ্যায় উল্লিখিত গানের সুরবৈশিষ্ট্য। চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে যশোর জেলার লোকসংগীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের নামসহ গঠন প্রণালী। পঞ্চম অধ্যায় যশোর জেলার উল্লেখযোগ্য লোককবিদের জীবনী ও সাংগীতিক অবদান সম্পর্কে আলোচনা। উপসংহারে আলোচনা করা হয়েছে উল্লিখিত গবেষণা থেকে প্রাপ্ত বিষয় বা গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। গবেষণা কাজে ব্যবহৃত পুস্তক নিয়ে রয়েছে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি এবং পরিশিষ্টে রয়েছে সংগৃহীত গান, গানের স্বরলিপি, মাঠপর্যায়ে কাজের আলোকচিত্র ও সাক্ষাৎকার।

গবেষণা পদ্ধতি ও লক্ষ্য: 'যশোর জেলার লোকসংগীত' শীর্ষক গবেষণাধর্মী অভিসন্দর্ভ বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে উপস্থাপন করা হয়েছে। মূলত এই জেলার লোকসংগীত কতটা সমৃদ্ধ তা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে আমার এ গবেষণা। বিভিন্ন মতামতের উপর ভিত্তি করে এ কাজটি উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণা প্রক্রিয়া: গবেষণায় কিছু সংখ্যক বই ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ পূর্বক উপস্থাপন করা হয়েছে। যশোর জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করেছি যা ভবিষ্যতে এই জেলা সম্পর্কে বিশেষ ধারণা সাধারণের মাঝে জ্ঞান সঞ্চার করবে এবং সংস্কৃতির ধারায় যশোর জেলা আলাদা স্বীকৃতি স্বরূপ বিরাজমান থাকবে।

গবেষণাকর্মের সীমাবদ্ধতা: সময় ও আর্থিক দিক বিবেচনা করে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে গবেষণার বিভিন্ন অংশের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সময় স্বল্পতা ও তথ্য সংগ্রহের অভাবে অনেক সময় সাপেক্ষ কাজটিতে হয়তো অনেক কিছু উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি, তবে সংক্ষিপ্তভাবে বেশকিছু তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে যা পূর্বে নামমাত্র ছিলো। একটি জেলার সংগীত সম্পর্কে আলোচনা করতে যে পরিমাণ পুস্তকের প্রয়োজন হয় তা এক্ষেত্রে পাওয়া কঠিন। কারণ এ জাতীয় কাজ ইতঃপূর্বে না হওয়ায় অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়েছে সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকারের ওপর। তাছাড়া দারিদ্রতার মুখোমুখি বসবাসরত মানুষের কাছ থেকে অর্থ ছাড়া তাদের সাক্ষাৎকার সময় নিয়ে গ্রহণ করা খুবই কঠিন। এ সকল প্রতিকূলতার মাঝে যেটুকু উপস্থাপন করা হলো তা আগামী দিনের সংগীতানুরাগীদের উপকারে আসবে এবং আগামী দিনের গবেষকরা উৎসাহিত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। যশোর জেলার লোকসংগীত বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বেশির ভাগ সময় যে প্রশ্নের সম্মূখীন হতে হয়েছে সেটি হলো, কাজটি কি নিয়ে? অর্থাৎ বৃহত্তর যশোর, না বর্তমান যশোর জেলা? প্রশ্নের উত্তরে বলি — বৃহত্তর যশোরকে ব্যতিরেকে বর্তমানকে নিয়ে লোকসংগীত বিষয়ে তথ্যবহুল কাজ করা অসম্ভব। সেজন্য বর্তমান যশোরকে এবং পূর্বের বৃহত্তর যশোরকে একত্রিত করে কাজটি করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

যশোর জেলার উদ্ভব ও বিকাশ

বিভিন্ন উৎসব পার্বণের মধ্য দিয়ে লোকসংগীতের উদ্ভব ঘটলেও ভাবগত বিষয়টি এসেছে সহজ সরল গ্রাম্য মানুষের কাছ থেকে যা তার মনের আকুতির বহিঃপ্রকাশ। স্বশিক্ষিত মানুষের জীবনের কথাগুলি সুরের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে একটি পর্যায়ের সৃষ্টি করেছে। তার ভাষা ও সুরের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটেছে সমাজ জীবনের সকল চিত্র। আর এসবের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে লোকসংগীতের। সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিকতা যা প্রত্যেকটি অঞ্চলকে আলাদা করে চিনতে, জানতে বা বুঝতে সহযোগিতা করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতাকে সামনে রেখে বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন জেলা যশোর এর লোকসংগীত সম্পর্কে আলোচনা করছি।

প্রত্যেকটি জেলার নিজস্ব পরিচিতি, তার উদ্ভব, বিকাশ সম্পর্কে রয়েছে নানা ইতিহাস। লোকসংগীতের বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে যে জেলার লোকসংগীত নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে সে জেলা সম্পর্কে পরিচিতি অত্যাবশ্যক। একটি অঞ্চলের নিজস্ব কিছু সংস্কৃতি রয়েছে যা দ্বারা সে অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, মানুষ ও তাঁদের সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি বোঝা বা জানা সম্ভব। তেমনিভাবে যশোর জেলার লোকসংগীত সম্পর্কে জানার পূর্বে সে জেলার জন-জীবন ও ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে জানলে তার সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশের নদ-নদী যেমন বিস্তৃত তেমনি ভাবে এদেশের লোকসংগীতের ভাণ্ডারও বিস্তৃত। এই বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে নানা রহস্য। কারণ, প্রত্যেকটি অঞ্চলের সংস্কৃতির সংমিশ্রণের মাধ্যমে ভরে উঠেছে সংগীতের ভাণ্ডার। আর এরই মধ্যে রয়েছে অনেক বিলুপ্ত সংগীত। রয়েছে প্রচলিত অপ্রচলিত গানের সম্ভার। বাউল কবি লালন শাহ্'র একটি বাণীতে পাওয়া যায়——

'এক দেশে যা পাপ গণ্য অন্য দেশের বুলি তাই,
পাপ পুণ্যের কথা আমি কারে বা সুধাই॥'

অর্থাৎ এক দেশের ভাষা অন্য দেশের কাছে যেমন বোধ্য নয়, তেমনি এক জেলার সংস্কৃতি অন্য জেলার কাছে ভিন্ন মনে হয়। আর এ দূরত্বের কারণ লোকজ ভাষা, লোকসংস্কৃতি সব কিছুই পরিবর্তীত হয় প্রতি ৪ থেকে ৫ মাইল দূরত্বে। এ জন্য বাংলাদেশের লোকসংগীতের প্রকৃতি বিশাল এক পরিমণ্ডলের পটভূমি হিসেবে চিত্রিত। সংগীত এ গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক পরিকাঠামো, উদ্ভব ও বিকাশের কথকতা এখানকার মানুষের জীবনাচরণ সম্পর্কে জানান দেয় যা সাংগীতিক ক্রমবিকাশের পূর্ব কথা। সেজন্য এ জেলার উদ্ভব ও বিকাশ এবং ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র: যশোর জেলার মানচিত্র[১]

Dhaka University Institutional Repository

১.১ ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশ নদীবহুল একটি দেশ। এদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের একটি অংশ যশোর জেলা নামে পরিচিত। পূর্বে যশোর-খুলনা যুক্ত জেলা হলেও সময়ের আবর্তে তা পরিমাপের দিক থেকে ছোটো ও পৃথক হয়েছে ঠিকই কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানে সামাজিক প্রেক্ষাপট একই রয়ে গেছে। আর তারই ধারাবাহিকতায় সংগীত তার কোনোরূপ বৈপরীত্ব সাধন করেনি। সুরের ধারা এ বঙ্গ থেকে ও বঙ্গ তথা মহীমণ্ডলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বজ্রসম গর্জনের ন্যায় ভেসে বেড়ায়। যশোর ভূ-খণ্ডের সংগীতায়োজনেও এর ব্যত্বয় হয়নি। আদিতে 'যশোহরে ৫টি উপবিভাগ (১) যশোহর সদর, (২) মাগুরা, (৩) ঝিনাইদহ, (৪) নড়াইল ও (৫) বনগ্রাম'[২] ছিলো। পূর্বের যশোরকে সময়ের পরিক্রমায় শাসন কার্যের সুবিধার্থে অদৃশ্য সীমায় বিভক্ত করা হলেও সুরের মূর্ছনা এই সীমায় কোনোরূপ বাধা প্রাপ্ত হয়নি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই ভূ-খণ্ডের মানুষের আচার-ব্যবহার তথা নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্ত আয়োজনই পূর্ব ধারায় প্রবাহিত। সীমারেখার দিক থেকে 'বৃহত্তর যশোর জেলার উত্তরে কুষ্টিয়া, দক্ষিণে খুলনা, পূর্বে ফরিদপুর জেলা ও পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ।'[৩] সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী বর্তমানে এ জেলার আয়তন '২,৬০৬.৯৪ বর্গ কিমি.। এর মধ্যে ১৫৬ বর্গ কিমি. নদী এলাকা। জনসংখ্যা ২৭,৬৪,৫৪৭ জন (সমীক্ষা আদমশুমারী ২০১১)।'[৪] 'এই জেলার পৌরসভা ৪টি, উপজেলা ৮টি, ওয়ার্ড ৩৬টি, ইউনিয়ন ৯২টি, মৌজা ১৪৭১টি, গ্রাম ১৪৩৪ টি, মহল্লা ১২০টি। যে ৮টি উপজেলার সমন্বয়ে যশোর জেলা গঠিত সেগুলো হলো অভয়নগর, বাঘারপাড়া, চৌগাছা, ঝিকরগাছা, কেশবপুর,যশোর সদর, শার্শা, ও মনিরামপুর।'[৫]

১.২ নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

যশোর অতি প্রাচীন জনপদ। অনেক ঐতিহাসিকের মত অনুযায়ী এ জনপদের প্রাচীন নাম মুড়লি। 'মুড়লি শব্দের আভিধানিক অর্থ উঁচু স্থান।'[৬] সূর্যদ্বীপ হিসেবে সমতট অঞ্চলের এ এলাকাটি প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্থান, নাম এবং অধিবাসীদের বিবর্তন ঘটেছে। 'পরিব্রাজক হিয়েন-সাঙ ভারত ভ্রমণের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে যশোরকে বলা হয়েছে রাজ্যের রাজধানী।'[৭] কথিত আছে— গৌড়ের যশ হরণ করে রাজা প্রতাপাদিত্য এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে এ জনপদের নাম 'যশোহর'। কালের স্রোতে তা 'যশোর' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। 'খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দু'শতক পূর্বে উপবঙ্গে গড়ে ওঠে আর্য বসতি। তন্ত্রচূড়ামণিতে উল্লেখ করা হয়েছে চণ্ডভৈরবের তীরে যশোর অবস্থিত। লেখক চলনলাল Cradle of Civilization নামক সাম্প্রতিক এক গবেষণাপত্রে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে উল্লিখিত হয়েছে, Zasor নামটি এসেছে মিসর থেকে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে ভৈরব নদের তীরে তারা বসতি স্থাপন করে।'[৮] তৎসময়ে যারা বসতি স্থাপন করেছিলেন সম্ভবত তারাই এর নামকরণ করেন Zasor। '১৯৪৭-এর ভারত পাকিস্তান বিভক্তি পূর্ব পর্যন্ত দ্বিগঙ্গা

ছিলো যশোরের একটি জনপদ। বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের প্রাচীন জনপদের যে ক'টি এখনও কালের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে তার মধ্যে যশোর অন্যতম একটি।'[৯]

লোকসংগীতাঞ্চলের দিক থেকে সংক্ষেপে যশোর জেলার উপজেলা সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১.৩ যশোর সদর উপজেলা

জারিগান, বাউল গানসহ সব ধরনের লোকগান এখানে গীত হয়ে থাকে। তবে এ উপজেলায় হালই গানের প্রচলন বেশি দেখা যায়। মানুষের প্রধান পেশা কৃষি হলেও এখানে রয়েছে একটি ক্ষুদ্র শিল্পনগরী। ভৌগোলিক অবস্থান — ২৩°০৪ থেকে ২৩°২০ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯°০৬ থেকে ৮৪°০৬ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। উপজেলার সীমানা — উত্তরে ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলা এবং যশোর জেলার বাঘার পাড়া উপজেলা; পূর্বে নড়াইল সদর উপজেলা ও যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলা; দক্ষিণে যশোর জেলার মনিরামপুর ও অভয়নগর উপজেলা এবং পশ্চিমে যশোর জেলার চৌগাছা ও ঝিকরগাছা উপজেলা।

১.৪ বাঘারপাড়া উপজেলা

সংগীতাঞ্চল হিসেবে বাঘারপাড়া তেমন প্রসিদ্ধ নয়। তবে, প্রচলিত গানগুলো এখানে দৃশ্যত। নির্দিষ্ট কোনো ধারা এখানে লক্ষ্য করা যায় না। যশোর জেলার সবচেয়ে ছোটো উপজেলা বাঘারপাড়া। আয়াতন ৩০৮.২৯ বর্গ কিমি.। ১৯৮৩ সালে থানা থেকে এটি উপজেলা করা হয়। জনসংখ্যার বেশিরভাগ কৃষিজীবী। তাছাড়া রয়েছে মৎস্যজীবী, শিল্প মালিক-শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য চাকুরিজীবী। ভৌগোলিক অবস্থান— ২৩°০৮ থেকে ২৩°২১ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°১৩ থেকে ৮৯°২৬ পূর্ব দ্রঘিমাংশের মধ্যে এ উপজেলাটি অবস্থিত। সীমানা— উত্তরে ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ এবং মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলা; পূর্বে নড়াইল সদর উপজেলা ও মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলা; দক্ষিণে যশোর সদর উপজেলা এবং নড়াইল সদর উপজেলা; পশ্চিমে ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলা এবং যশোর সদর উপজেলা।

১.৫ অভয়নগর উপজেলা

মাটির উর্বরতার কারণে ধান সহ অন্যান্য ফসল খুব ভাল উৎপন্ন হয়ে থাকে এ উপজেলায়। সংস্কৃতি বিকাশে এখানে রয়েছে ফলই গান, হালই গান, জারিগান, পটুয়া গান, গাজীর গান, যাত্রাগান প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, রাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যা রানী অভয়া'র নামানুসারে অভয়নগর থানা প্রতিষ্ঠিত। আয়তন ২৪৭.২১ বর্গ কিমি.। ভৌগোলিক অবস্থান — ২৩°১৫ থেকে ২৩°৭ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°১৮ থেকে ৮৯°৩৪ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। সীমানা —— উত্তরে যশোর সদর এবং নড়াইল সদর উপজেলা; পূর্বে নড়াইল জেলার কালিয়া এবং নড়াইল সদর উপজেলা; দক্ষিণে খুলনার ফুলতলা, ডুমুরিয়া, দীঘলিয়া এবং খানজাহান আলী থানা; পশ্চিমে যশোর সদর এবং মনিরামপুর উপজেলা।

Dhaka University Institutional Repository

১.৬ শার্শা উপজেলা

এই উপজেলায় রয়েছে বাউল ও যাত্রাগানের প্রভাব। তবে, জারি, ভাটিয়ালি সহ অন্যান্য ধারার গানও পরিবেশিত হতে দেখা যায়। জনসংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকে শার্শা যশোর জেলার তৃতীয় বৃহত্তর উপজেলা। আয়তন ৩৩৬.২৮ বর্গ কিমি.। ভৌগোলিক অবস্থান — ২২°৫৫ থেকে ২৩°১২ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৫১ থেকে ৮৯°০১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে উপজেলাটি অবস্থিত। সীমানা — উত্তরে চৌগাছা, পূর্বে ঝিকরগাছা, দক্ষিণে সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলা এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ।

১.৭ চৌগাছা উপজেলা

বেলে এবং বেলে দোঁ-আশ মাটির গুণে উক্ত উপজেলায় কৃষি সম্পদের মধ্যে খেজুর রস ও গুড়সহ মৌসুমী ফসল বেশ লক্ষণীয়। এখানকার বেশিরভাগ মানুষ কৃষি নির্ভর। স্বশিক্ষিত হলেও তারা সংগীতের প্রতি আসক্ত; এ কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। বিভিন্ন ধারার সংগীতের পাশাপাশি কর্মসংগীত হিসেবে এখানে কৃষিজীবী সংগীত যেমন: ধান ভানার গান, জাগ গান, পাট কাটার গান, মেয়েলি গীত, বারাসে (বারোমাসী) গান লক্ষ্যনীয়। আয়তন ২৬৯.৩১ বর্গ কিমি.। ভৌগোলিক পরিকাঠামো অনুযায়ী চৌগাছা ২৩°১০ থেকে ২৩°২২ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৫৪ থেকে ৮৯°০৮ পূর্ব দ্রঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। সীমানা — চৌগাছা উপজেলার উত্তরে ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর এবং মহেশপুর উপজেলা; পূর্বে যশোর সদর এবং ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে যশোরের শার্শা এবং ঝিকরগাছা উপজেলা; পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। যশোর জেলার দ্বিতীয় ছোটো উপজেলা চৌগাছা।

১.৮ মনিরামপুর উপজেলা

লোকগানের মধ্যে এখানে রয়েছে গার্সীর গান, মেয়েলি গীত, যাত্রাগান, কীর্তন গান, ছাদ পেটানোর গান, জারিগান, জাগগান, পাট কাটার গান, মনসা মঙ্গলের গান, ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের গান বা প্রার্থনা সংগীত, রামায়ণ গান, বালা গান, অষ্টক গান প্রভৃতি। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের গান এখানকার মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। আয়তন ৪৪৪.২০ বর্গ কিমি.। আয়তনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর উপজেলা মনিরামপুর। জনশ্রুতি আছে জমিদার মনিরাম বাবুর নামানুসারে উপজেলাটির নামকরণ করা হয়। ভৌগোলিক অবস্থানে এই উপজেলা ২২°৫৫ থেকে ২৩°০৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°০৯ থেকে ৮৯°২২ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। সীমানা — উত্তরে যশোর সদর উপজেলা; পূর্বে অভয়নগর; দক্ষিণে কেশবপুর ও সাতক্ষীরার কলারোয়া এবং খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা; পশ্চিমে যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলা।

Dhaka University Institutional Repository

১.৯ কেশবপুর উপজেলা

উক্ত উপজেলার উল্লেখযোগ্য সংগীত হলো জারি, মানিক পীরের গান, কীর্তন গান, যাত্রাগান, অষ্টক গান, বালা গানসহ আঞ্চলিক গান। আয়তন ২৫৮.৪৪ বর্গ কিমি.। ভৌগোলিক অবস্থান — ২২°৩৮´ থেকে ২২°৫৭´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°০৭´ থেকে ৮৯°২২´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত এ উপজেলাটি। জনশ্রুতি আছে যে, কেশব পাটনির নামানুসারেই কেশবপুর নামকরণ করা হয়। সীমানা — পূর্বে খুলনার ডুমুরিয়া, উত্তরে মনিরামপুর, দক্ষিণে সাতক্ষীরার তালা এবং পশ্চিমে কলারোয়া উপজেলা অবস্থিত। এই উপজেলার অধিকাংশ মানুষ কৃষি নির্ভর। বাংলার উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তিদের মধ্যে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কথাশিল্পী মনোজ বসু, উপন্যাসিক রাম ভট্টাচার্য, কবি মানকুমারী বসু, শিল্পী ধীরাজ ভট্টাচার্য, কোলকাতা হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ প্রমুখেরা এ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

১.১০ ঝিকরগাছা

বিভিন্ন ধারার সংগীতের মধ্যে এই উপজেলায় গাজীর গান, পাট কাটার গান, হালই গান প্রভৃতি অন্যতম। আয়তন ৩০৭.৯৬ বর্গ কিমি.। উপজেলার ভৌগোলিক অবস্থান — ২২°৫৫´ থেকে ২৩°১৩´ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে, এবং ৮৮°৫৯´ থেকে ৮৯°০৯´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। সীমানা— উত্তরে চৌগাছা উপজেলা, দক্ষিণে সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলা, পশ্চিমে শার্শা উপজেলা এবং পূর্বে যশোর সদর উপজেলা অবস্থিত।

১.১১ পরিবেশ ও জনজীবন

যশোরের কৃষিপ্রধান সমাজ ছিল আত্মনির্ভরশীল কারণ এ জেলার বেশিরভাগ মানুষ কৃষি নির্ভর। প্রধান কৃষি ফসল — ধান, পাট, ইক্ষু, শাকসবজি ও রজনীগন্ধা ফুল। ফলের মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল, পেঁপে, লিচু, নারকেল ও কলা উল্লেখযোগ্য। খেজুর গুড় ও পাটালি, চামড়া, কাঁঠাল, কলা, পাট ও তুলা বিশেষ রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য। কামার, কুমোর, জেলে, তাঁতি, কৃষক প্রভৃতি পেশার মানুষ সম্প্রীতি ও নির্ভরতার মধ্যে তাদের বসবাস। কৃষি ও শ্রমজীবী মানুষের বসবাস অধিক হওয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খড় ও গোলপাতার ছাউনি দেওয়া মাটির বাড়ি দেখা যায়। তবে বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্র উন্নয়নের ফলে কর্মক্ষেত্রে লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া। বসতবাড়িতে এসেছে পরিবর্তন উঠেছে নতুন পাকা ছাদ দেওয়া দালান। বিভিন্ন স্থানে রয়েছে হাট-বাজার। বিনোদনের জন্য কোনো কোনো গ্রামে রয়েছে গান-বাজনা, যাত্রার দল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে বর্তমান সময়ে পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস, ঘরবাড়ি ও বিনোদনে বিদেশী জীবন ও সংস্কৃতির ছোঁয়া লেগেছে এখানকার মানুষের জন-জীবনে। এর মাঝেও গ্রামীণ সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নদী বিধৌত পলল দ্বারা যশোর জেলার সমভূমি গঠিত। নদ-নদীর মধ্যে কপোতাক্ষ, হরিহর, মুক্তেশ্বরী, শ্রীনদী, ইছামতি এবং ভৈরব নদী উল্লেখযোগ্য। রয়েছে অসংখ্য বিল, বাওড়, পুকুর এবং দিঘি। বিলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরিনা বিল, শোলাকুড়, মশিহাটি, কৈবিলা, গোলা ভাঙ্গা ইত্যাদি। শীত মৌসুমে অতিথি পাখির অস্তিত্ব মেলে এসকল বিল বাওড়ে। এছাড়াও প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে দেশীয় পাখি যেমন: বক, বেলে হাঁস, পানকৌড়ি, দোয়েল, শালিক, বউকথাকও, ঘুঘু, মাছরাঙা, টিয়া, ময়না, চড়ুই, কবুতর, প্রভৃতি পাখির সমাগম দেখা যায়।

১.১২ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

যশোর জেলার ইতিহাস এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ কৃষিজীবী জনমানসে বেশকিছু লোকগান সৃষ্টি হয়েছে এ অঞ্চলের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে। 'রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্রোতধারায় রাজা প্রতাপাদিত্যের হাতে প্রতিষ্ঠা হয় স্বাধীন যশোর রাজ্য।'[১০] পরবর্তী সময়ে '১৭৫৭ সালে সূচনা হয় ইংরেজ শাসন। সম্ভবত এই সুবাদে ১৭৮৬ সালে যশোর জেলা হিসেবে মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়।'[১১]

এ অঞ্চলে প্রথম নীল চাষকে ঘিরে ঘটনার ঘনঘটা। পরবর্তী সময়ে শুরু হয় নীল বিদ্রোহ এবং অনেক ঘাত-প্রতিঘাত শেষে '১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসন থেকে ভারতবর্ষ মুক্ত হয়। সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের পর প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। উল্লেখ্য যে, ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের ১১ দিন আগে যশোর শত্রু মুক্ত হয়। যশোর অবিভক্ত ভারতের প্রথম জেলা এবং বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন জেলা।'[১২] বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে যুক্ত হয়েছে সংগীত ও অভিনয়। বিশেষ করে যাত্রাপালা যা সাধারণ মানুষকে জাগ্রত এবং অনুপ্রাণিত করেছে। আর সংগীতের একটি বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছে যশোর অঞ্চলের জারি গান, বাউল সুরে জাগরণ মূলক গান প্রভৃতি।

ইতিহাসের সাথে সংগীত অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে রয়েছে আদিকাল থেকে। যশোর জেলার উদ্ভব ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এই ইতিহাসের মধ্য দিয়ে শেষ করছি। গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই জেলার লোকসংগীত সম্পর্কে আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও যশোর জেলার উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, যে জেলার সংগীত সম্পর্কে আলোচনা করবো সেই জেলা সম্পর্কে পূর্বে তথ্য প্রদান করে গবেষণার মূল ভিত্তিকে সমৃদ্ধ করা। এবারে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. যশোর জেলার উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনায় ব্যবহৃত মানচিত্রটি https://www.google.com থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। লোকসংগীতাঞ্চলের দিক থেকে সংক্ষেপে যশোর জেলার উপজেলা সমূহের আলোচনায় যে বিবরণ উত্থাপন করা হয়েছে তা জেলা তথ্য ও পরিসংখ্যান বিভাগ, ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী। জেলা তথ্যকর্মকর্তা জনাব তাপস চক্রবর্তী এবং পরিসংখ্যান বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ নজরুল ইসলামের দেয়া তথ্যানুযায়ী। তারিখ: ১৭-০৬-২০১৬ থেকে ২০-০৬-২০১৬।

২. সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুল্‌নার ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)*, রূপান্তর, খুলনা, পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি, ২০০১। পৃ.– ২

৩. মুহাম্মদ নূরুল হুদা (সম্পাদিত), *লোকসংগীত*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০০৭। পৃ.– ৬২

৪. সাক্ষাৎকার: জনাব তাপস চক্রবর্তী, জেলা তথ্যকর্মকর্তা, যশোর, তারিখ: ১৭-০৬-২০১৬।

৫. শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: যশোর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ২০১৪। পৃ.– ২৫

৬. প্রাগুক্ত, পৃ.– ২৩

৭. প্রাগুক্ত,পৃ.– ২৩

৮. সাক্ষাৎকার: জনাব তপন কুমার সরকার, খাজুরা বাজার, যশোর, তারিখ: ১৭-০৬-২০১৬।

৯. শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: যশোর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ২০১৪। পৃ.– ২৫

১০. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৩৩

১১. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৩৩

১২. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

যশোর জেলার লোকসংগীতের ধারা

প্রত্যেকটি গান সৃষ্টি হয়েছে কোনো না কোনো উৎসবকে কেন্দ্র করে। তবে কিছু গান আঞ্চলিকতার প্রভাবে হয়তো সময় উপযোগী করে তুলতে গিয়ে শ্রোতা এবং শিল্পী উভয়ের ক্ষীণ সহযোগিতার কারণে হারিয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এই নদীমাতৃক দেশে নদীর স্রোতের মতো লোকগানের অনেক ধারা বহমান। গ্রাম্য সমাজের স্বশিক্ষিত মানুষের জীবন ধারায় কত না ভাঙা গড়ার চিত্র রয়েছে। তেমনই সংগীতে এ সকল ভাঙা গড়ার প্রভাব বিরাজমান। প্রত্যেকটি জেলার গানের ধারাবাহিকতায় ভিন্নতা রয়েছে; রয়েছে আঞ্চলিকতার প্রভাব, স্বভাব ও সুরগত পার্থক্য। আর এ সকল বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে লোকগানের সুবিশাল ভাণ্ডার।

যশোর জেলার লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারায় যে গান পাওয়া যায় তার মধ্যে নিম্নে উপস্থাপিত গানগুলো অন্যতম। এ গবেষণাকর্মে অনেক গানের উল্লেখ করা হয়েছে যার আজ বিলুপ্তি ঘটেছে। তবে যে গানগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে অনেক গান আজ বিলুপ্তির পথে বিধায় সে গান গুলোকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে গবেষণাকর্মের মূল আকর্ষণ বা কাজ হিসেবে যশোর অঞ্চলে নিভে যাওয়া প্রদীপের মত টিকে থাকা গান নিয়ে আমার এ সন্দর্ভ।

১. বালাগান, ২. অষ্টক গান, ৩. কবিগান, ৪. জারিগান, ৫. কীর্তন গান, ৬. ধুয়া গান, ৭. হালই গান, ৮. পটের গান, ৯. জাগগান, ১০. সারিগান, ১১. গাজীর গান, ১২. মানিকপীরের গান, ১৩. মুর্শিদীগান, ১৪. ভাবগান, ১৫. যাত্রাপালা বা যাত্রাগান, ১৬. বারাসে (বারোমাসী) গান, ১৭. মারফতি গান, ১৮. দেহতত্ত্ব গান, ১৯. মেয়েলী গীত, ২০. শাড়ি গান, ২১. বাউল গান, ২২. ফলই গান, ২৩. গার্সীর গান, ২৪. এ্যাঁচড়া পূজার গান, ২৫. গায়ে হলুদের গান, ২৬. মতুয়া গীত, ২৭. মান্দার গীত, ২৮. কাদামাটির গান, ২৯. প্রভাতী গান, ৩০. লক্ষ্মীর পাঁচালি প্রভৃতি।

উল্লিখিত গানগুলো যশোর জেলায় এক সময় গাওয়া হতো। তবে বিলুপ্ত প্রায় গানগুলোর মধ্যে আজও যে গানগুলো উল্লেখযোগ্য ভাবে পাওয়া যায়— ১. বালাগান, ২. অষ্টক গান, ৩. কবিগান, ৪. জারিগান, ৫. বাউল গান, ৬. জাগগান, ৭. হালই গান, ৮.যাত্রাপালা বা যাত্রাগান। যা এই গবেষণাকর্মের বিষয়বস্তু হিসেবে আলোচ্য। নিম্নে অধ্যায় বিভাজনে পরিচ্ছেদানুক্রমে গানগুলো উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বালাগান

আদিকাল থেকে বাঙালিরা প্রকৃতিকে বসে আনার নিমিত্তে বিভিন্ন ব্রতপার্বণকে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে পালন করে আসছে। এরই মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন উৎসবের। এ উৎসবকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের গান। বাংলা লোকসংগীতের ধারা অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, কোনো না কোনো লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এসকল গান উৎসারিত হয়েছে এবং সময়ের পরিক্রমায় বিবর্তিত হতে হতে আমাদের লোকসংস্কৃতিতে তা স্থান করে নিয়েছে। 'গাজন' তেমনি একটি উৎস যা আমাদের লোকসংগীতের ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ আর এই গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে বালা গান। এ থেকে যুক্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি বিষয়। যার মধ্যে বোলান, হালৈ, সুব্‌রে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বোলান ছাড়া বাকিগুলো বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের স্থান বিশেষ অবিকৃত নামেই পরিচিত। বোলান এবং বালা গান একই ধারায় প্রবাহিত। এ গান একই উৎসব বা পার্বণকে কেন্দ্র করে, একই সময় গাওয়া হয়ে থাকে। এই গান যারা পরিবেশন করেন তাদেরকে বালা সন্ন্যাসী (শিব বা নীল দেবতার উপাসক) বলে অভিহিত করা হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে যশোর জেলার মনিরামপুর, কেশবপুরসহ দক্ষিণ খুলনার বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া, পাইকগাছা, কয়রা প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও স্বল্প পরিসরে বালা গান পরিবেশিত হয়। বাংলাদেশের লোকসংগীতে বালা গান সম্পূর্ণ একটি অপরিচিত নাম। লুপ্তপ্রায় এই সংগীত ধারাটি স্থানীয় অধিবাসীদের গণ্ডি ছেড়ে স্থানান্তরিত হবার সুযোগ পায়নি কখনো। তাই প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি এ গান যশোর অঞ্চলের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকসংগীতের এক অপূর্ব ধারা হিসেবে বহমান।

২ : ১.১উদ্ভব

'প্রাচীনকালে শিবের বন্দনা উপলক্ষে চৈত্র সংক্রান্তিতে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো তাই মূলত গাজন, শিবের গাজন, গাজন উৎসব বা গাজন অনুষ্ঠান। আর এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে যেসব গান গাওয়া হয় তাকে বলে শিবের গীত।'[১] তৎকালীন সময়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন খুব বড় পরিসরে ছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। শিবের গাজন ছাড়াও প্রাচীন কালে ধর্ম এবং দেব-দেবীকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন গাজন গান ছিলো। যেমন: ধর্ম গাজন, মনসার গাজন ও সরস্বতীর গাজন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অঞ্চল ভেদে কোথাও কোথাও শিবকে কেন্দ্র করে গাজন ও চড়ক উৎসবেরও আয়োজন চলতো। গাজন গান বা বালা গানের উৎসকে কেন্দ্র করে 'গবেষক যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেছেন, "শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হর-কালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাহাদের গর্জন হেতু গাজন শব্দটি আসিয়াছে।"[২] গাজন অনুষ্ঠান সম্পর্কে সুধাংশু রায় তার PREHISTORIC INDIA &

Dhaka University Institutional Repository

ANCIENT EGYPT গ্রন্থে লিখেছেন, "কোনো ফারাও রাজা বিতাড়িত হয়ে প্রাচীন মিশর থেকে দলবল নিয়ে পালিয়ে আসেন এদেশে। তার মৃত দেহ রাজমহল অঞ্চলের পাহাড়ে কোথাও মমি করে রাখা আছে। সেই রাজার মৃত্যু দিবসের শোক পালনের জন্য গাজন সন্ন্যাসীরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন"।'[৩] আবার ধারণা করা হয় বালা গান প্রাচীন জাতি গোষ্ঠীর পুণ্ড্র ক্ষত্রিয়রা এই অঞ্চলে নিয়ে আসে। বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত পোষণ করলেও ভারতীয় দর্শন অনুযায়ী শাব্দিক বিচারে গাজন শব্দটির উৎস যাই হোক না কেন বিষয়-বৈচিত্র্যের নিরিখে এটা হর-পার্বতীর বিবাহ কেন্দ্রিক হয়ে সৃষ্ট একথা প্রণিধানযোগ্য। তবে এসকল তত্ত্বকথা বা উপাখ্যান যে উৎসব কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগীতে রূপ নিয়েছে তা নিশ্চিত।

২ : ১.২ নামকরণ

শিব পূজাকে কেন্দ্র করে নীল উৎসব। আর এ নীল উৎসবকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ খুলনাসহ যশোর অঞ্চলে বালা গানের জন্ম। 'ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিকাঠামোয় লোকসাহিত্যের ধারা বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত এবং তা নতুন নতুন রূপে ও নামে আবির্ভূত হয়।'[৪] নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে গাঁজন গান বা বালা গানের নামকরণকে উপস্থাপন করা হলো:

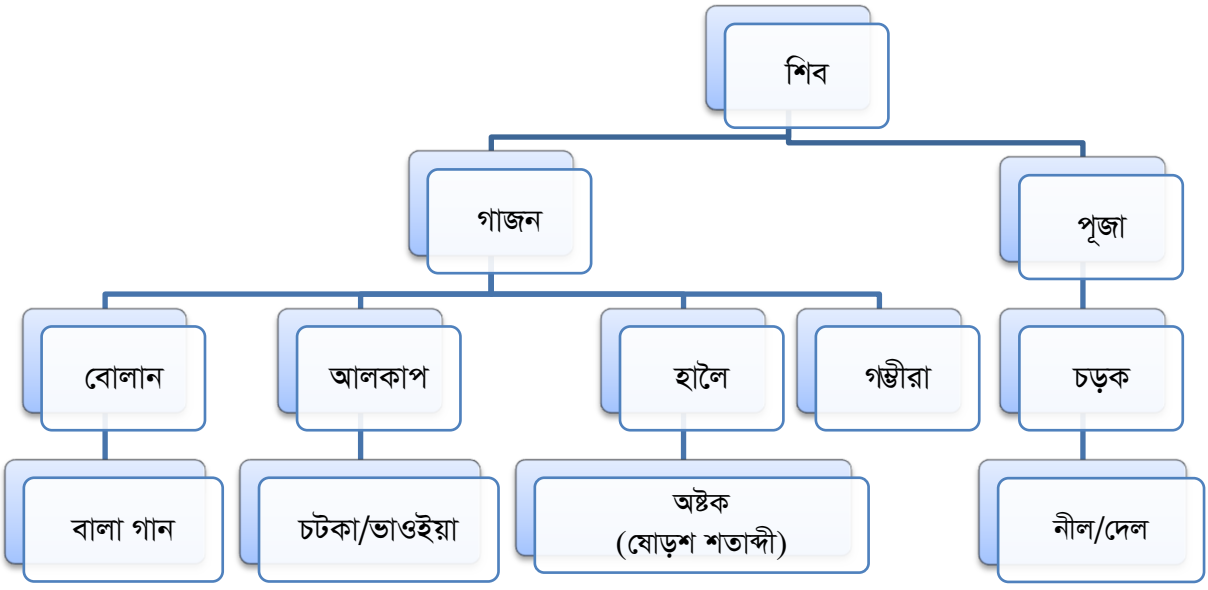

উল্লিখিত ছকে নির্দিষ্ট বোলান থেকে বালা গান আসলেও চড়ক থেকে নীল নামকরণটি এসেছে। শিবকে কেন্দ্র করে গাঁজন ও চড়ক অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে একটি উপাখ্যান কথিত আছে — বাসুকী নাগের বিষে পৃথিবী বিষময় হবে বিধায় শিব বাসুকীর সব বিষ পান করে কণ্ঠে ধারণ করেন, সেই থেকে শিবের আর এক নাম "নীলকণ্ঠ"। এ জন্য শিবের পূজাকে নীল পূজা বা চড়ক উৎসব বলা হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

২ : ১.৩ প্রকারভেদ

যশোর অঞ্চলে নীল উৎসব মোট ষোলটি পর্বে বিভক্ত করে গাওয়া হয়ে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তির পনেরো দিন পূর্ব থেকে এসব পর্বগুলো অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রতিটি পর্ব ঘিরে ভিন্ন ভিন্ন গীত রয়েছে। মোট ষোল প্রকার বালা গান পাওয়া যায় যা এখনো পর্যন্ত নীল উৎসবকে কেন্দ্র করে গাওয়া হয়। পর্বগুলো হলো, '(১) বালা সন্ন্যাসী, (২) মূল সন্ন্যাসী, (৩) পাট সন্ন্যাসী, (৪) খেজুর সন্ন্যাসী, (৫) বান সন্ন্যাসী, (৬) খাড়া সন্ন্যাসী, (৭) আগুন সন্ন্যাসী, (৮) কাঁটা সন্ন্যাসী, (৯) পাটার সন্ন্যাসী, (১০) চড়ক সন্ন্যাসী, (১১) ভোগ মটুকে, (১২) পুষ্প মটুকে, (১৩) জল-ফল মটুকে, (১৪) ক্ষীর সন্ন্যাসী, (১৫) সাধুলা ও (১৬) ঠাকুর সন্ন্যাসী।'[৫] যদিও ষোলো প্রকার বালা গান প্রাচীনকালের বালা শিল্পীদের খাতাপত্র খুঁজলে হয়তো পাওয়া যাবে কিন্তু বর্তমানে মোট আট/নয় প্রকারের বালা গান টিকে আছে। (খাতা বলতে সে সকল বালা শিল্পীদের নিজ হস্তে লেখা গানের পাণ্ডুলিপি যা আজ অবধি বই আকারে প্রকাশিত হয়নি। আলোকচিত্রে তেমন একটি খাতার ছবি উল্লেখ করা হয়েছে।) এই আট/নয় প্রকারের বালা গানেরও আদিরূপ অক্ষুন্ন রাখতে পারেনি বর্তমান বালা গানের শিল্পীরা। সময়ের সাথে সাথে গায়কেরা তাদের সুবিধা মতো বাণী পরিবর্তন করে গান বেঁধে নিয়েছেন।

২ : ১.৪ গায়ন সময় ও স্থান

বালা গান লোকসংগীতের একটি আদি নিদর্শন যা যশোর এবং দক্ষিণ খুলনা অঞ্চলের গান হিসেবে সুপ্রচলিত। প্রাচীনকাল থেকে এ গান ক্ষত্রিয়রা পরিবেশন করতেন। তবে সারা দেশে প্রচার না ঘটলেও কালের আবর্তে যশোর অঞ্চলে বর্ণবিভেদ ব্যতিরেকে সকল বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা বালা গান পরিবেশন করে আসছে। চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব থেকে একাধিক দল নির্দিষ্ট বিজোড় দিন গণনা করে (সাত বা পনেরো দিন) প্রায় প্রতি বাড়িতে অথবা স্থানীয় নির্দিষ্ট স্থানে এই গান পরিবেশন করে থাকে।

২ : ১.৫ অঞ্চল

বালা গানের উৎপত্তি ঠিক কোন স্থানে প্রথম হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে তথ্যানুসন্ধানে যেটুকু জানা যায় তা হলো, 'এই গান বর্ধমান হয়ে রাজশাহী অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ক্ষত্রিয়দের মাধ্যমে খুলনা এবং যশোরে সেই থেকে প্রচার ও প্রসারের অভাবে সীমিতভাবে আজও টিকে আছে।'[৬] মূলত খুলনার বটিয়াঘাটা, পাইকগাছা, কয়রা, দাকোপ, ডুমুরিয়া থানা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা এবং বৃহত্তর যশোর জেলায় আড়ম্বরের সাথে এই গান গাওয়া হয়। যশোর জেলার মনিরামপুর এবং কেশবপুর, উপজেলাতে এ গান আদিকাল থেকে ঐতিহ্যপূর্ণ ভাবে গাওয়া হলেও ঝিকরগাছা, অভয়নগরসহ অন্যান্য উপজেলাতে এর আয়োজন দৃশ্যত নয়। আজও বিশেষ আড়ম্বরের সাথে কেশবপুর, মনিরামপুর, এবং শার্শা উপজেলায় পনেরো দিন থেকে এক মাস ব্যাপী এর আয়োজন করা হয়। যদিও বর্তমানে বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও বালা গানের প্রচলন দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায়, তবে তা নীল পূজার গান নামে পরিচিত। যশোর জেলার বালা শিল্পীদের তথ্যানুযায়ী বালা গান আজ থেকে প্রায় চার বা পাঁচশত বছর পূর্বে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল। সেই থেকে আজ অবধি বালা গান যশোর এবং খুলনা অঞ্চলে তার প্রাচীনত্ব নিয়ে টিকে আছে।

২ : ১.৬ ধারক, বাহক

পূর্বে বালা গানের ধারক ও বাহকগণ মৎস্য শিকারী ও কৃষিজীবী হলেও বর্তমানে শিক্ষিত নানা পেশার মানুষ বালা গান গেয়ে থাকেন। 'বালা গানের শিল্পীদের কোনো একটি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।'[৭] কেননা শুধুমাত্র বালা গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করার মতো কোনো নির্ধারিত শিল্পী পাওয়া যায় না। বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময় নীল উৎসবকে কেন্দ্র করে এ গান গাওয়া হয়। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিত্তশালীরা সার্বজনীনভাবে বালা গানের আয়োজন করে থাকে। গানগুলোর সাহিত্য বা কাব্যমান এতোটাই প্রখর যা নিয়ে সংশয় প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই। এছাড়া গানের সুরবৈচিত্র্যতা না থাকলেও বাণী এবং সুরের সংমিশ্রণে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাতে শৈল্পিক মানের কোনোরূপ সমালোচনা চলে না। উল্লেখ্য যে, এক রৈখিক সুরের চলনের ফলে এ গান বাণী প্রধান। এছাড়াও বালা গান মূলত মন্ত্র বিশেষ হওয়ায় এখানে বাণীটাকে সুরের মধ্য দিয়ে পুঁথি পাঠের মত করে পাঠ করা হয়ে থাকে; যা সুরকে ছাপিয়ে বাণীর প্রাধান্য বিচার্য।

২ : ১.৭ উপকরণ

নীল বা দেউল (স্থানীয় ভাষা দেল) পূজাকে কেন্দ্র করে বালা গানের উৎপত্তি। আর এ বালা গানে ষোলো প্রকার উপকরণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি আলাদা এবং বিচিত্র রকম। বালা গানের ষোলো প্রকার উপকরণের মধ্যে ষোল সাং অর্থাৎ ষোল জন সন্ন্যাসী যা এর মূল। মূল সন্ন্যাসী ব্যতীত এ উৎসবের জন্য ষোল ক্ষেত্রের (স্থান) ষোল জন মানুষের প্রয়োজন হয় যাকে ষোল সাং বলে অভিহিত করা হয়। এছাড়াও রয়েছে গাম্ভীর ঘর, ধূপ-ধুনুচি, প্রদীপ, ডাব, বেতের ছড়ি, খাঁড়া (রামদা বিশেষ), বঁড়শি, চরকা, দড়ি, লোহার শলাকা, পাট (কাঠের খোদাইকৃত একটি গুঁড়ি), খেজুর, আগুন, ফুল, জল ইত্যাদি।

২ : ১.৮ বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রশিল্পী

নানা ধরণের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই গানে। ঢোল, ঢাক, কাঁশি, প্রাণজুড়ি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র এই গানের প্রাণ বললে অত্যুক্তি হবে না। কোনো পেশাদারী গান নয় জন্য ঢোল এবং ঢাক বাদক ব্যতীত বালা গানের যন্ত্রশিল্পীরাও পেশাদার নয়। আর সে কারণে খুব দক্ষ যন্ত্রশিল্পী বালা গানের দলে কম দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

২ : ১.৯ বিষয়বস্তু

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান অবধি শিব-পার্বতীকে কেন্দ্র করে বালা গানের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়ে আসছে। মূলত শিবকে কেন্দ্র করে এ গান করা হয়। তবে বালা গানের একটি অংশ অষ্টক গান ছাড়াও বালার বিভিন্ন পর্বে কালী এবং পার্বতী নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

২ : ১.১০ অভিনয় শৈলী ও পোশাক

বালা গান পরিবেশনকালীন সময়ের ক্রিয়াকলাপকে অভিনয় বলা ভুল হবে বরং তাতে বাস্তব বলাই শ্রেয়। কারণ, মুখের মধ্যে লোহার শলা ফোঁটানো, পিঠে বঁড়শি গেঁথে দেওয়া, কাঁটা ওয়ালা খেজুর গাছের উপর এবং ধারালো খাঁড়ার (রামদা বিশেষ) উপর দিয়ে নগ্ন পায়ে হেঁটে বেড়ানো এগুলোর কোনোটিই অভিনয় নয়, এর সত্যতা যাচাইয়ে বাস্তব। মূল সন্ন্যাসীসহ প্রত্যেক সন্ন্যাসীর পোশাক হিসেবে পরনে থাকে গেরুয়া রঙয়ের ধুতী, গায়ে সাদা অথবা গেরুয়া রঙয়ের গেঞ্জি, সাথে একটি করে নতুন গামছা, হাতে বেতের ছড়ি; যা এই উৎসবকে স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করে তোলে।

২ : ১.১১ গান উপস্থাপন সময়, শিল্পী সংখ্যা এবং দর্শন

'বালা গানের শুরু থেকে শেষের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। তবে এক একটি গানের স্থায়ীত্বকাল ৫/১০ মিনিট পর্যন্ত হয়ে থাকে। বালা গান একটি দলীয় সংগীত। এই গান পরিবেশনের সময় একজন মূল গায়েন বা শিল্পী থাকেন'[৮] তাকে বালাদার বলা হয়। যার নেতৃত্বে বালা গান গাওয়া হয়ে থাকে। 'বালা গানে ধুয়াদার (সহযোগী শিল্পী) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সহযোগী শিল্পী ছাড়া বালা গান পরিবেশন করা অসম্ভব।'[৯] একটি দলে যন্ত্রশিল্পী ব্যতিরেকে ১৬ জন থেকে ২০ জন পাট সন্ন্যাসী শিল্পী থাকে। এখানে উল্লেখ্য পাট সন্ন্যসীরাই সহযোগী শিল্পী হিসেবে গান গেয়ে থাকে কারণ এ গান গাওয়ার জন্য আলাদা ভাবে শিল্পী নির্ধারণ করা হয় না। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এই অনুষ্ঠান গ্রামের বা সমাজের মানুষের মঙ্গল চিন্তা করে করা হয়। এর কোনো লিখিত রূপ গবেষণালব্ধ ভাবে পূর্বে পরিলক্ষিত হয়নি। বালা গান মূলত এই পূজার মন্ত্র। তবে গান হিসেবে সুরে সুরে পাঠ করার মাধ্যমে উপস্থাপন করা এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

২: ১.১২ গায়ন পদ্ধতি

বালা গানের বাণী একাধারে মন্ত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। ধারাবাহিক ভাবে উপস্থাপন না করলে এ গানের পূর্ণতা হারায়। যার ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ——

'বন্দনা, সরস্বতীর স্তব, বালার জন্ম, ধুনুচির জন্ম, ধূপের জন্ম, শঙ্খ সৃস্টি ও শুদ্ধ, ঘন্টার জন্ম, বেতের জন্ম-বেতশুদ্ধ, মাটি শুদ্ধ, টাটের জন্ম, ক্ষীরপাত্র শুদ্ধ, জল শুদ্ধ, ক্ষীর জল, ঢাকের জন্ম, ঢাক শুদ্ধ, শিবের নিদ্রা ভঙ্গ, শিবের প্রণাম, বৃষ সজ্জা, বল্লার চাক, সর্প, পাট জাগানো, পাটের জন্ম, সৃষ্টি পত্তন, দেউল পত্তন, আসন শুদ্ধ,

Dhaka University Institutional Repository

অভিষেক, চতুর্দিক বন্দনা, সর্ব দেবের বন্দনা, পাটের নিদ্রা ভঙ্গ, পাটের প্রণাম, সন্ন্যাসী ঘাটানো, ষোল সাং শুদ্ধ, বৃষ সাজন, পথ শুদ্ধ, দুর্গা স্তব, দুর্গা আনয়ন, পথে দুর্গা পূজা, গণেশের স্তব, শিবের দ্বাদশ রূপ বর্ণনা, লোহাশুর বধ, সীতার অগ্নি পরীক্ষা, কালী স্তব, দশ অবতার, কর্মকার, ঢেঁকি, অহল্যা পাষাণী, শিক্ষার রূপ, পথের বাধা, কালীরূপ দরশন, গঙ্গার জন্ম, গঙ্গার স্তব, তামার জন্ম, সিন্দূরের জন্ম, নীলের জন্ম ও শুদ্ধ, নীলধুল বাঁধা, নীল পূজা, ধূপ শুদ্ধ, ধূপ পুড়ানো, গলায় দড়ি, ঢনা মনা জীয়ন, মড়া পরীক্ষা, মড়া জীয়ন্ত, হাজরার জন্ম, হাজরার চতুর্দিক বন্দনা, হাজরা প্রণাম, হাজরার নিমন্ত্রণ, খিচুড়ি মাগন, মণ্ডপ নির্মাণ, গাম্ভির শুদ্ধ, ঘট স্থাপন, অধিবাস, গাম্ভীর পূজা, ফল উৎসর্গ, বালা ও মালী, মালঞ্চ বাঁচানো, ভোগ রন্ধন, খেজুর গাছের জন্ম, খেজুর ভাঙ্গা, চড়ক নিমন্ত্রণ, চরকা গঠন, সাজি গঠন, আগুন সন্ন্যাস, আগুন ঝরা, হনুমান ভাঙ্গা, কাঁটা সন্ন্যাসী, ধান্য বোনা, নিড়ানো, ধান্য ভাঙ্গা।'[১০]

উল্লিখিত ধারাবাহিকতায় বালা গান উপস্থাপন করা হয়। শিবের প্রার্থনাকে উপলক্ষ্য করে যশোর জেলার মনিরামপুর এবং কেশবপুর উপজেলাতে এ ভাবে মন্ত্রগুলো পাঠের মাধ্যমে এই পূজা এবং গান করা হয়ে থাকে। কোনো কিছু শুরুর অংশটাই বন্দনা। যেমন:

প্রণাম করিলাম ভক্তি আদ্য দেব আদ্য শক্তি
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি দেবা
দিবাকর নিশিপতি, দেবরাজ গণপতি
স্বর্গবাসী দেব পদে সেবা।

[সূত্র: সং. গান নং–১]

এই মন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে প্রধান প্রধান দেবতাদেরকে স্মরণ করাই এর উদ্দেশ্য। বন্দনার মধ্য দিয়ে এ পূজার আয়োজন শুরু হয়। এরপর একে একে পূজার শেষ দিন অবধি ধারাবাহিকতা মেনে প্রত্যেকটি পর্ব শুদ্ধাচারে পালন করা হয়ে থাকে। যিনি এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বা যারা এ আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত থাকে তাদের পারিবারিক মঙ্গল চিন্তা করে, সর্বোপরি সমাজের মঙ্গল চিন্তা করাই এ উপাসনার মূল। দর্শনগত দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, এ পূজার উদ্দেশ্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস রেখে সমাজের মঙ্গল কামনা করা। লোকবিশ্বাস এই আচার-অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য। সমস্ত বালার পরিবেশনা মন্ত্র নির্ভর এক বাগ্মী উপস্থাপন হওয়ায় কণ্ঠ দেবীকে স্মরণ সর্বাগ্র গ্রাহ্য। কেননা সনাতন ধর্মাবলম্বী সকল মানুষ এই অদৃষ্ট সত্যে বিশ্বাসী।

বালাদার থেকে সন্ন্যাসী এবং সকল প্রকার উপকরণ যেমন: ঢাক, ধুনুচি, ধূপ, ক্ষীর পাত্র, শঙ্খ, ঘন্টা, বেত, টাট, পাট, ফুল, বেলপাতা, কাঁচাহলুদ, চন্দন, সিঁদুর, ডাব, ঘট, নদী অথবা গঙ্গার জল প্রভৃতি এ

Dhaka University Institutional Repository

আয়োজনের অংশ। এ সকল উপকরণের জন্মের পর তা মন্ত্র দ্বারা শুদ্ধ করণের মধ্য দিয়ে পূজায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পাটকে কেন্দ্র করে এ সকল বিষয়ের আয়োজন। জন্মের পর জাগ্রত করা হয় এরপর পাট স্নান করিয়ে তাকে পূজার জন্য তৈরি করা হয়। স্নান করাতে নদীতে নিয়ে যাবার সময় পথে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হয় সন্ন্যাসীদের। বালা মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে সেসকল বাধা অতিক্রম করে। পাট জাগানোর পূর্বে শিবকে জাগানো এবং তাকে আনয়ন করার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার এ আয়োজনের একটি বিশেষ অংশ। গাম্ভীর ঘর স্থাপনের মধ্য দিয়ে পূজার আয়োজন শুরু। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে অনেক আয়োজন করা হয়ে থাকে যা সত্য এবং প্রমাণিত। যেমন: পিঠে বড়শি ফোটনো, চরকাতে ঘোরানো, ধারালো রামদা এর উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, খেজুর গাছের মাথায় কাঁটার উপর উঠে নৃত্য করা, শুকনা খেজুরের ডাল ধরে ঝুল খাওয়া, প্রখর আগুনের উপর হাঁটা প্রভৃতি যা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে তবুও বিশ্বাস মানুষকে তার কেন্দ্রীভূত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

২: ১.১৩ আচার-আনুষ্ঠান

শিব বা নীল পূজার (বালা গানের উপাস্য দেবতা) আচার-অনুষ্ঠান খুবই আকর্ষণীয়। এ পূজার প্রারম্ভে নির্বাচন করা হয় ষোল জন সন্ন্যাসীকে যারা নির্জলা উপবাস (একদিন খাদ্য-খাবারসহ জল গ্রহণ না করে থাকা) করতে পারে। এবং তা নির্বাচন করা হয় ষোলটি গ্রাম থেকে এর প্রমাণ স্বরূপ ষোল সাং এর কথা মন্ত্রের বাণীতে উল্লেখ আছে। এবার নির্দিষ্ট করা হয় মূল সন্ন্যাসী, যিনি সমস্ত আয়োজনে দিকনির্দেশনার কাজ করেন। চৈত্র মাসব্যাপী এই আয়োজনে সন্ন্যাসীদের নিরামিষ অন্ন গ্রহণ করতে হয়। ক্ষেত্র বিশেষ আয়োজক গৃহস্থ ব্যতীত অন্যান্য সন্ন্যাসীরা পনেরো দিন পূর্ব থেকেও নিরামিষ অন্ন গ্রহণ করে থাকে। পূজা আরম্ভের দিন দুপুর বেলা সন্ন্যাসীগণ যে বাড়িতে পাট থাকে অর্থাৎ যে বাড়িতে পূজার প্রস্তুতি নেওয়া হয় সে বাড়িতে অবস্থান করেন। ঐদিন মধ্যাহ্নে আতপ চালের অন্ন গ্রহণ করে পূজার কার্যক্রম শুরু হয়। সন্ধ্যায় নতুন বস্ত্র পরিধানের পর গঠিত দেউল মণ্ডপে সকল সন্ন্যাসীর উপস্থিতিতে ঘট স্থাপনের মধ্য দিয়ে পূজার অধিবাস হয়।

‘এই তো চৈত্র মধুমাস নিরামিষ্য হবিষ্য ফলে উপবাস
ষোল সাং সন্ন্যাসী সাজিলো, বালা গেলেন শিবের পাশ।
শিব শিব বলে বালা ডাকে ক্ষণে-ক্ষণ
সমাধি ভাঙ্গিল শিবের নড়িল আসন।’

[সূত্র: সং. গান– ২১]

এরপর পাট জাগানো, পাট নামানো, পাট স্নান করানো এবং পাটের গায়ে নতুন বস্ত্র পরিয়ে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে পাটের মাথার অংশে ধুতুরা ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়ে থাকে। পরদিন অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন সকাল থেকে গ্রামের প্রতি বাড়ি ঘুরে পাটের মাথায় জল দেয়া এবং প্রতি বাড়িতে বালা গাওয়ার আয়োজন চলতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী দিন হাজরার ভোগ (অন্নপ্রসাদ) রান্নার জন্য মাঙ্গন তোলা হয়। তবে মূল সন্ন্যাসী এ কাজ করেন না তিনি তখন হাজরা নিমন্ত্রণ এবং শ্মশানের কাঠ সংগ্রহের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। রাতের বেলা মূল সন্ন্যাসী সারাদিন উপবাস থেকে ভোগ রন্ধন কার্য সম্পন্ন করেন এবং শ্মশানে গিয়ে হাজরার ভোগ নিবেদন করে আসেন। এ উপলক্ষ্যে বলা প্রয়োজন আগের দিন বালাদার এবং সকল সন্ন্যাসী সহযোগে হাজরা নিমন্ত্রণ করে আসতে হয়। রাতে ভোগ (অন্নপ্রসাদ) নিবেদনের জন্য রান্না প্রস্তুত করতে শ্মশানের চিতার কাঠ প্রয়োজন হয় যা মূল সন্ন্যাসী নিজে শ্মশান থেকে রাতের অন্ধকারে সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। পরবর্তী দিন অর্থাৎ চতুর্থ দিন সকালে যে খেজুর গাছ থেকে খেজুর ভাঙা হবে তা নিমন্ত্রণ করার পর অপরাহ্নে সকল সন্ন্যাসীর অংশ গ্রহণে খেজুর ভাঙা হয় এবং পরবর্তীতে সেই খেজুর নিয়ে মেলার স্থানে গিয়ে বিভিন্ন আয়োজন যেমন: চরকা ঘোরা, ধারালো অস্ত্রের উপর দিয়ে হাঁটা, আগুনের উপর দিয়ে হাঁটা ইত্যাদি কার্য সম্পন্নে কৃষি ফসলাদি ভালো পাবার আশায় প্রতীকি ধান বোনা, ধান নিড়ানো, ধান ভাঙা ইত্যাদি শেষে মেলার আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এক বছরের আয়োজন শেষ করা হয়। এর পরবর্তী দিন অর্থাৎ পঞ্চম দিন গোয়াল ঘরের চালের আড়ার উপর পাট রেখে সন্ন্যাসীরা বাড়ির কর্তার কাছে অনুমতি নিয়ে প্রীতিঅন্ন গ্রহণ শেষে নতুন বস্ত্র পরিধান করে পাট বাড়ি ত্যাগ করেন।

এভাবে বিভিন্ন লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ উৎসব শেষ করা হয়ে থাকে। তবে সর্বোপরি বালা গানের উদ্দেশ্য সমাজের সকল মানুষের শুভকামনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অষ্টক গান

নদীমাতৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন ধারা নদীর স্রোতের মত বহমান। তারই ধারাবাহিকতাকে সামনে রেখে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ধারার সংগীত। অষ্টক তেমনই একটি ধারার লোকগান বা সংগীত। বাঙালির হাসি-আনন্দ-দুঃখ-বেদনা সকল অবস্থানকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে গান। তাছাড়া বিভিন্ন উৎসব পার্বণকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন ধরনের গানের জন্ম হয়েছে। সংস্কৃতির ধারার একটি বিশেষ উপাদান সংগীত যা আমাদের লোকসংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ। এই লোকসংস্কৃতিতে শিবের গাজন একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। আর এ উৎসবকে কেন্দ্র করে রয়েছে বিভিন্ন ধারার গান। অষ্টক গান বালা গানের (শিবের গাজন) একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। 'অষ্টক গান বসন্তকালীন লোকগান। চৈত্র মাসের প্রথম দিন থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে অষ্টক গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। এটি সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কীর্তিমূলক সৃষ্টি। গ্রামের নিরক্ষর ও অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন কৃষকগণ অষ্টক গান রচনা করেন। এই গান কৃষক জীবনের নিজস্ব সংগীত হিসেবেই গ্রামীণ জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে আছে।'[১১] যশোর অঞ্চলে অষ্টক গান এখনও পর্যন্ত জনপ্রিয় একটি উৎসব যা নীল বা চড়ক পূজাকে কেন্দ্র করে পরিবেশিত হয়ে থাকে। গ্রামবাংলার কৃষিজীবী জনমানস সমাজের মঙ্গল চিন্তা করে শিব বা নীল পূজায় আনন্দ উল্লাস এবং সামাজিক শিক্ষার লক্ষ্যে এ গান পরিবেশন করে থাকেন। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো——

২: ২.১ উৎপত্তি এবং অঞ্চল

কৈলাশে শিবের অধিষ্ঠান এ কথা জনশ্রুতিতে আছে। যেহেতু শিবকে কেন্দ্র করে এ গানের আয়োজন তবে কবে, কখন, কিভাবে এ গান বাংলাদেশে এসেছে তা নিয়ে যথেষ্ঠ প্রশ্ন থাকলেও এ বিষয়ে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। অষ্টক গান রাধা-কৃষ্ণের লীলা সম্বলিত অষ্টসখীদের নিয়ে রচিত হলেও বালা গানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উপস্থাপিত হয়। রাধা-কৃষ্ণের লীলা সম্বলিত হওয়ার কারণে এ গানকে অঞ্চল ভেদে অষ্ট গানও বলে। তবে রাধা-কৃষ্ণের লীলা ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন সব বিষয় অবলম্বনে অষ্টক রচিত হয়। যেমন: হর-কালী, রাম-লক্ষ্মণ, চণ্ডীদাস-রজকিনী, নদের চাঁদ প্রভৃতি। বাংলাদেশে পেশাদার কোনো অষ্টকের দল দেখা না গেলেও পশ্চিমবঙ্গে হুগলী, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং উত্তর কলকাতার বিশেষ বিশেষ স্থানে এর দেখা মেলে। সময়ের আবর্তে বর্তমানে বাংলাদেশে সংস্কৃতিপ্রেমী শিক্ষিত জনেরা শখের অষ্টক দল গঠনে মনোনিবেশ করেছে। পেশাদারিত্বের স্থানেও অনেকে এ গান পরিবেশন করে চলেছে। বৃহত্তর যশোর, খুলনা এবং কুষ্টিয়া অঞ্চলে যারা কবি, পালা কীর্তন, রামায়ণ এবং ভাব গান পরিবেশন করেন তারাই এ জাতীয় দল গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। কৃষকের জীবন প্রবাহে এ গান এমনভাবে গৃহীত যে, প্রথম কৃষকদের মাঝ থেকেই এই গানের উৎপত্তি

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল তা নিশ্চিত ভাবে বলা অতুক্তি হবে না। একসময় অষ্ট গান, অষ্টক গান, অষ্টক যাত্রা বা অষ্টক পালা গাওয়া হতো এক বিশাল এলাকা বা অঞ্চল জুড়ে। 'বাংলাদেশের রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা অঞ্চলে অষ্টক গানের প্রাচীন অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও এর ব্যাপকতা ছিলো যশোর ও খুলনা অঞ্চলে। বর্তমানে খুলনার শহর অঞ্চল থেকে অষ্টক গান হারিয়ে গেলেও বিগত আশির দশকেও টুটপাড়া, বাগমারা, বানিয়াখামার, লবনচরা, মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে অষ্টক গানের দল ছিলো বলে জানা যায়। এ সমস্ত অঞ্চলে অষ্টক গানের এত ব্যাপকতা ছিলো যে, যৌথভাবে তো বটেই কোনো কোনো স্থানে পারিবারিক ভাবেও অষ্টক গানের দল গঠন করতো। এমনই দু'টি দল: মাথাভাঙ্গা ও লবণচরা যৌথ দল।'[১২] যশোরের মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলায় এখনো অষ্টক গানের দল বর্তমান। উল্লেখ্য, কেশবপুর উপজেলার রামায়ণ ও কীর্তন গানের শিল্পী স্বপন চক্রবর্তী এখনও শ্রোতাদের অনুরোধে অষ্টক গান পরিবেশন করেন।

২:২.২ নামকরণ

প্রত্যেকটি গানের নামকরণ কোনো না কোনো উৎস থেকে এসেছে। অষ্টক গানও তেমনি এসেছে বলে বিজ্ঞ জনের ধারণা। অষ্টক গানের আদিরূপ হিসেবে 'অষ্ট গান' নামটি পাওয়া যায়। ধারণা করা যায় যে, অষ্ট নামটি অষ্টক গানের আট সংখ্যার সাথে সম্পর্ক যুক্ত। অষ্টক পালার একটি গানে আমরা দেখতে পায় অষ্টসখী পারাপারের কথা। যেমন:

'তুমি শুনো শুনো ঘাটের নাবিক বলি যে তোমারে
অষ্টসখী পারে যাবে, নৌকা আনো কিনারে
দধী দুগ্ধ বিকাইয়ে গো।
আমরা যাব মথুরায়, আমরা যাব মথুরায় ॥'

[সূত্র: সং. গান নং– ৩৪]

উল্লিখিত গানের মধ্যে অষ্টসখী পার করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিনয় করে সখীগণ যে কথা বলছে তার উল্লেখ রয়েছে। 'অষ্টক গানের নামকরণ সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন, এতে আটটি বৈষ্ণবীয় প্রসঙ্গ আছে, কেউ বলেন আটজন মিলে রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি মূলক নাট্যধর্মী গীত পরিবেশন করা হয় বলে এর নাম অষ্টক গান। ভিন্নমতে জানা যায়, এটি শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট প্রহরের লীলা সংক্রান্ত নাট্যগীতি বলে একে অষ্টক গান বলা হয়।'[১৩] কিন্তু বহুল প্রচলিত মতটি হচ্ছে এটি কৃষ্ণ এবং অষ্টসখীর নাট্যধর্মী গীত বলে এর নাম অষ্টক গান, অষ্টক যাত্রা বা অষ্ট গান। তবে যশোর খুলনা অঞ্চলে একে চড়ক পাটের গান বলে অভিহিত করা হয়। আনুমানিক ষোল শতক থেকে অদ্যাবধি এ গান বাঙালি মানসকে উদ্বেলিত করেছে। 'ভাগবতে অষ্টসখীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ভাগবত অনুসারে তারা হলেন ললিতা, বিশাখা, সুচিত্রা, চম্পকলতা, বাসুদেবী, সুদেবী,

Dhaka University Institutional Repository

তুঙ্গবিদ্যা ও ইন্দুরেখা।'[১৪] 'ষোড়শ শতাব্দীর বৃন্দাবন অঞ্চলের আটজন বৈষ্ণব সাধকের কথা জানা যায়। তাঁরা হলেন (১) কন্তন দাস, (২) কৃষ্ণ দাস, (৩) গোবিন্দ দাস, (৪) চতুর্ভুজ দাস, (৫) চিৎস্বামী, (৬) নন্দ দাস, (৭) মরমানন্দ দাস ও (৮) সুরদাস। এই আটজন সংগীতকারের সম্মিলিত রচনা সমগ্র 'অষ্টছাপ' হিসেবে খ্যাত। অষ্টক গানের নামকরণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অধ্যাপক সুশান্ত সরকার 'বাঙালি সংস্কৃতি উৎসব-১৪০৩' খুলনা থেকে প্রকাশিত স্মরণিকায় উল্লেখ করেছেন যে, "চৈত্র সংক্রান্তির আট দিন পূর্ব থেকে এই অষ্টক প্রতিদিন চড়ক পাটের সাথে গীত হবার কারণে এর অষ্টক নামকরণে তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়।" কেউ কেউ মনে করেন রামায়ণের অষ্টম কাণ্ড থেকে এই গান গাওয়া হয় বলে এই গানকে অষ্টক গান বলা হয়ে থাকে। অষ্টক গানে শিবের গাঁজন, কৃষ্ণলীলা, শ্রীচৈতন্য লীলা, এমন কি বেহুলা-লখাই এর কাহিনীও ঠাঁই পেয়েছে।'[১৫] মূলত অষ্টক গান শুরু হয় সংক্রান্তির যে কোনো বিজোড় দিন পূর্ব থেকে। আলোচনায় অষ্টক নামের নামকরণ প্রসঙ্গে বহুবিধ মতের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। বহুদর্শীর ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলেও বৃহত্তর যশোর, খুলনা অঞ্চলে রাধা-কৃষ্ণ লীলা নির্ভর বেশিরভাগ অষ্টকপালা নির্মিত হয়ে আসছে। প্রসঙ্গত এই প্রণয়োপাখ্যানের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে অষ্টসখী একটি বড় স্থান দখল করে আছে। যার ফলে এ গান অষ্টক গান নামে সর্বজন স্বীকৃত।

২: ২.৩ অষ্টক গান পরিবেশনা

অষ্টক গান অন্যান্য গানের মতো নির্দিষ্ট কিছু ধারা মেনে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। এ গানের পালা প্রারম্ভে শ্লোক গান গাওয়া হয়। কমপক্ষে চারজন অপেশাদার পুরুষ শিল্পী চারদিক ঘুরে করজোড়ে গান পরিবেশন করে থাকে। তাদের পরনে থাকে ধুতি গায়ে সাদা হাতাকাটা গেঞ্জি কখনো বা খালি গায়ে ধুতির কোঁচা গায়ে জড়িয়ে করজোড় করে গান পরিবেশন করে। বাদ্যযন্ত্র ছাড়া এই গান পরিবেশিত হয়। শ্লোক গান শেষে যন্ত্রের কারুকাজ সম্বলিত বাজনা, যাকে বলে কনসার্ট এর মধ্য দিয়ে আসর আরম্ভ হয়। কনসার্ট চলাকালীন সময়ে আসরে একে একে শিল্পীরা প্রবেশ করতে থাকেন এবং কিছু সময় ধরে বাদ্যের তালে তাল রেখে নৃত্য প্রদর্শন করেন। অবশেষে সকলে আসরে দুই সারিতে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়েন। আটজন শিল্পীর ঠিক মাঝামাঝি স্থানে প্রমোটার একই ভাবে পাণ্ডুলিপি হাতে বসে আবৃত্তির সুরে অষ্টক বাণী উচ্চ স্বরে উপস্থাপন করেন, যা শুনে মঞ্চে উপবিষ্ট শিল্পীরা গান শুরু করেন। যেমন:

'বন্দে মাতা ভগবতী এই আসরের কর গো গতি
ওগো মা॥
আমি না জানি সাধন না জানি ভজন
নিজ গুনে করগো কৃপা
ওগো মা ॥'

[সূত্র: সং. গান– অষ্টক আসর বন্দনা]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে আসর বন্দনার পর শুরু হয় ছুট গান তার পরপরই গাওয়া হয় মূল পালা গান। পালা গান শেষে শুরু হয় ডুয়েট গান এবং সব শেষে কমেডি (স্থানীয় ভাষায় কমিক) দিয়ে আসর সমাপ্ত হয়ে থাকে।

২: ২.৪ অষ্টক দল

অষ্টক গান শুরুর ন্যূনতম এক মাস পূর্বে এ গানের দল গঠন করে নিত্যকার অনুশীলন শুরু হয়ে থাকে। একেকটি দল ১০ থেকে ১৫ টি পালা প্রস্তুত করে যা চৈত্র মাসের দেউল বা নীল পূজাতে পরিবেশন করা হয়। দল গঠন করতে যন্ত্রশিল্পী ছাড়া আট সংখ্যক শিল্পী এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মোট বারো থেকে চৌদ্দজন শিল্পী থাকে। তবে প্রমোটার ছাড়াই এ ক'জন শিল্পীর প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া প্রতিটি অষ্টক গানের দলে একজন পরিচালক থাকে, যাকে মাস্টার বলা হয়। যিনি হারমোনিয়ামের সাহায্যে সুর, তাল, লয়কে নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিটি গান বাজান এবং পরিচালনা করে থাকেন। মাস্টারের কাছে গানের পদগুলো রক্ষিত থাকে। আরও থাকেন ঢোলোক বাদক যার বাজনাতে মোহিতো হয়ে অনুশীলন চলাকালীন সময়েও রাতের বেলা দর্শক শ্রোতার আগমন ঘটে শ্রুতিমধুর এ গান পরিবেশন দেখা ও শোনার জন্যে। এছাড়াও অষ্টক দলে থাকে বাঁশি বাদক এবং জুড়ি বাদক প্রভৃতি।

২: ২.৫ মঞ্চ ও পরিবেশন সময়

অষ্টক গানের জন্য প্রাচীনকাল থেকেই আলাদা কোনো মঞ্চের ব্যবস্থা থাকে না। বাড়ির উঠানে, মন্দির প্রাঙ্গণে এ গান পরিবেশিত হয়। যেখানে গান পরিবেশিত হয় তার চতুর্দিকে সাধারণ দর্শক আসন গ্রহণ করে। বসার জন্য সাধারণত নাড়া বা পল, পাটের চট বিছানো হয়। শিল্পীদের বসার জন্য বেদেপাটির (খেজুর পাতা দ্বারা নির্মিত বসার আসন বিশেষ) ব্যবস্থা থাকে। শিল্পীরা যে পথ দিয়ে আসরে প্রবেশ করেন তার বিপরীত দিকে বসার ব্যবস্থা করা হয়। আলোক সজ্জার জন্য আসরের দু'পাশে দু'টি বাঁশের খুঁটিতে হ্যাজাগ ঝুলিয়ে এছাড়া মাটির পাত্রে তুষের আগুন জ্বালিয়ে আসর আলোকিত করা হয়। তবে নীল পূজার অষ্টক পালা দিনের আলোতে পরিবেশিত হওয়ায় এ সকল ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। উক্ত আয়োজনে কোনোরূপ শব্দযন্ত্রের ব্যবস্থা থাকে না ফলে শিল্পীরা সকলেই উচ্চ স্বরে এ গান পরিবেশন করে থাকে। অষ্টক পরিবেশনের ক্ষেত্রে পালার উপর নির্ভর করে সময় নির্ধারণ করা হয়। যেমন: কাহিনী নির্ভর পালাতে সর্বনিম্ন এক থেকে দেড় ঘন্টা সময় লাগে। তবে আসর শেষ করতে সর্বমোট সময় প্রয়োজন হয় তিন থেকে চার ঘন্টা। চড়ক বা নীল পূজার জন্য প্রতি বাড়িতে গিয়ে যে অষ্টক পরিবেশন করা হয় তার ক্ষেত্রে সময় লাগে সর্বোচ্চ আধাঘন্টা। এখানে অধিকাংশ সময় কাহিনী সংক্ষিপ্ত করে অষ্টকের ছুট গান গাওয়া হয়।

২: ২.৬ সাজসজ্জা ও উপকরণ

ভিন্নধর্মী সাজসজ্জা অষ্টক গানে পরিলক্ষিত হয়। নৌকা বিলাস পালায় ব্যবহৃত নীল রংয়ের ব্যবহার সম্পর্কে দেখা যায় শ্রীরাধা সহ সখীগণ যখন মথুরার হাটে দধি-দুগ্ধ বিকিকিনীর জন্য তরী মধ্যে যমুনার জলে

Dhaka University Institutional Repository

ভাসমান তখন আকাশের কালো মেঘ দৃশ্যত হয়। মেঘ দেখে সখীগণ বিচলিত হলে পারের কাণ্ডারি শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

> "উপায় একটা আছে; ঐ যে নীল শাড়ি পরে নৌকার মধ্যে যে সখী বসে আছে,
> ওর নীল শাড়ি খুলে যমুনার জলে ভাসিয়ে দাও। তাহলে দেখবে মেঘের অবসান ঘটবে।"
>
> [সূত্র: সং. গান নং– ৩৪]

'অষ্টক গান এক প্রকার লোকজ গীতি-নাট্য। লোকজ বলার কারণ এর নৃত্য, গীত, পোশাক, রূপসজ্জা ইত্যাদির কোথাও কোনো মার্গীয় (শাস্ত্রীয় সংগীত ও নাট্যের একটি ধারা) ছাপ নেই। মাস্টার ছাড়া প্রায় সব শিল্পীর মুখে পুরু মেকাপ থাকে। রূপসজ্জায় সাধারণত পাউডার, আলতা, কাজল, কালি, সাদা রং ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সামর্থ অনুযায়ী দলগুলো পোশাক তৈরি করে থাকে।'[১৬] আদিতে অষ্টক গানে মহিলা শিল্পীর অংশ গ্রহণ না থাকায় পুরুষরা মহিলা সেজে অষ্টক গান পরিবেশন করতো। ওড়না দিয়ে চুল বানিয়ে, কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরে মেয়েদের মতো সাজসজ্জার মাধ্যমে তারা নিজেকে এমন ভাবে প্রস্তুত করতো, যাতে পুরুষ না মহিলা তা বোঝার উপায় ছিল না। উপকরণ হিসেবে 'প্রত্যকটি পালার জন্য একটি করে প্রতীক ব্যবহার করা হয়, যেমন: রাম রাবণের যুদ্ধে তীর-ধনুক, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঢাল তলোয়ার, চন্ডিদাস-রজকিনী পালায় ছিপের মাথায় সুঁতা এবং বড়শি স্থানে পাট দিয়ে বানানো একটি ফুল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।'[১৭] প্রতিটি দলে একজন লম্বা লেজওয়ালা হনুমান চরিত্র সাজানো হয়ে থাকে। যিনি পালাটি আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য হনুমানের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে দেখায়। কখনও শ্রোতা মন ভারাক্রান্ত হলে একজন কমিক অভিনেতা এসে রসের কথাবার্তার মাধ্যমে শ্রোতাকে হাসি-আনন্দে মাতিয়ে তোলেন।

২: ২.৭ ধারক ও বাহকদের সামাজিক অবস্থান

সামাজিক ভাবে অষ্টক গানের শিল্পীদের আদি সমাজে স্থান করে নিতে কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। আদিতে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরাই এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে অনেকের অভিমত। বৃহত্তর যশোর খুলনা অঞ্চলের আদি বাসিন্দারাই অষ্টক গানের ধারক ও বাহক, একথা নিশ্চিত। বংশ পরম্পরায় হিন্দু নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মাঝে এ গান স্বল্পাকারে ছিলো বলেও অনেকের ধারণা। তৎকালীন সময়ে খুলনা অঞ্চলের মুসলমান লবন ব্যবসায়ীদের (মালাঙ্গী) মাঝেও এ গানের প্রচলন দেখা যায়। বর্তমানে সুশিক্ষিত সমাজে এ সকল মানুষ চাকুরির সন্ধানে এলাকার বাইরে অবস্থান করায় আগের মতো অষ্টক গান ধরে রাখতে না পারলেও বছরের নির্দিষ্ট সময়ে গ্রামে গিয়ে অনেকে এখনো এ গান পরিবেশন করেন। যশোর অঞ্চলে আজও নিজের ভালোলাগা-ভালোবাসা থেকে ধনী-গরিব একসাথে এই গান পরিবেশন করেন। যশোর জেলার মনিরামপুর থানার কীর্তনিয়া মঞ্জুশ্রী'র সাথে আলাপ

Dhaka University Institutional Repository

কালে তিনি জানান যে, এখানে এখন বিশেষ ব্যবস্থাপনায় অষ্টক দল গঠিত হয়েছে। যারা এ গানে অংশ গ্রহণ করছেন তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও যুক্ত রয়েছে।

২: ২.৮ যন্ত্র ও যন্ত্রশিল্পী

গীত, বাদ্য, নৃত্য এই তিনের সমন্বয়ে সংগীত, একথা সংগীতের সংজ্ঞাতে উল্লেখ আছে। তাই প্রত্যেকটি গানেই কোনো না কোনো বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। বাদ্যযন্ত্র ছন্দ ও রস সৃষ্টির মাধ্যমে গানের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। চড়ক পূজার বিশেষ বাদ্য ঢাক আর এ জন্য চড়ক পূজার অষ্টকে ঢাকের ব্যবহার রয়েছে। 'ঢাক অষ্টক গানের মূল বাদ্যযন্ত্র। এ সম্পর্কে একটি গানে তার উল্লেখ রয়েছে — ঢাকেতে পড়িল বাড়ি, সজনে ফুটে যায়।'[১৮] অষ্টক গানে হারমোনিয়াম, ঢোলক, খমক, আঁড়বাঁশি, দোতারা, প্রেমজুড়ি, কাঁসি কখনও কখনও বেহালা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে এসব অঞ্চলে খমকের ব্যবহার এখন আর নেই।

২: ২.৯ অষ্টক পালা পরিবেশন শৈলী ও সৌন্দর্য

এই পালা পরিবেশনের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নিয়ম পালিত হয়ে থাকে। যেমন: চৈত্র মাসের শুরু থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল বাড়িতে নিরামিষ খাবার চলে, বিশেষ করে যারা অষ্টক গান করে থাকেন তারা বাধ্যতামূলক ভাবে নিরামিষ আহার গ্রহণ করবেন, এটা চিরায়ত নিয়ম তৈরি হয়ে রয়েছে সেই আদিকাল থেকে। বৃহত্তর যশোর অঞ্চলে আজও সেই নিয়ম পালিত হয়ে আসছে। অষ্টক পালা বন্দনার পর গান আরম্ভ হয়। নৌকা বিলাস পালায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের এক অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায়। সখীদেরকে উপলক্ষ করে রাধার সাথে প্রেমের অপূর্ব রূপায়ণ এখানে সুনির্দিষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের যে মহীমা তা রাধা-কৃষ্ণের মিলনের পূর্বরাগ হিসেবে নৌকাবিলাস একটি উপসর্গ মাত্র। রাধা এবং তার সখীরা মথুরার হাটে যখন দধি-দুগ্ধ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে চলেছেন, তখন খরস্রোতা যমুনা নদী পারের নিমিত্তে পারের কাণ্ডারী শ্রীকৃষ্ণকে অনুনয় করছেন—

'পার কর হে সুজন নায়ে
হাটের বেলা যাইগো বয়ে
দাওনা ত্বরা পার করিয়ে
দধি-দুগ্ধ যাই বেচিতে॥'

[সূত্র: সং. গান নং– ৩৪, বৃন্দে গীত]

পরপারে যাওয়ার কথা এ পালায় বর্ণিত হয়েছে অতি সুচতুর ভাবে। সখীরা কৃষ্ণের সাথে পারের কড়ি নিয়ে যুক্তি তর্কের একপর্যায়ে রাধা সখীদেরকে অন্য পারঘাটে যাওয়ার কথা বললে সখীরা তখন জবাবে নিম্নোক্ত বাণী পরিবেশন করে। এ বাণীর মধ্য দিয়ে সেই পরপারের কাণ্ডারী, স্বয়ং ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে—

Dhaka University Institutional Repository

‘কোন ঘাটে পার হবি যেয়ে
সকল ঘাটের একই নেয়ে।
ভবের ঘাটের তরী লয়ে
পার করে দেয় অন্তিম কালে॥’

[সূত্রঃ সং. গান নং– ৩৪, বৃন্দে গীত]

এখানে কড়ির কথাও উল্লেখ রয়েছে। যা ঈশ্বর চিন্তায় আত্ম নিবেদনের কথা বোঝানো হয়েছে। অর্থ-কড়ি এই জাগতিক পৃথিবীতে প্রয়োজন হলেও পরপারে এর কোনো মূল্য নেই যার জন্য আত্ম নিবেদনে সম্পৃক্ত থাকাটাকেই কৃষ্ণের বাণীতে নির্দিষ্ট —

‘ষোলো আনা হওয়া চাই
রতি পয়সা কম না পড়ে
ষোলো আনা হওয়া চাই॥’

[সূত্রঃ কৃষ্ণ গীত, সং. গান নং– ৩৪]

এরই মধ্য দিয়ে যমুনায় রাধা-কৃষ্ণের যুগল মিলন সংঘটিত হয়। নিধুবনে কৃষ্ণ-কালী পালায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের আর এক নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। এখানে ভক্তের ডাকে ভগবান যে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন তা সাহিত্যের রূপকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লোকসংস্কৃতির ধারায় রাখালিয়ার বাঁশের বাঁশি যে নারীর মনের আকুতি তা সাংগীতিক মূল্যে বিচার্য —

‘বেলা অবেলা কভু নিরালা
গাঁয়ের রাখালরে তোর বাঁশি কেনে বাজে॥
ফুল ছাড়িয়া কান্দেরে অলি ফুলের কলি মরে লাজে
বাঁশি জানেনা যে মোর হিয়া কি যেন কি যাই রে॥
আমার ঘুম আসে না মন বসেনা কাজে রে
রাখাল কিশোর অবেলায় তোর বাঁশি ক্যানে বাজে॥’

[সূত্রঃ রাধা গীত, সং. গান নং– ৩৫]

উল্লিখিত পঙ্‌ক্তি গুচ্ছের মধ্য দিয়ে প্রিয়ার ব্যকুলতাকে বোঝানো হয়েছে। সংসার জীবনে যে জটিলতা মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত তৈরি হয় তা কুটিলার বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে —

‘ওলো পাকা চোর এ সব নিলা (লীলা) তোর

Dhaka University Institutional Repository

এই লোক সমাজে কয়দিন (কতদিন) রাখবি ঢেকে।
তিন দিনের চাঁদ দুয়োরে বসে
ও চাঁদ দেখে সর্বলোকে।
বুঝি এ কথা জানেনা কেউ
গাঙ্গে মরে গাঙ্গের ঢেউ রে॥
আজ সাত সকালে দেখলাম নিজের চোখে রে
কুল মজানী, সাধে কি আর পাড়ার লোকে বলে॥'

[সূত্র: কুটিলা গীত, সং. গান নং– ৩৫]

প্রতিনিয়ত রাধার উপর নজরদারী করা তার কাজ। অহমিকা যে মানুষের মনকে কলুষিত করে তা কুটিলার ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে এবং ভালোবাসার জন্যে ভক্তিভাব ও উদারতার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা এ বাণীতে স্পষ্ট—

'শিকের পরে ননীর হাঁড়ি গো,
সেথায় ঠাকুর নামে রাখি।
সেই ননী তোর নাগরকে
বল চুরি করে আর খাওয়াবি নাকি?'

[সূত্র: কুটিলা গীত, সং. গান নং– ৩৫]

যে আরাদ্ধ দেবতার জন্য কুটিলা ননী রেখেছে আর সে ননী স্বয়ং ভগবান এসে গ্রহণ করছেন, তা কুটিলা তার নিজের অহংবোধের জন্যে অনুভব করতে পারলো না এ কথা এখানে স্পষ্ট। এর পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণ প্রেমে ব্যাকুল রাধা বলছে—

'কার ননী কার দেবতায় খায় গো
ও তার কি বলিব আমি
কার ঘরে কি হলো চুরি
চুরির কথা জানে অন্তর্যামী॥'

[সূত্র: রাধা গীত, সং. গান নং– ৩৫]

প্রকৃতি রূপে রাধাকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দানের জন্য তিনি স্বামী আয়ানের ভয় দেখিয়ে পালিয়ে যাবার প্রস্তাবে রাধিকা অস্বীকৃতি জানালে শ্রীকৃষ্ণ তখন ভক্তের প্রেমে সিক্ত হয়ে কালী রূপ ধারণ করলেন—

Dhaka University Institutional Repository

‘বাঁশি আজ আমি বনমালা মুণ্ড মালা
গতিহারা আজ নরকে মেঘ মেলা
ছিলেম শ্যাম হয়েছি শ্যামা।’

[সূত্রঃ সং. গান নং–৩৫ কৃষ্ণ গীত]

বাঙালির ব্রতপার্বণের মধ্যে অষ্টক গান গ্রাম্য সমাজের এক অনবদ্য সৃষ্টি। যা মানুষের বিনোদনের জন্যই শুধু নয়, মাঙ্গলিক বিষয় গুলিকে এর সাথে যুক্ত করে লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য মণ্ডিত লোকসংগীকে করেছে সমৃদ্ধ। যশোর অঞ্চলের অষ্টক গান আজও ষড়ঋতুর বাংলাকে আলাদা ভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়। লুপ্তপ্রায় এ সংগীত আজ শিল্পীর অভাবে ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচার প্রসারের অভাবে এ গান তেমন দৃষ্টিগোচর হয় না। সরকারী উদ্যোগে গানগুলো সংগ্রহের প্রচেষ্টা করলে হয়তো একদিন স্মৃতিবহ এই অষ্টক গান আগামী প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলা লোকসংস্কৃতির একটি ধারা হিসেবে আজীবন টিকে থাকবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কবিগান

বাংলাদেশ কবিগানের প্রাণ কেন্দ্র। গ্রামাঞ্চলে এখনও প্রায় প্রতি রাতে কবিগানের আসর বসে। দুইজন শিল্পীর উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে দর্শক মনে আনন্দ সঞ্চারের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে এ গান গাওয়া হয়ে থাকে। আদিতে এ গান ছিলো ঈশ্বর কেন্দ্রিক কিন্তু সময়ের স্রোতে বিবর্তিত হয়ে তা আজ সমাজ সচেতনতার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে চলেছে। 'উনিশ শতকের শেষাংশ থেকে বিশ শতকের প্রথমাংশ পর্যন্ত প্রায় একশত বছর কবিগানের এক স্বর্ণযুগ পেরিয়ে নানা প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে এ গান আজও বিলুপ্ত প্রায় হয়ে টিকে আছে।'[১৯] প্রাসঙ্গিক ভাবে যশোর জেলার লোকগানের কথা উল্লেখ করলে কবিগান তার প্রাণ হিসেবে সর্বাগ্রে অবস্থান করে। কবিগান প্রতিযোগিতামূলক গান, যা তাৎক্ষণিকভাবে রচিত। এ গান কবিতার ছন্দে সুরের প্রক্ষেপণে উদ্ভাসিত হয়ে দু'জন গায়ক প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে উপস্থাপন করে। কবিগানকে অঞ্চল ভেদে কবির লড়াইও বলা হয়ে থাকে। দলের প্রধান সরকার এবং সহযোগীদেরকে বলে দোহার। ঢুলি কবিদলের বিশেষ আকর্ষণ। 'রণজিৎ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কবিগান ও কবিয়াল' গ্রন্থে কবিগানের সংজ্ঞা ও ব্যাপ্তি এবং পরিধি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'কবিগান একাধারে গান, বিতর্ক, সমালোচনা ও পর্যালোচনাও বটে। গণমনের নানান দ্বন্দ্ব, নানান সমস্যা, নানান ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেন কবিয়ালরা। শাস্ত্রীয় বহু প্রসঙ্গের মধ্যকার পরস্পর বিরোধী, অসামঞ্জস্যপূর্ণ উক্তি এবং বক্তব্যগুলি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করে কবিয়ালরা বিষয়বস্তুর সত্যের কাছে শ্রোতাদের নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।'[২০] কবিগান বা কবির লড়াইয়ে ডাক্, মালসী, সখীসংবাদ, কবি, টপ্পা, পাঁচালি, জোটক, ভোর বা গোষ্ঠ, মাথুর ইত্যাদি পর্বের অবতারণা হয়ে থাকে। তবে, প্রতিযোগিতামূলক এ গানের পাল্লায় টপ্পা ও পাঁচালিই মূল আকর্ষণ।

২: ৩.১ কবিগানের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

কবে, কখন, কোথায়, কিভাবে কবিগানের উৎপত্তি হয়েছিলো তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যায় না, তবে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞ জনেরা। কবিগানের উদ্ভব সম্পর্কে সুকুমার সেনের মত, "অষ্টাদশ শতাব্দীর বহুপূর্ব্ব হইতেই ছড়াকাটিয়া ঢোল কাঁসির সঙ্গতে গান করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। পরে এইরূপ বাঁধা ছড়ার সাহায্যে আসরে উত্তর-প্রত্যুত্তর বা বাকোবাক্য পদ্ধতি চলিত হয়। ইহাই দাড়া কবি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে অশিক্ষিত তর্জাওয়ালাদের হাত হইতে দাড়া কবি শিক্ষিত গীত রচয়িতাদের হাতে পড়িয়া কতকটা ভদ্রসমাজের উপযুক্ত হইল। আসরে বসিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নোত্তর গান রচনার ধারাও প্রবর্ত্তিত হইল। ইহাই 'কবিগান'। এইরূপ গীত যাঁহারা করিতেন তাঁহারা কবিওয়ালা নামে উল্লিখিত হইয়া থাকেন।"[২১]

'কবিগানের আদি কবিয়াল গোঁজলা গুঁই। তাঁর আবির্ভাব অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। 'সংবাদ প্রভাকর' এ ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর দু'টি গান প্রকাশ করলেও জন্মস্থান বা কুলবৃত্তি সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য দিতে পারেননি। কবিগানের বিশেষ উন্নতি ঘটে হরু ঠাকুর (১৭৪৯-১৮২৪), নিতাই বৈরাগী (১৭৫১-১৮২১), রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮), ভোলা ময়রা (১৮-১৯ শতকের সন্ধিকাল), এ্যান্টনি ফিরিঙ্গি (১৮-১৯ শতকের সন্ধিকাল) প্রমুখের হাতে। পূর্বে কবিগানের যে চাপান-উতোর হতো কবিয়ালগণ তা পূর্বেই রচনা করে নিতেন। রাম বসু সর্বপ্রথম এটিকে সত্যিকার লড়াইয়ের পর্যায়ে নিয়ে আসেন।'[২২] আগে কবির লড়াই অনেকটা যাত্রার মতো ছিলো। অর্থাৎ আদিকালে যাত্রা ছিলো গান নির্ভর যা সুরের সাথে কিছুটা অভিনয় সম্বলিত। তৎকালীন সময়ে সংলাপ উপস্থাপন করা হতো গানের ভাষায়। এই যাত্রার অনুকরণে কবিগান তৈরি হলেও অভিনয় বর্জন করে শুধুমাত্র সুরকে কেন্দ্র করে উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে কবিগান মঞ্চে ঠাঁই পায়। 'বস্তুত আঠারো-উনিশ শতকের সন্ধি লগ্নেই কলকাতা ও পল্লীবঙ্গে কবিগানের সংযোগ সৃষ্টি হয়। এমনকি 'কবিগান' শব্দটিও উনিশ শতকের গোড়ার দিককার। বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'–এ রাধা ও কৃষ্ণের যে উক্তি-প্রত্যুক্তি পাওয়া যায় তা কবিগানের 'খেউড়' বা 'জোটের পাল্লা'র অনুরূপ। উদাহরণ স্বরূপ দান খণ্ডের ৪ সংখ্যক গানের কিছু অংশ—

কৃষ্ণ: গুণত সুন্দরী রাধা পাঞ্জীর বাখান।
যোলো শত কুতঘাটে মোর মহাদান॥
রাধা: এবেঁ রাজা হয়িল ধনের কাতর।
পথে মহাদাণী থুয়িল হেন আছিদর॥
কৃষ্ণ: আছিদও নহোঁ রাধা এ মতীএঁ থীর।
এ তীন ভুবনে নাহিঁ আহ্মার বীর॥
রাধা: এ বোল বুলিতে কাহ্নাঞিঁ মুখে লাজ বাস।
এভোঁহো নাহিঁ ঘুচে তোর মুখে দুধবাস॥

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে কবিগান যাত্রা থেকে উদ্ভূত। সুশীল কুমার দে যাত্রার সঙ্গে পাঁচালিকেও কবিগানের সম্ভাব্য পূর্বসূরিরূপে বর্ণনা করেন। ঝুমুর গানের অঙ্গ-বিভাগ প্রায় কবিগানেরই অনুরূপ। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ঝুমুর গানকেই কবিগানের প্রকৃত উৎস বলে নির্দেশ করেছেন। বিষয়গত দিক দিয়ে শাক্ত এবং বৈষ্ণব গান যথেষ্ট প্রাচীন। কবিগান একসঙ্গে দুটোকেই আত্মস্থ করে।'[২৩] যুগ বিভাজনে কবিগানের উৎপত্তি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করলে যে চিত্রটি দাঁড়ায় তা নিম্নরূপ—

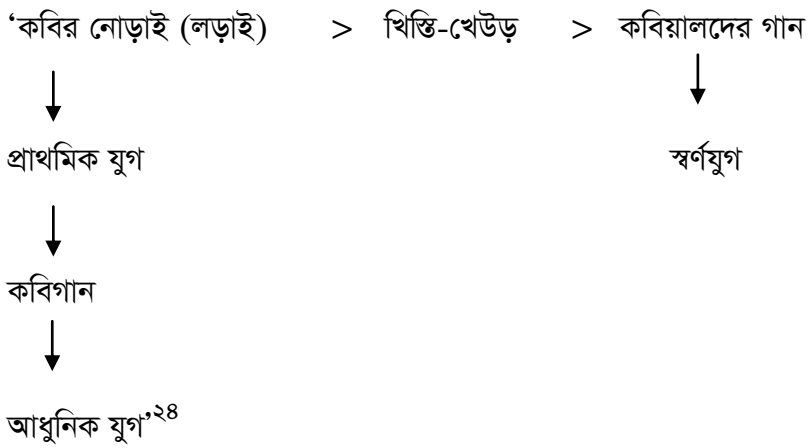

‘কবির নোড়াই (লড়াই) > খিস্তি-খেউড় > কবিয়ালদের গান

↓ ↓

প্রাথমিক যুগ স্বর্ণযুগ

↓

কবিগান

↓

আধুনিক যুগ’[২৪]

পূর্বে কবিগান খিস্তি-খেউড় সম্বলিত থাকলেও সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে ভাষা এবং সুরের মাধুর্যতায় তা স্থান করে নিয়েছে সুধী সমাজে। কবিগান এমন এক ধরনের গান যার মধ্য দিয়ে লোক ও নাগরিক জীবনকে করেছে একত্রিত এবং বাংলার গৌরবময় যাবতীয় সংগীত-ঐতিহ্যকে করেছে সমৃদ্ধ। মানব জীবনের আনন্দ-বেদনার কথা এই গানের বাণীতে ঠাঁই পেয়ে সুরের মূর্চ্ছনায় বিভূষিত হয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের মানুষের মনের কোণে এক বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে তৎকালীন সময় থেকে, যার ফলে প্রচার প্রসারে এর পরিধি বিস্তৃতি লাভ করেছে।

২ : ৩.২ অবিভক্ত বাংলার কবিগান

অবিভক্ত বাংলায় কবিগান ঠিক কখন থেকে শুরু হয়েছিল তা নির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় না। তবে ধারণা করা হয়, তৎকালীন বাবুদের মনোরঞ্জনের নিমিত্তে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিতর্কমূলক এই কবিগান পরিবেশিত হতে শুরু করে। বিতর্কমূলক এই গান আদিরস নির্ভর খিস্তি-খেউড় পূর্ণ ছিলো। সুর ও কথার ব্যঞ্জনায় সৃষ্ট গান প্রথমত সাধারণ খেটে খাওয়া মানস মনে তো বটেই, একটু দেরিতে হলেও বাবুদের মনোরঞ্জনের নিমিত্তে খুব সহজেই মাঠ থেকে কাছারিতে স্থান করে নেয় এবং উভয় বাংলায় ভীষণ জনপ্রিয়তাও অর্জন করে। অবিভক্ত বাংলার কবিগান সম্পর্কে বিভিন্ন জন মত পোষণ করেছেন বিভিন্ন ভাবে। অধ্যাপক যতীন সরকার ‘বাংলাদেশের কবিগান’ গ্রন্থে লিখেছেন, “পশ্চিমবঙ্গের কবিগানের যে প্রধান চারটি অঙ্গ— আগমনী বা উমা সঙ্গীত, বিরহ, সখীসংবাদ ও খেউড়। তার মধ্যে প্রথম তিনটি রবীন্দ্র সৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছিলো, পরিহার করেছিলেন তিনি অশ্লীল গালি-গালাজ পূর্ণ খেউড়কে।”[২৫] তৎপরবর্তী সময় থেকে কবিগান দু’টি ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে (১) আদিরস সম্বলিত (২) আদিরস বর্জিত। প্রথমত যাঁরা আদিরস সম্বলিত প্রাচীন ধারাকে কেন্দ্র করে গান পরিবেশন

করতেন তাঁরা পূর্ববঙ্গ কেন্দ্রিক নিচু স্তরের কবিয়াল, অন্যথায় যাঁরা আদিরস বর্জিত নান্দনিক ভাষায় গান করেন তারা নিজেদেরকে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক উঁচু স্তরের কবিয়াল বলে ভাবতে শুরু করেন।

বাংলাদেশে কবিগানের যাত্রাকাল সম্পর্কে নানাবিধ মতের ভিত্তি রয়েছে। 'কবিয়াল বিজয় নারায়ণ আচার্য (১৮৬৮-১৯২৭) কবিগানের উৎপত্তি কাল সম্পর্কে ১৩২৩ বঙ্গাব্দের (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে) আষাঢ় মাসে প্রকাশিত 'সৌরভ' পত্রিকায় লিখেছেন, 'অনেকে অনুমান করেন যে, বিখ্যাত কবি নারায়ণ দেবের 'পদ্মপুরাণ' বা 'মনসার ভাসান' রচনার কিছুকাল পূর্ব হইতে এ স্থানে (ময়মনসিংহ) কবিগানের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে।'[২৬]

কবি রসরাজ তারক চন্দ্র সরকার (জন্ম বর্তমান নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলা ১৮৪৫ এবং মৃত্যু ১৯১৫) পূর্ববঙ্গের কবিগানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান। পিতা কাশিনাথ সরকারের কাছে কবিগানের হাতেখড়ি। তৎসময়ে কবিগান ছিলো আদিরস বা খিস্তি-খেউড় পূর্ণ। তিনি খিস্তি-খেউড় পূর্ণ কবিগানের আসরে পাল্লার পক্ষে-বিপক্ষে গান বর্জন করলেন। তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহলে, জমিদার শ্রেণি তাঁর এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করেন। স্বল্প শিক্ষিত তারক চন্দ্র শাস্ত্রজ্ঞানের অগাধ পাণ্ডিত্যে খেটে খাওয়া কৃষিজীবী থেকে সুশিক্ষিত মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে কবিগানের প্রতি বিরূপ মত পোষণ করলেও শেষ জীবনে তাঁর "লোকসাহিত্য" গ্রন্থে বলেছেন, "আমরা সাধারণ এবং সমগ্র ভাবে কবি দলের গানের সমালোচনা করিয়াছি। স্থানে স্থানে সে সকল গানের মধ্যে সৌন্দর্য এবং ভাবের উচ্চতাও আছে।"[২৭]

২ : ৩.৩ যশোর অঞ্চলে কবিগানের প্রচলন

যশোর অঞ্চলে কবিগানের প্রচলন নিয়ে বিশিষ্টজনের মতের উপর নির্ভর করলে দেখা যায় মতানৈক্য রয়েছে, আবার অনেকে সহমতও প্রকাশ করেছেন। যেমন: যদুনাথ ভট্টাচার্যের মতে, 'সীতারাম রায়ের রাজধানীতে (মাগুরা অঞ্চল) অন্যান্য সংগীতানুষ্ঠানের সঙ্গে কবিগানেরও আয়োজন করা হতো।'[২৮] সীতারাম রায় আঠারো শতক উত্তর কিছুকাল অবধি জীবিত ছিলেন। প্রসঙ্গত আলোচনায় একমত হলে যশোর অঞ্চলে যে আঠারো শতকে কবিগানের উন্মেষ হয়েছিলো এবং তা অদ্যাবধি বর্তমান এ মতে সহমত পোষণ করা চলে। 'হাফ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থে গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য দাবি করেন যে, ১৪৬৪ সালে রথযাত্রার সময়ে (জুলাই মাসের দিকে) যশোর জেলার ভাটকলাগাছি গ্রামে হরিদাস ঠাকুর তথা যবন হরিদাস এবং নিত্যানন্দ কোঠী তাদের নিজ নিজ দল নিয়ে সংগীত প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।'[২৯] পরিবেশিত এই গান সময়ের স্রোতে যশোর ভূমির গণ্ডি পার করে শান্তিপুর হয়ে নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হয়। 'গঙ্গাচরণের ধারনা নবদ্বীপ থেকে চুঁচুড়া হয়ে কলকাতায় গিয়ে এই গান ক্রমে কবিগান বা কবির লড়াইয়ে পরিণত হয়।'[৩০] বৈষ্ণব আন্দোলনেও এই গান বিশেষ ভূমিকা রাখে। যুক্তির প্রাবল্যে আর সরল রসময় সুর ব্যঞ্জনে সাধারণ মানুষের হৃদয়কে সহজেই আন্দোলিত করতে সমর্থ হয়। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবিয়াল কাশিনাথ সরকার, সূর্য নারায়ণ, কালীচরণ এবং

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের কবিয়াল অক্ষর দাস বৈরাগী, আনন্দ সরকার, কালীচরণ দাস, পঞ্চানন দত্ত, রাস মোহন দাস, সূর্য কুমার চক্রবর্তী, তারক চাঁদ সরকার। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবিয়াল বিজয়কৃষ্ণ অধিকারী, নবীন বসু, মধুসূদন সরকার।'[৩১] এসব কবিয়ালদের হাত ধরে যুগবিভাজনের ধারাবাহিকতায় পরম্পরা হিসেবে ধীরে ধীরে এ গানের প্রতি আগ্রহের ফলে যশোর অঞ্চলে কবিগানের উদ্ভব ও প্রচলন শুরু। কবিগানের উদ্ভব ও বিস্তৃতির রূপরেখায় এ গানকে নিম্নোক্ত ভাগে বিন্যস্ত করা যায়—

'(ক) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত– প্রাথমিক যুগ

(খ) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ– স্বর্ণ যুগ

(গ) বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও তৎপরবর্তী– আধুনিক যুগ'[৩২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যশোর অঞ্চলে কবিগানের চর্চা ছিলো এবং শেষার্ধে তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এ সময়ই ছিলো কবিগানের স্বর্ণযুগ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী এতদাঞ্চলে কবিগানের বিষয়বস্তুতে আমূল পরিবর্তন করে এক নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেন। বলা যায়, তিনি কবিগানের আধুনিকায়ন করে একটি স্বতন্ত্র রসবোধ সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠিত করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তৎপরবর্তী অর্থাৎ আধুনিক যুগে এসেও এ ধারাবহিকতা লক্ষণীয়। বর্তমান সময়ে কবিয়াল বিজয় সরকারের ধারাবাহিকতাকে সামনে রেখে যারা কবিগান পরিবেশন করছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন গোরাচাঁদ সরকার, নিশিকান্ত বৈরাগী, সঞ্জয় মল্লিক প্রমুখ।

২ : ৩.৪ কবিগানের আসর ও গায়ন পদ্ধতি

কবিগানের আসরও অষ্টক গানের মত করে তৈরিকৃত। এর এক পাশের অংশ দিয়ে কবিয়াল ও দোহাররা প্রবেশ করেন। আসর সাধারণত চতুষ্কোণ হয়ে থাকে। বড় প্যান্ডেলের মাঝখানে মাটি বা কাঠের মঞ্চ অপেক্ষাকৃত উঁচু করে তৈরি করা হয়, মাথার উপরের অংশে সামিয়ানা টাঙানো থাকে এবং নীচে বসার জন্য নাড়া, কোথাও কোথাও বেদেপাটির ব্যবস্থাও থাকে। দর্শকের উপর নির্ভর করে মঞ্চ তৈরি করা হয়। কখনো খোলা মাঠে, কখনো মন্দির প্রাঙ্গণে, কখনো বাড়ির আঙিনায়, আবার কখনো অডিটোরিয়ামে। খোলা জায়গায় মঞ্চ করা হলে মঞ্চের চারপাশে দর্শক-শ্রোতা অবস্থান করে।

কবিগান প্রতিযোগিতামূলক গান। কবিগানের আসরে দু'টি দল থাকে। দল পরিচালনাকারী প্রধান ব্যক্তি কবিয়াল বলে পরিচিত। প্রত্যেক দলে একজন করে কবিয়াল থাকে যিনি প্রতিযোগিতামূলক গানটি উপস্থাপন করেন। 'বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে এঁরা 'সরকার' বা 'কবির সরকারী' নামে পরিচিত। প্রতিটি দলে কবিয়ালের সঙ্গীদেরকে 'দোহার' বলা হয়। এছাড়া যন্ত্র সঙ্গতকারীদের মধ্যে ঢুলিই প্রধান।'[৩৩] কবিগান বেশ কয়েকটি অঙ্গে পরিবেশিত হয়ে থাকে। সেগুলো হলো 'ডাক, মালসী, সখীসংবাদ, কবি, টপ্পা, পাঁচালি, ধুয়া, এবং জোটের পাল্লা প্রভৃতি। এর মধ্যে মালসী, সখীসংবাদ এবং কবি নামের গানগুলোর গঠন কৌশল অভিন্ন।'[৩৪]

কবিগানের শুরুতেই যেকোনো একটি দলের দোহারগণ মঞ্চে এসে ডাক গানের মধ্য দিয়ে আসরের সূচনা করেন এবং ডাক গানের মতো একইভাবে মালসী গান পরিবেশন করেন। প্রথম ডাক-মালসী পরিবেশনকারী দলটি আসরের প্রথম দল হিসেবে বিবেচিত হবার পর দ্বিতীয় দল আসরে এসে একইভাবে গান পরিবেশন করে এবং তারা 'চাপান' বা 'বেড়' রূপে একখানা সখীসংবাদ গেয়ে যান। সখীসংবাদের অনুরূপ গোষ্ঠ, বিরহ, ভোর প্রভৃতি নামের গানও চাপান রূপে গাওয়ার রীতি আছে।

দ্বিতীয়বার কবিয়ালসহ প্রথম দল আসরে প্রবেশ করেন এবং 'চাপান' বা 'বেড়' দেওয়া সখীসংবাদের 'জবাব' বা 'উতোর' তাৎক্ষণিক ভাবে রচনা করে দোহারগণের সাহায্যে শ্রোতাদের গেয়ে শোনান। এরপর দ্বিতীয় দলের উদ্দেশ্যে রচিত একখানা গান 'কবি' চাপান রূপে উপস্থাপন করেন। দ্বিতীয় দলও একইভাবে সখীসংবাদের জবাব দিয়ে থাকেন।

তৃতীয়বার প্রথম দলের কবিয়াল সভায় টপ্পার মাধ্যমে একটা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক অথবা সমকালীন বিখ্যাত ব্যক্তির চরিত্রে নিজেকে রূপায়িত করেন এবং দ্বিতীয় কবিয়ালকে অন্য চরিত্রে আরোপিত করে মঞ্চে কয়েকটি প্রশ্ন রেখে যান। এরপর শুরু হয় মূল কবির-লড়াই। কবির টপ্পায় বর্ণিত প্রশ্নগুলোকে কবিয়াল পয়ার, ত্রিপদী ও ধুয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন এর নাম পাঁচালি। একই ভাবে দ্বিতীয় কবিয়াল আসরে আসেন এবং বিতর্কে অংশ নেন। অতঃপর একাধিক আসরে পর্যায়ক্রমে তর্কযুদ্ধ চলে। দুই দলের কবিয়াল তর্কযুদ্ধের মাধ্যমে একই অবস্থানে আসতে পারলে মিলন গানের মধ্য দিয়ে ইতি টানেন। বিজিত দলের কবিয়ালকে বিজয়মাল্য স্বরূপ কখনো কখনো স্বর্ণ অথবা রৌপ্য মেডেল এবং উপস্থিত শ্রোতা ও আয়োজক শ্রেণির মধ্য থেকে কেউ কেউ বিভিন্ন উপঢৌকন দিয়ে সম্মানিত করতেন।

২ : ৩.৫ কবিগানের পর্যায়

'(ক) ভবানী বিষয় বা বন্দনা, (খ) সখীসংবাদ, (গ) বিরহ এবং (ঘ) কবির টপ্পা।'[৩৫] এই চারটি পর্যায়ে কবিগান বিভক্ত করে গাওয়া হয়।

(ক) ভবানী বিষয় বা বন্দনা

কবিগানের সূচনা সংগীতকে ভবানী বিষয়ক বা ডাক গান বলা হয়ে থাকে। পূর্বে এই অংশে শ্যামা বা দুর্গার স্তুতি করে বন্দনা গাওয়া হতো। বন্দনা বা ডাক গানের উচ্চ সুর বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানে মিলেমিশে যে পরিবেশের সৃষ্টি করে, তাতে আসরের শ্রোতাদের মন আকৃষ্ট হয়। ডাক গান অনেকটা রাগ-রাগিণী নির্ভর হয়ে থাকে। বর্তমানে আসর বন্দনায় কবিয়ালরা তাঁদের গুরুকে এবং উপস্থিত শ্রোতাদেরকে নিবেদন করে গেয়ে থাকেন।

(খ) সখীসংবাদ

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বিরহকে কেন্দ্র করে সখীদের মাধ্যমে পরস্পরের খবরাখবর আদান-প্রদান করায় এ গান সখীসংবাদ নামে খ্যাত। কবিগানের এ অংশের প্রেম-বিরহ শ্রোতাদেরকে আন্দোলিত করে আবার আবেগাপ্লুতও করে থাকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কাহিনীর বিভিন্ন সময়ের অনুভবের ভিত্তিতে সখীগণের যে নানামাত্রিক নিবেদন তা এ অংশে প্রকাশ পায়।

(গ) বিরহ

কবিগানের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিরহ। এখানে কবিয়াল আবেগের অবস্থান তৈরি করে থাকেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিষয় ভিত্তিক ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেন। যা শ্রোতাকূলকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। অর্থাৎ আনন্দ উপভোগের মাঝে কিছুটা অশ্রুসিক্ত বাস্তবতায় ডুবে যাওয়ার ব্যবস্থা মাত্র। অধিকাংশ সময় এ পর্বটি লক্ষ্য করা যায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কাহিনী মূলক গীতি পর্বে।

(ঘ) কবির টপ্পা

কবিগানে টপ্পা একটি বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে শ্রোতাদের কাছে পরিচিত। অতীতে কবিগানের টপ্পা অংশ অশ্লীল কথাবার্তায় পূর্ণ ছিলো যা তৎসময়ে খেউড় গান নামে সমধিক পরিচিত ছিলো। পরবর্তী সময়ে সুধী সমাজে কবিগানের স্থান হেতু খেউড় বর্জিত হয়ে সর্বজন গ্রাহ্য ভাষারূপ টপ্পা গানে স্থান করে নেয়। এ অংশে কবিয়াল দ্রুতলয়ে গানটি পরিবেশন করে থাকেন যা বাদ্যযন্ত্র সহযোগে এক অন্যমাত্রার সৃষ্টি করে। পূর্ববঙ্গের কবিগান তথা যশোর অঞ্চলের এই গীত ধারা পরিলক্ষিত হয়।

২: ৩.৬ কবিগানে যুগল মিলন

যুগলমিলনই হলো কবিপাল্লার সর্বশেষ পর্যায়। বন্দনা পরবর্তী সমস্ত সময়কে ঘিরে যা কিছু আলোচনা, চাপান ও উতোর পর্বের পরিসমাপ্তিতে সমঝোতার মাধ্যমে অবসান ঘটে কবিগানের যুগল মিলনে। উভয় কবিয়ালের জানা-অজানা ও জিজ্ঞাসাকে একপক্ষ এখানে স্বনির্বন্ধ চিত্তে স্বীকার করেন এবং ভরা আসরে তিনি তাকে বিজয় মাল্যে স্বীকৃতি দান করেন। বিজীত কবিয়াল স্বহাস্যে এই শিরোমণি কণ্ঠে ধরে এবং প্রতিযোগী পক্ষের সাথে সমস্বর মিলিয়ে উপস্থিত সুধী ভক্ত, আয়োজক, স্বীয় গুরু এবং সবিশেষ ঈশ্বরের জয়গানের মধ্যদিয়ে পাল্লার পরিসমাপ্তি ঘটায়।

২ : ৩.৭ বাঁধনদার

কবিগানের দলে বাঁধনদার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাঁধনদারের সৃজনশীলতার উপর নির্ভর করে দলের হার-জিতের বিষয়টি। ঊনিশ এবং বিশ শতকের কবিদলে লক্ষণীয়– কোনো কোনো দলে বেতন নির্ধারণ করে পেশাদার বাঁধনদার রাখা হতো। যেসকল কবিদলের সরকার উপস্থিত গান রচনায় পারদর্শী কমছিলেন বিশেষ করে

সেসব দলে অর্থের বিনিময়ে বাঁধনদার রাখার রেওয়াজ ছিলো। যিনি আসরে বিপক্ষ দলের প্রশ্নের উত্তর তাৎক্ষণিকভাবে রচনা করে দিতেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি ঊনিশ শতকের কবিয়াল 'এ্যান্টনি-ফিরিঙ্গি তাঁর দলে বাঁধনদার রাখতেন। তাঁর নাম ছিলো গোরক্ষনাথ।'[৩৬] কবিগানের বিভিন্ন পর্বে যে সকল চাপান উতোর গাওয়া হতো তার বেশিরভাগই রচনা করা হতো আসরে দাঁড়িয়ে। প্রশ্ন উত্তরের এই পর্বে কবিয়ালকে বিচক্ষণ প্রত্যুতপন্নমতিত্বের পরিচয় দিতে হতো।

২ : ৩.৮ দোহার

কবিগানের প্রাণ সহযোগী শিল্পীরা, যাকে কবিগানের ভাষায় দোহার বলা হয়ে থাকে। কবির সরকার একটি গান ধরলে তার সাথে সুরের রেশ ধরে গানটি দীর্ঘায়িত করাই দোহারের কাজ। কবিগানের আসর বন্দনা এবং মালসী গান পরিবেশনে দোহারের বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। দোহারের মধ্যে হারমোনিয়াম বাদকই প্রধান দোহার হিসেবে বিবেচ্য। কবির সরকার গান ছাড়ার সাথেই গানের সুর ধরে তা পরিবেশন করার শুরু এবং প্রধান কাজটা তিনিই প্রথম করেন। এ জন্য তাকে কবির ভাষায় ধরতাও বলা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে হারমোনিয়াম বাদককে সুকণ্ঠের অধিকারী হতে হয়। দোহারদের ক্ষেত্রে সুরের প্রতি বিশেষ সচেতন দৃষ্টি রাখতে হয়। অতএব বলা যায়, কবিগানের ক্ষেত্রে দোহার অন্যতম প্রধান এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২ : ৩.৯ বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রশিল্পী

প্রতিটি সংগীতের ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্রের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বাণী এবং সুরকে আকর্ষণীয় করতে বাদ্যযন্ত্র একটি অন্যতম মাধ্যম। দোহারের পরেই কবিদলে যন্ত্রশিল্পীদের অবস্থান। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ঢোল, প্রেমজুড়ি, কাঁসি, বেহালা, বাঁশি, সানাই এবং হারমোনিয়াম অন্যতম। যন্ত্র এবং যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে ঢুলি এক বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত। সময় সময় কবিদের মতো ঢুলিরাও আসর মাত করে দেয় এই গানে। 'বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অনেকে শখ করেও কবিগানের দলে বাঁশি বাজাতেন। এমনই একজন ব্যক্তি হলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এস এম সুলতান। কবিয়াল বিজয়কৃষ্ণ সরকারের বেশ কয়েকটি আসরে তিনি বাঁশি বাজিয়ে আসর মাতিয়েছিলেন।'[৩৭]

২ : ৩.১০ কবিগানের কাল ও উপলক্ষ

'সাধারণত আশ্বিন মাস থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কবিগানের জন্য প্রশস্ত সময়। এই সময় বাঙালির যাবতীয় উৎসব-অনুষ্ঠান, এমনকি বাঙালি হিন্দুদের পূজা-পার্বণেরও সময়। বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্ভবত এর মূল কারণ। জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত চার মাসে ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে।'[৩৮] তাছাড়া গ্রামীণ

কৃষিজীবী জনমানসই এ গানের মূল শ্রোতা হওয়ায় তাদের কর্মব্যস্ততার দরুণ এই সময়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান সমূহ আয়োজন করা কঠিন।

পূর্বে কবিগান সমস্ত দিবা-রাত্রের প্রহর হিসেবে পালাক্রমে গাওয়া হতো। প্রহরের হিসেবে সাধারণত একটি পালা চার প্রহর ব্যাপী পরিবেশন করা হতো। যা কিনা সময়ের আয়োজনে ১২ ঘণ্টা হয়ে থাকে। চলমান একটি পালার পরিসমাপ্তি ঘটলেও দর্শক মনের আকাঙ্ক্ষা যদি নিবৃত্তি না হতো তা হলে আয়োজক এবং কবিয়াল দ্বয়ের সমঝোতার মাধ্যমে তা আরও কিছু প্রহরে গাওয়া হতো। কবিয়াল দ্বয়ের পক্ষ-বিপক্ষের মতো শ্রোতাদের মধ্যেও পক্ষ-বিপক্ষ বিরাজ করতো। তবে সময়ের আবর্তে এখন আর প্রহরের হিসেব কষে কবিগান গাওয়া হয় না। বিভিন্ন উৎসব কেন্দ্রিক হওয়ায় কবিগানকে বারোয়ারি গান হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, রাসযাত্রা, দোলপূর্ণিমা, চৈত্র সংক্রন্তি, পহেলা বৈশাখ, কালী পূজা ইত্যাদি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে কবিগানের আয়োজন হয়ে থাকে। ব্যক্তি বিশেষে নিজ বাড়িতেও কবিগানের আয়োজন করে থাকে। বর্তমানে রাজনৈতিক কার্যে লোকসমাগমের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মেলার অনুষ্ঠান সূচিতে কবিগান একটি বিশেষস্থান করে নিয়েছে।

২ : ৩.১১ সামাজিক অবস্থানে ধারক-বাহক

অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন নিম্নমধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত, কৃষিজীবী নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ই এ গানের ধারক-বাহক। অতীতে কৃষিজীবী বা শ্রমজীবী মানুষেরা কবিগান চর্চা করতেন বা কবিয়াল ছিলেন। বর্তমানে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা কবিগানের ধারক-বাহক এ কথা বলা বাহুল্য, কেননা অধিকাংশ কবিয়াল এই সম্প্রদায়ের হলেও পেশাগত দিক বিবেচনা করলে অনেকেই এখন এ পেশায় নিয়োজিত। কবিগানের মাধ্যমে তারা সমাজে নিজেদের অবস্থানকে পরিবর্তন করে নিম্নবিত্ত থেকে উচ্চবিত্তে স্থান করে নিয়েছে। বর্তমান সমাজে এ সকল গানের শিল্পীরা যথেষ্ট সম্মানজনক অবস্থানে অধিষ্ঠিত।

২ : ৩.১২ শিল্পী সংখ্যা ও পোশাক

কবিগানে মূল কবিয়াল ছাড়া দোহার এবং যন্ত্রশিল্পীসহ মোট আট থেকে বারোজন কলা-কুশলী থাকে। কবিদলের এই মূল শিল্পীকে অনেকে সরকার বলেও সম্বোধন করে থাকেন। পোশাকের ক্ষেত্রে কবিগানের জন্য আলাদা বিষয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোনো কিছু নেই। তবে বেশির ভাগই ধুতি-পাঞ্জাবির সাথে কবিয়ালরা এক খণ্ড বস্ত্র (ওড়না বা উত্তরীয় বিশেষ) কাঁধে বা আধা-আধি করে গলায় ঝুলিয়ে রাখেন। এটা সাদা বা গেরুয়া রঙের হয়ে থাকে। এছাড়া দোহাররা একই ধরনের পোশাক পরিধান করে থাকেন যা দর্শক শ্রোতাদের চোখে আলাদা করে পরিচয় বহন করতে সক্ষম হয়।

২ : ৩.১৩ পৃষ্ঠপোষক ও আয়োজক

কবিগান নিম্নবিত্তের গান, তদুপরি এর পৃষ্ঠপোষক অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চবিত্ত শ্রেণি। জমিদার বা ধনিক ব্যক্তি ছাড়াও কখনও কখনও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা সমষ্টিগত ভাবে কবিগানের আয়োজন করে থাকেন। কবিগান আয়োজনে খরচ বেশি নয়, কারণ লোকজ মানুষের চাহিদার মাত্রা কম হওয়ায় এসকল শিল্পীদের যাতায়াত এবং থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হলেই চলে। পারিবারিক দিক বিবেচনা করে সামান্য পারিশ্রমিক দান করলে শিল্পীরা মহানন্দে উৎসাহিত হন। আয়োজনের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় দেখা যায় বিভিন্ন উৎসব-পার্বণে আয়োজকরা তাদের সাধ্যমতো এ গানের আয়োজন করে থাকেন।

কবিগান যশোরসহ বাংলার প্রায় সকল অঞ্চলে এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে তার দক্ষ শিল্পসত্ত্বার উপর নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের যশোর অঞ্চলে এখনো প্রায় বিভিন্ন উৎসবে এ গানের আয়োজন করতে দেখা যায়। অধ্যাত্ম ও মানবীয় প্রেমের যুগলবন্ধনে সামাজিক শিক্ষায় কবিগানের অবদান অপ্রতুল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জারিগান

জারিগান স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতির এক অপূর্ব নিদর্শন। গানের বিষয়বস্তু মুসলিম পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর। মহর্‌রমের করুণ কাহিনী এ গানের মূল উপজীব্য। জঙ্গনামা ও কারবালার শোক কাহিনী জারিগানে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বিষয়ের নিরিখে এই গান সকল ধর্মাবলম্বীদের নিকট সমভাবে সমাদৃত। মুসলমানদের বীরত্বের কাহিনী, শরীয়ত-মারফত, হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী এ গানের বিষয় বিচার্য। 'আরবি 'জারি' শব্দের অর্থ প্রচার। কোনো বিষয় প্রচার বা জাহির করাকে সাধারণত জাহিরী বা জারি বলা হয়। পল্লির সাধারণের মধ্যে ধর্মীয় বাণী, নীতি-নৈতিকতা প্রচারের জন্য জারিগানের আবির্ভাব হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।'[৩৯] মহর্‌রম মাসের দশম দিনে এ গান গাওয়া হয়ে থাকে। মুসলমানেরা এই দিনে নিজের দেহে ধারালো ছোরা দিয়ে আঘাত করে মহর্‌রমের কাহিনী বর্ণনা করে থাকে। নগ্ন পায়ে রাস্তায় হেঁটে মহর্‌রমের কষ্টকে অনুভব করতে চায় এবং সাধারণ মানুষকে মহর্‌রম বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকে। অনেকে মনে করেন হিন্দু ধর্মের চড়ক পূজা উপলক্ষে যেমন ধারালো অস্ত্রের উপর দিয়ে হাঁটা, পিঠে লোহার বড়শি বিঁধে চরকাতে ঝুলে ঘোরা, আগুনের উপর দিয়ে লাফ দেওয়া ইত্যাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে ধর্ম শিক্ষা ও বিশ্বাস জাগ্রত করে, তেমনই এ আয়োজন করা হয়ে থাকে লোক শিক্ষার জন্য। কবিগানের অনুকরণে জারিগান গাওয়া হয়ে থাকে বলেও অনেকে মনে করেন। জারিগান যারা পরিবেশন করেন তাদেরকে বয়াতি বলে।

২ : ৪.১ জারিগানের উদ্ভব

কবে থেকে জারিগানের সূচনা তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও উদ্ভব ও প্রাচীনত্বের দিক থেকে এ গান অতিপ্রাচীন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, 'কারবালায় শত্রুবেষ্টিত হোসেন ফোরত নদীতে নেমে অঞ্জলিবদ্ধ জল মুখে দিতে গিয়ে জলের অভাবে শত শত শিশুর আর্তনাদ ও সহকর্মীদের শহীদ হওয়ার কথা মনে পড়ায় তিনি জল পান না করে শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করেন।'[৪০] এই আত্মত্যাগের কাহিনী মানবতার শিক্ষা দেয়। জারিগানে যখন এই কাহিনী বর্ণিত হয় তখন শ্রোতারা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং ইমাম হোসেন তাঁদের কাছে হয়ে ওঠেন আদর্শ। কবি জসীম উদ্‌দীনের (১৯০৩-১৯৭৬) মতে, 'বাংলাদেশে যে এত সহজে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিলো আর এদেশের মাটিতে শিকড় গাড়িতে পারিয়াছিলো তাহা হয়তো এই সব জারিগানের প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছিলো।'[৪১] মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্যের মতে, আঠারো শতকের মধ্যভাগে জারিগান প্রচলিত। 'ড. এস. এম. লুৎফর রহমান মনে করেন যে, পুঁথি সাহিত্যের উদ্ভবের অনেক আগে থেকেই জারিগানের উদ্ভব এবং তা সম্ভব হয়েছিলো গ্রামের আসরে পালাগান, মঙ্গলগান, পাঁচালি গীত হতে দেখে মুসলমান কবিরা এ থেকে জারিগান রচনার অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকবেন। আর বিষয় হিসেবে সন্নিবেশিত করে থাকবেন কারবালার

কাহিনী। মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্যও তাই-ই মনে করেন। তাঁর মতে, 'হিন্দুর রামায়ণ অথবা চণ্ডীগীতের পরিবর্তে বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় এই জারি প্রচলন করিয়াছিলো। প্রচলিত রামায়ণ গান ও চণ্ডী-গীতের সঙ্গে জারিগীতের সাদৃশ্যই ইহার প্রমাণ।'[৪২] 'জারিগান নিপট ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত কাহিনী হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান উভয়ের আলোড়ন সৃষ্টিকারী সংগীত হয়ে উঠতে অসুবিধে হয়নি।'[৪৩] মূলত কারবালার কাহিনী নিয়ে জারিগান রচিত হলেও পরবর্তীতে তা বিভিন্ন বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত হয়েছে শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্তে।

২ : ৪.২ যশোর জেলায় জারিগানের উদ্ভব

তৎকালীন পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বৃহত্তর যশোর জারিগানের উৎপত্তিস্থল হিসেবে বিশেষভাবে খ্যাত। 'প্রায় পৌনে দুইশত বছর আগে জারিগান উৎপত্তি লাভ করে মধ্য যশোর এলাকায়।'[৪৪] উনিশ শতকে পাগলা কানাই, ইদু বিশ্বাস প্রমুখ এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বয়াতি ছিলেন। পাগলা কানাইয়ের শিক্ষাগুরু ছিলেন যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার রসুলপুর গ্রামের নয়ান ফকির। পাগলা কানাইয়ের বাণীতে আমরা এ দৃষ্টান্ত দেখতে পায়—

'ওস্তাদ আমার নয়ান ফকির
সভায় দিলাম পরিচয়।'[৪৫]

জমিদার ও ধনীক শ্রেণির ব্যবসায়ী লোকজনই এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। কালক্রমে জমিদারি প্রথার বিপর্যয় ঘটলে গ্রাম্য ধনী ব্যক্তিরাই এর আয়োজন শুরু করে। কিন্তু আধুনিকতার ছোঁয়ায় জারিগানের অবস্থা বিশেষ সঙ্কটে অবতীর্ণ হয়। যশোর অঞ্চলে আদিকালের মতো ধর্ম এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়াবলী নিয়ে আর এ গান গাওয়া হয় না। এখানে জারিগান হয় দুই দলের মধ্যে কোনো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও মেলা এবং উৎসবকে কেন্দ্র করে জারিগান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট আয়োজক ছাড়াও গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা আদায় পূর্বক এবং প্রয়োজন অনুসারে দর্শনার্থীদের কাছ থেকে ফি আদায়ের মাধ্যমে অনেক সময় এ ধরনের আয়োজন করে থাকে তাদের বিনোদনের লক্ষ্যে।

২ : ৪.৩ জারিগানের আঞ্চলিকতা

আঞ্চলিকতা লোকসংগীতের প্রাণ। জারিগান লোকসংগীতের বিশেষ একটি ধারা এর ফলে আঞ্চলিকতার প্রভাব এ গানে মূখ্য। বৃহত্তর যশোরের বিভিন্ন অঞ্চলে জারিগানে ভাষারীতির পরিবর্তন ঘটে থাকলেও কাহিনী বর্ণনার কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না। ঝিনাইদহ, কালিগঞ্জ, অভয়নগর, নড়াইল, মনিরামপুর, কেশবপুর, ঝিকরগাছা, শার্শা প্রভৃতি অঞ্চলে এ গান পরিবেশনের রীতি এক থাকলেও ভাষা ও সুরের মধ্যে বেশ পরিবর্তন লক্ষণীয়। এ ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জারিগান বিভিন্ন নামে পরিবেশিত হয়। যেমন: চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকায় জারিগান ঝাণ্ডিগান নামে পরিচিত। মূলত জারিগানের উৎপত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করলে যা বোঝা যায়

তাতে ইসলাম ধর্মের মর্মবাণী ও সমাজ সচেতন মূলক বাণীকে সুরের মাধ্যমে মানুষের মাঝে পৌঁছে দেওয়া মূল উদ্দেশ্য। যার ফলে অঞ্চল ভেদে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ মূখ্য। কারণ স্বশিক্ষিত মানুষের মাঝে তাদের কথ্য ভাষার প্রয়োগ হলে সহজে অনুমেয় হবে। ফলে ভাষারীতিতে আঞ্চলিকতার প্রাধান্য বেশি।

২ : ৪.৪ শিল্পীদের জীবন, জীবিকা ও পোশাক

'যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গাঙড়া গ্রামে জন্মগ্রহণকারী এ অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট বয়াতি হলেন মোঃ মনিরুদ্দিন মোড়ল। পেশায় কৃষক। স্ত্রী, তিন ছেলে ও তিন মেয়ে নিয়ে তার পরিবার। শুধু বয়াতি পেশা নিয়ে সংসার চালানো খুবই কঠিন বলে আলাপ-চারিতায় তিনি প্রকাশ করেন। সব মৌসুমে জারিগানের আসর হয় না বিধায়, জীবিকার তাগিদে তাকে এর পাশাপাশি কৃষিকাজ করতে হয়। সাধারণত শীত মৌসুমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কমিটি, মেলার আয়োজক কর্তৃক এ ধরনের আয়োজনে তাদের ডাক আসে। বর্তমানে তারা (প্রায় ১০ জনের একটি দল) রাত প্রতি একটি পালায় ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা সম্মানী পেয়ে থাকেন। এখনো পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব বয়সের দর্শকদের নিকট জারিগানের কদর বেশি বলে তিনি জানান। পূর্বে জারিগানে ধর্মীয় বিষয় প্রাধান্য পেলেও আশির দশক থেকে আধুনিকতার রং লেগেছে এ গানে। এছাড়া আগে এ ধরনের অনুষ্ঠান ঘরোয়া বা অতি সাধারণ ভাবে আয়োজিত হলেও এখন তা বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে মঞ্চ সাজিয়ে করা হয়ে থাকে। কথা প্রসঙ্গে আবেগাপ্লুত হয়ে তিনি একটি জারিগানের বন্দনার কিয়দাংশ গেয়ে শোনান। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো—

'ওরে প্রথমে বিসমিল্লা বলে জারি করলাম শুরু
ঐ যে অনাথের নাথ আল্লা দোয়া করবেন গুরু
আহা গুরু কল্পতরু তুই সংসারের সার
এই যে পড়িয়াছি অচল ভরা আমায় কর পার গো
লা ইলাহা ইল্লালা মোহাম্মদ রসুল॥'[৪৬]

পোশাক হিসেবে সাধারণত পাঞ্জাবি, পায়জামার সাথে কখনও কখনও একটি চাদর ঘাড়ে ঝুলিয়ে গান পরিবেশন করেন বয়াতিরা। তবে দোহার যারা থাকেন তাদের পরনে লুঙ্গি ও গায়ে পাঞ্জাবি মাঝে মাঝে আবার ফতুয়ার সাথে ঘাড়ে একটা গামছাও দেখা যায়। অনেক সময় দর্শকের অনুরোধে এবং কাহিনীর বর্ণনায় বিখ্যাত বয়াতি, শিল্পীর গান গেয়ে প্রতিপক্ষের প্রশ্নের যৌক্তিক জবাব ও শ্রোতামনের আকুতি পূরণ করতে হয়, যাকে ছুট গান বলে। নির্দিষ্ট বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে দুই বয়াতি অবস্থান নেন যা কবিগানের অনুরূপ। 'প্রত্যেকেই তার শিক্ষা, জ্ঞান, মেধা উপস্থাপন এবং প্রত্যুৎপন্নমতি দ্বারা অপরকে পরাজিত করার প্রতিযোগিতায় সবিশেষ চেষ্টা করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ: পুরুষ বনাম নারী বিষয়ক কোনো পালায় পুরুষের পক্ষের বয়াতি হয়তো পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বলতে চাইলেন—

‘আদির আদিত্যে আদম

সৃষ্টি করেছে দয়াময়

বাপকে ছোটো বল কোনো কথায়?’

এর বিপক্ষ বয়াতি নারীর প্রশংসা সূচক উক্তি করতে গিয়ে হয়তো বললেন—

‘নারীর বক্ষে আছে সুধা

খেয়ে বাঁচ সব জনা

মাকে কেউ নিন্দা কর না।’

এভাবেই পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি, তর্ক, গানের পাশাপাশি ধুয়া, নৃত্য প্রভৃতিও চলতে থাকে এক একটি জারিগানের আসরে।’[৪৭]

২ : ৪.৫ জারিগানের বিষয়বস্তু

জারিগানেরও আছে নির্দিষ্ট গীত-পদ্ধতি। প্রথমে গানের পদ্ধতি কেমন ছিল তা জানা না গেলেও এই গান ধর্ম ভিত্তিক ছিল একথা বিভিন্ন ইতিহাস, নথি, পুঁথি ইত্যাদি থেকে দৃষ্ট হয়। যা পরবর্তীতে সামাজিক বিষয় অবলম্বনে রচিত হতে শুরু করে। লোকসংগীতের অন্যান্য ধারার প্রভাবে ‘আধুনিককালের পরিবেশনা ও সূচনা পর্বের পরিবেশনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তখনকার গান ছিলো কোরানের আয়াত বা আরবীয় কাহিনী, তাতে থাকতো ধুয়া, আরেব, ফেরতা, খুখড়া, বাহির চিতেন প্রভৃতি অংশ। আধুনিককালে সেসব পরিবর্তিত হয়ে জারিগানের ভাব-ভঙ্গির মধ্যে প্রবেশ করেছে যাত্রার ভাব।’[৪৮] বাংলা লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারার কথা আমরা বিভিন্ন পর্বে উল্লেখ করেছি। তেমনই বিভিন্ন লোকসংগীতের পারস্পরিক সাদৃশ্য রয়েছে। তবে কোন গান কোন গানের প্রভাবজাত তা নির্দিষ্ট ভাবে নির্ণয় করা কঠিন। জারিগান বাংলা লোকগানের তেমনই একটি ধারা। যার সুরের আঙ্গিক বিষয়ের বৈচিত্র্য ভাবের অবস্থান কোন না কোনো লোকধারার সাথে প্রকরণগত সাদৃশ্যের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। প্রভাবের জাতবিচারে এ গানকে আমরা পাঁচালি ও পালাগানের প্রতিবেশজাত বলতে পারি। প্রকরণগত সাদৃশ্য রয়েছে কবি ও কীর্তনের সঙ্গে। ব্যবহৃত সুরের আঙ্গিক লক্ষ্য করলে দেখা যায় রামায়ণ গানের সুর।

২: ৪.৬ জারি ও ধুয়াজারি

জারিগানের বিশেষ একটি অংশ ধুয়াজারি। এ গানের মধ্যে দোহারদের অংশগ্রহণে মূল গায়েনের গাওয়া অংশকে ধুয়া ধরে গাওয়াকে অবলম্বন করে উৎপত্তি হয়েছে ধুয়াজারিগানের। এ গানের স্রষ্টা হিসেবে পাগলা কানাই বিশেষভাবে খ্যাত। ধুয়াজারি গানেও একইভাবে সমাজের কথা তথা সাধারণ মানুষের জীবনচারিতা ফুটে উঠেছে বারংবার। বৃহত্তর যশোর অঞ্চলে এ গানের উল্লেখযোগ্য রচয়িতা ও শিল্পীরা হলেন— সোনাউল্লাহ, মোসলেম উদ্দিন, প্রফুল্ল গোঁসাই, মাছিম মোল্লা, তছির উদ্দিন বয়াতিগণ। মনিরুদ্দিন মোড়ল আলাপ কালে আরও জানান যে,

জারিগানের মতো এ গানও একজন বয়াতি উপস্থাপনের সাথে সাথে সকলে তাঁর সুরে ধুয়া ধরে গানের রেশ বৃদ্ধি করে থাকেন এবং সাথে হাত নেড়ে হালকা ছন্দে নৃত্য পরিবেশন করেন। এর আঞ্চলিক শব্দ ধুয়োগান। কর্মসংগীত হিসেবে এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে সর্বসাধারণের কাছে। উদাহরণ হিসেবে একটি কর্মসংগীত উল্লেখ করছি—

'ওলো ছোটো বউলো ছোটো বউ তোরে আমি বলি
সব দুঃখ তোর ঘুচে যাবে আমার সাথে গেলি-লো ছোটো বউ
কার জন্যে দাঁড়াইছো রাজ পথে?
ছোটো বউলো ছোটো বউ তোর কপাল দেখি খালি–
সোনার টিকলি গড়ে দেব আমার সাথে গেলি॥'[৪৯]

এমনিভাবে কর্মের মধ্যে সকলে সমস্বরে ধুয়া ধরে এ গান পরিবেশন করে থাকেন তাঁদের কর্মের উদ্দীপনার লক্ষ্যে।

২ : ৪.৭ গানের মৌসুম ও সময়

'বেশিরভাগ সময় শীত মৌসুমে এ আয়োজন রাত্রে বেশি সংখ্যক লক্ষ্য করা যায়। মূল শিল্পীদের জন্য একটি মঞ্চ প্রস্তুত করা হয় এবং দর্শনার্থীদের জন্য সামিয়ানার নীচে বসার ব্যবস্থা থাকে। দর্শকরা মঞ্চের চারিদিক গোলাকৃতি হয়ে ঘিরে বসে। অনেক সময় রাত ৮ বা ৯ টা থেকে শুরু হয়ে ফজরের আযান অর্থাৎ ভোর পর্যন্ত এ অনুষ্ঠান চলতে দেখা যায়। দুই দলে দু'জন বয়াতি বা মূল গায়েনসহ তাদের প্রত্যেকের সাথে ৯ থেকে ১০ জন করে দোহার থাকে।'[৫০]

২: ৪.৮ গায়নরীতি

প্রতেকটি গানের মতো জারিগানেরও নির্দিষ্ট গায়নরীতি রয়েছে। আদিতে এ গান মাঠে বা কর্মস্থলে পরিবেশিত হতো। আধুনিককালে গ্রামের সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাপে তা মঞ্চে কবিগানের মতো আসর করে পরিবেশিত হয়। এ গানের বয়াতি হাত নেড়ে গানের ভাব অনুসারে গান পরিবেশন করে থাকেন। তিনি শ্রোতাকে আকর্ষণ করতে কখনো কখনো নাচের ভঙ্গিও প্রদর্শন করেন। দোহারগণ গানের সুরে ধুয়া ধরে বয়াতির সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে থাকেন।

২: ৪.৯ বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রশিল্পী

'হারমোনিয়াম, ঢোল, করতাল, কাশি, বাঁশি, কর্নেট ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র জারিগানে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে মূলবয়াতি গানের সাথে নিজে একটি কাঠের দ্বারা নির্মিত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন যাকে খঞ্জরী বলে।

এটি জারিগানের প্রধান বাদ্যযন্ত্র। দোহারগণ গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে থাকেন। এছাড়াও সামর্থ অনুযায়ী অর্থের বিনিময়ে আলাদা যন্ত্রশিল্পী রাখা হয়ে থাকে।'[৫১]

২ : ৪.১০ গানের আসরের বিবরণ

'জারিগান পরিবেশনের জন্য আসর তৈরি করা হয় চারিধার খোলা উন্মুক্ত মঞ্চে। মঞ্চের চারপাশে শ্রোতারা বেষ্টন করে বসে। রাতের আসর হারিকেন জ্বালিয়ে, সম্ভব হলে হ্যাজাগ লাইট দিয়ে আলোকিত করা হয়ে থাকে। আসর ছোটো হলে বাড়ির উঠান কিংবা ধান মাড়াইয়ের খোলেন এবং আসর বড় হলে খেলার মাঠ বা বটতলা ও হাটখোলা বিশেষ স্থানে এ গানের আয়োজন করা হয়। সাধারণত উন্মুক্ত আকাশের নীচে সামিয়ানা খাটিয়ে উপরে ছাউনির ব্যবস্থা করা হয়। শ্রোতাদের বসার জন্য নীচে বেদেপাটি কোথাও আবার নাড়া, পাটের চট পেতে উপরে কাপড় বিছিয়ে ব্যবস্থা করা হয়।'[৫২] আদিতে এ গান পরিবেশিত হতো মাঠে কর্মসংগীত হিসেবে পরবর্তীতে তা উঠে এসেছে মঞ্চে সাধারণ মানুষের মাঝে খুব জাকজমকপূর্ণ ভাবে। এ জন্য ব্যঙ্গাত্মক ভাবে বয়াতি রচনা করেছেন—

'আগে জারি ছিল ঘাটে আর মাঠে
এখন সেই সব হয়ে থাকে সুন্দর খাটে॥'

গানের কথায় ও সুরে শ্রোতারা সম্মোহিত হয়ে ক্ষেত্র বিশেষে আনন্দে জয়ধ্বনি করে ওঠে। গভীর রাত কিংবা সারা রাত ধরে গানের আসর চলতে থাকে। অনেক মুগ্ধ শ্রোতা আপ্লুত হয়ে শিল্পীদেরকে পুরস্কৃত করেন। বর্তমান সময়ে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ গানের বিলুপ্তি ঘটতে চলেছে। গ্রামাঞ্চলেও এখন আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। শ্রোতারা এখন আর এ ধারার গানের কোনো আয়োজন করেনা, যার ফলে শিল্পীরা উৎসাহ হারাতে বসেছে। নতুন করে জারিগানের শিল্পী সৃষ্টি হচ্ছে না, কারণ শ্রোতার অভাব। তবে সরকারী ভাবে উদ্যোগী ব্যবস্থাপনা না থাকলে একদিন হয়তো চিরতরে এ গানের বিলুপ্তি ঘটবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাউল গান

যশোর জেলার লোকসংগীতের ধারায় বাউল গান একটি অনবদ্য সৃষ্টি। মূলত এ জেলার পাশে কুষ্টিয়া (তদানীন্তন নদীয়া) জেলা অবস্থিত। লালনের ভাবধারায় বাউল গানের মোহনীয় সুরে সিক্ত এ জেলা। লালন পরবর্তী লোককবিদের মধ্যে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাউল লোকায়ত সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য ধারা। বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির যে বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তার প্রকাশ ঘটেছে এই সংগীতের মধ্য দিয়ে। বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে বাউলের সুর একাত্ম হয়ে মিশে আছে। মানব বন্দনার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর সাধনার আকুতি ফুটে উঠেছে বাউল সংগীতে। বাংলার কৃষিজীবী জনমানসের ধর্ম চেতনারই অনন্য বহিঃপ্রকাশ বাউল গান।

২ : ৫.১ বাউলের উদ্ভব ও বিকাশ

সংসারের প্রতি যাদের বিরাগ সৃষ্টি হয়েছে তারাই বৈরাগী বা বাউল নামে পরিচিত। বাউল শব্দের অর্থ পাগোল, উন্মাদ, ভাবোন্মাদ, প্রেমোন্মাদ প্রভৃতি। বাউলদের কখনো কোনো বিষয়-আশয়ের প্রতি লোভ-লালসা থাকেনা। বাউল সাধকেরা ঈশ্বরের নৈকট্য পাবার আশায় ব্যাকুল হয়ে গান করে থাকেন। 'উনিশ শতকের আগে বাউল সংগীতের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে তার আগেও যে বাউল মত ও বাউল গানের প্রচলন ছিলো এমন অনুমান করা গেলেও কোনো লেখ্যরূপ মেলে না।'[৫৩] শুরু থেকে বাউলরা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় স্মৃতি ও শ্রুতি অবলম্বন করেই সাধন ভজন করে আসছে। যা বাউল ধর্ম মতের এক সুদূর প্রসারি পথচলা। 'বাংলার হাজার বছর আচরিত লোকধর্ম, উদারনৈতিক চিন্তাদর্শ, বৌদ্ধতান্ত্রিক ও বৌদ্ধ সহজিয়ার সাধন-ভজন, ইসলামিক সুফি ও মরমিবাদসিক্ত মানবপ্রেম, বৈষ্ণব সহজিয়ার প্রেমোন্মত্ততা ও যোগতান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের মিশ্রণের এক সমন্বিত রূপ হিসেবে বাউল মত ও বাউল সাধনার উদ্ভব।'[৫৪] 'বাংলায় 'বাউল' শব্দটি নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। কারো মতে, সংস্কৃত 'বাতুল' থেকে বাউল শব্দটি বাংলায় এসেছে বলে মনে করা হয়। সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দের প্রাকৃত রূপ বাউল। বস্তুত বাউল ভাবের পাগল, রসের সাধক। এই অর্থে 'বাউরা' (অর্থ পাগল) কথাটির সঙ্গে ধ্বনি ও ভাবসাদৃশ্য রয়েছে। এই 'বাউরা' শব্দটিও বাউল বা বাতুলের অপভ্রংশ। বাউল সম্প্রদায় ভুক্ত এক শ্রেণির মুসলমান সাধকদের (সুফী ধর্ম প্রভাবিত) 'আউল' বা আউলিয়া বলে অভিহিত করা হয়।'[৫৫] 'বাউল গানের উৎসভূমি প্রধানত বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ্ এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, নাথগীতি, গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ প্রভৃতি আর মারফতি গানের উৎপত্তিস্থল সুফিবাদ।'[৫৬]

ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে, 'সতেরো শতকের মধ্যভাগ থেকেই বাউল মতের উদ্ভব।'[৫৭] বাউল ধর্মের উৎপত্তিকাল হিসেবে ক্রমপরিণতির ধারায় তিনি একটি খসড়া চিত্র উপস্থাপন করেছেন যা নিম্নরূপ—

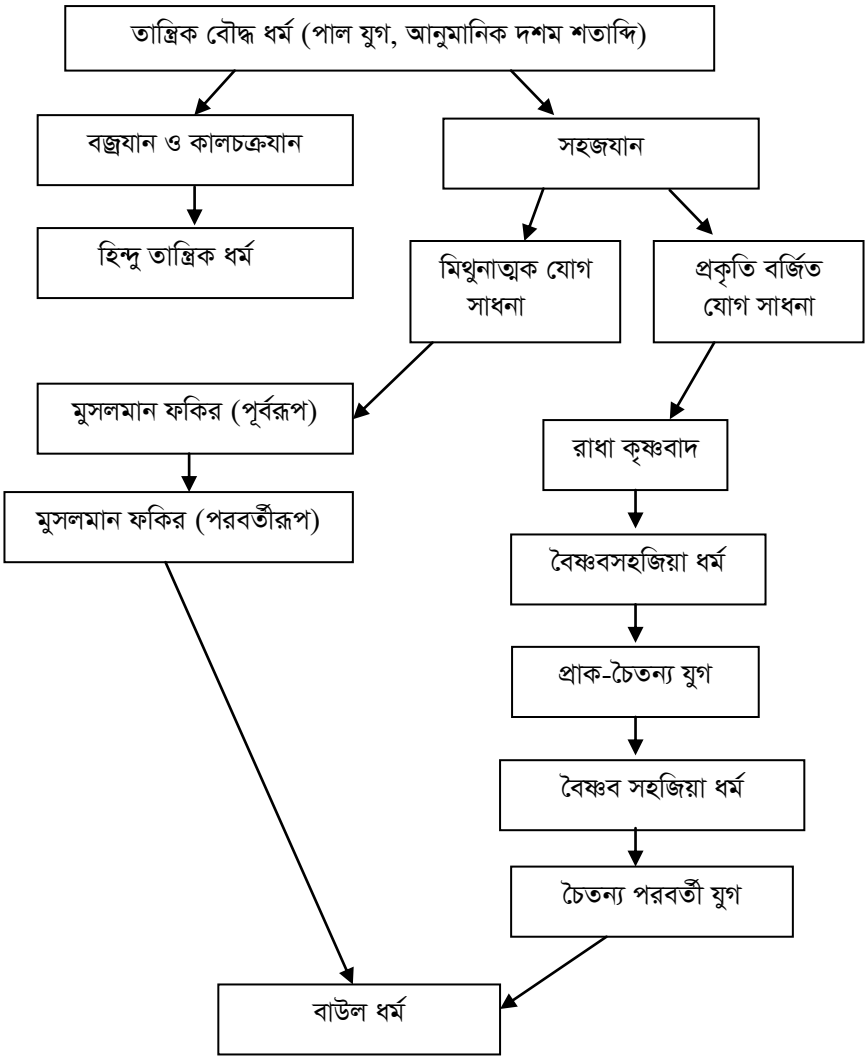

উল্লিখিত চিত্রে দৃষ্টি রেখে আমরা বলতে পারি বাউল গান সমাজসংস্করণের দর্পণ স্বরূপ। যেখানে আচরিত ধর্মকে নয় মানবজাতিকে শির রূপে স্থান দেওয়া হয়েছে। এ গান শুধু বিনোদনের জন্য নয় তার বাণীতে সমাজের দর্শন ও সংস্কৃতির স্বাক্ষ বহন করে। সকল ধর্মের প্রভাব বাউল মতবাদে আছে। আবার সকল ধর্ম ও দর্শনকেও এই বাউল মতবাদ প্রভাবিত করেছে। বাউলদের সাধন ভজনও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মত, তবে তা সংগীত নির্ভর। অতএব আমরা বলতে পারি বাউল গান একইসাথে ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, সংগীত ও সাহিত্য।

সুধীজনের ধারনা মাধববিবি ও আউলচাঁদই এই বাউল মতের প্রবর্তক এবং তাঁর শিষ্য নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রই পরবর্তীতে বাউল মত প্রচার ও জনপ্রিয় করে তোলেন। উনিশ শতকে লালন ফকিরের সাধনা ও সৃষ্টির মাধ্যমেই এর পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। পরবর্তীতে একই সময়ে মনমোহন রায় এবং 'কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬) যিনি ফিকির চাঁদ নামেই সমধিক পরিচিত, তার গান বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।'[৫৯]

রবীন্দ্রনাথই প্রথম শিক্ষিত সমাজে বাউল গানের পরিচয় ঘটান। যা তৎকালীন সময়ে তাঁর বহু লেখনিতে বাউল ধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন আখড়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ তথা দেশের বাইরেও এর প্রচার ও প্রসার লাভ করে। তবে বাউল একটি ঘরানা হিসেবে এক মত-পথের সৃষ্টি করেছে যা নিতান্তই গুরুমুখি হয়ে আজও রয়ে গেছে। বাউল শুধু গান নয় একথা পূর্বেও বলা হয়েছে। যার ফলে বলা যায়, বাউল বাণী প্রধান গান যার সুরের বৈচিত্র্যতা নেই। ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার ব্যকুলতায় সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠায় জাতি ধর্মকে উর্ধ্বে রেখে মানব ধর্ম তথা মানুষের কল্যাণের জয়গান করাই এর মূল। লালনের একটি বাণীতে আমরা দেখতে পাই—

'সত্য বল সু-পথে চল
ওরে আমার মন।'

২: ৫.২ যশোর জেলায় বাউল গান

কবে কখন কিভাবে এতদঞ্চলে বাউল গানের উদ্ভব হয়েছে তা নির্দিষ্ট ভাবে বলা না গেলেও এ কথা বলা যায় যে, লালন সৃষ্ট ধারার পথ ধরেই এ অঞ্চলে বাউল গানের উদ্ভব। বাউল কবি লালন সাঁইয়ের হাত ধরে বাউল গান প্রচারের ফলে যশোর অঞ্চলে এর সমৃদ্ধি লাভ করে। ফলে লালন পরবর্তী শিষ্যদের বেশিরভাগই যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমাধীন লোককবিদের ভিতর বাউলের প্রভাব দেখা দেয়। লালনের জন্মস্থান সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। অনেকে মনে করেন বৃহত্তর যশোরের ঝিনাইদহ অঞ্চলে লালনের জন্ম। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, মাঠপর্যায়ে তথ্যের সন্ধানে গেলে অনেক বাউল সাধক শিষ্য দাবি করেন যে, লালন সাঁই যশোর জেলার ঝিনাইদহ অঞ্চলের বাউল কবি। পরবর্তীতে তিনি কুষ্টিয়া অঞ্চলে বসবাস করেন। এক্ষেত্রে যশোর জেলার বাউল নিয়ে আলোচনায় লালনের গানের প্রাধান্য বেশি। যশোর জেলা নয় তথা বাউল বলতেই লালন সাঁই। এরপর যে সকল বাউল সৃষ্টি হয়েছে তা লালনেরই শিষ্য পরম্পরা। যশোর অঞ্চলের গানের আলোচনায় সব ধরনের গানে যে ভাটিয়ালি সুরের প্রভাব রয়েছে তা দৃষ্ট। মূলত ভাটিয়ালির করুণ রস সঞ্চারের ফলে মানব মনে ভাবের উদ্রেক ঘটে। বাউল গানেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন:

'আমি অপার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াময়
পারে লয়ে যাও আমায়॥'

সামাজিক প্রেক্ষাপটের উত্থান-পতনে বাউল গান সমাজ সংস্কারে ভূমিকা রেখেছে বারংবার। সমাজে নানা ধর্ম মত-পথ নিয়ে কথা উঠলে বাউল তার সঠিক পথ নির্দেশ করেছে। জাতি ভেদাভেদ নিয়ে লালন সাঁই বলেছেন —

'জাত গেল জাত গেল বলে
একি আজব কারখানা॥'

পরবর্তীতে লালন শিষ্যরাও জাত, ধর্ম নিয়ে নানা কথা উপস্থাপন করেছেন তারই অনুসৃত ধারায়। লালনের একনিষ্ঠ শিষ্য দুদ্দু শাহ্'র একটি গানে আমরা দেখতে পায়—

‘ধলা-কালার একই বীজ ভাই

সর্বজাতি যাতে হয় উদয়

কর্মগুণে এই সমাজে ভিন্ন গোত্র আখ্যা পাই॥’[৬০]

এখানে তিনি কর্মগুণকে জাতিভেদের উর্দ্ধে নিয়ে মানুষের মাঝে ভেদাভেদ ভুলে এক জাতি অর্থাৎ মানব ধর্মে ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। অর্থাৎ দুদ্দু শাহ্’র উপলব্ধির মধ্য দিয়ে বাউল মতের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজ, ধর্ম, জাতিভেদ সকল ধারায় তিনি লালনের আদর্শে অবগাহন করেছেন। তিনি বলেছেন —

‘হজ্জ করলে যদি যেত গুণা

মক্কায় জন্মিয়া কেউ পাপী হতো না॥’[৬১]

পুনর্জন্ম নিয়ে ধর্মকে উপসর্গ করে অনেকেই অনেক মতের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লালন সাঁই বলেছেন—

‘এমন মানব জনম আর কি হবে

মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে॥’

অর্থাৎ এই যে মানব জন্ম আর পাবে কিনা তার চিন্তা না করে পৃথিবীতে তুমি এসেছো, যে সময় পর্যন্ত তুমি এখানে অবস্থান করছো, সে সময়টুকু মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাও, যা তুমি যাবার বেলা তোমার সেই কৃতকর্মের গুণে মানব জাতি তোমাকে মনে রাখবে শ্রদ্ধার সাথে। পাঞ্জু শাহ্ গুরু লালন সাঁই’র আদর্শ শিরোধার্য করে সমাজকে তথা সমাজের মানুষকে জাগ্রত করার চেষ্টায় ব্যাকুল—

‘বাওহারে এক জুতের ঘর

মালটি সুন্দর দু’টি কাঠে বেঁধেছে ঘর কামিল কর

এক ঘরেতে গোলেমালে বসত করে ষোল জনে

একি চমৎকার॥’[৬২]

মূলত বাউল গান সব সময় ভাবতত্ত্বের উপর নির্ভর করে চলে। প্রতিটি বাণীতে মানব জাতিকে জ্ঞান সঞ্চার করাই এর লক্ষ্য। স্রষ্টাই সব কিছুর মূলে অবস্থান করছেন যেখানে মানুষ পৌঁছাতে পারে না। তাঁর ইশারায় জগৎ চলে সেই পরমাত্মাকে জানার এবং বোঝার চেষ্টাই বাউলের উদ্দেশ্য। বাউল সাধনার সাথে সংগীতের আত্মিক সম্পর্ক থাকায় সকল অঞ্চলের বাউলের করণকার্যে একইরূপ লক্ষিত হয়। ভাষাগত বৈচিত্র্যতায় পার্থক্যের বিচার শিরোধার্য। তাছাড়া অন্যরূপ আচারে একইরূপ দেখা যায়। বৃহত্তর যশোর অঞ্চলে যেসব বাউল রয়েছেন তারা প্রত্যেকেই সেই পরমাত্মার সাথে একাত্ম হওয়ার প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। সকল বাউল সাধন পদ্ধতি একই ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে তাই এ অঞ্চলের সাধকদের সাধন পদ্ধতিও আলাদা নয়।

২ : ৫.৩ বাউলের সাধন-ভজন

বাউলের সাধন-ভজন নিয়ে আলোচনার প্রাক্কালে বলা প্রয়োজন যে, প্রত্যেকটি ধর্ম মতের একটি নিজস্ব সাধন পদ্ধতি রয়েছে। বাউল তার ব্যতিক্রম নয়। সংগীত বাউল ধর্ম ও দর্শনের প্রধান বাহন। বাউলরা এমনই একটি সাধক সম্প্রদায় যারা সংগীত অর্থাৎ সুরকে অবলম্বন করে গুরুর মতাদর্শে সাধন-ভজন করে থাকে। গুরু তার শিষ্যকে সাধনার নানা স্তর সম্পর্কে জ্ঞান এবং শিক্ষা উভয়ই প্রদান করে যোগ্য করে তোলেন সংগীতের মাধ্যমে। সব সাধনাই যোগ নির্ভর। এখানে যোগ অর্থাৎ একমনস্থিত ধ্যানকে বোঝানো হয়েছে। আর এ যোগ সাধনার অন্যতম উপাত্ত হলো মানব দেহ। যার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নাড়ী। রক্ত মাংসে সৃজিত এই দেহকে অবলম্বন করেই বাউলের যত ধ্যানজ্ঞান। মানব দেহের অসংখ্য নাড়ীকে বাউল সাধকেরা নদীর সঙ্গে তুলনা করে তিনটি প্রধান উপাঙ্গে ভাগ করেছে। যা হলো– ইড়া, পিঙ্গলা বা যমুনা, ও সুষুম্না বা গঙ্গা। এ তিনের সমাহারে যে স্রোতস্বিনী, সাধকের ভাষায় তা মহানদী বাকি সবই উপনদী। দেহের উপর কর্তৃত্ব লাভের জন্য বায়ু চালিত এই ত্রিধারা নিয়ন্ত্রন করতে পারাই বাউলের সাধনা। বায়ু অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস। 'প্রশ্বাস হচ্ছে রেচক, শ্বাস হচ্ছে পূরক এবং দম অবরুদ্ধ করে রাখার নাম কুম্ভক। ইড়া নাড়ীতে পূরক, পিঙ্গলায় রেচক করতে হয়। দম ধরে রাখার সময়ের দীর্ঘতা-ই সাধকের শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। এর নাম প্রাণায়াম। ললাটদেশে আছে সহস্রদল পদ্ম। মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী শক্তির সঙ্গে এখানে পরম শিবের মিলন হয়। কুণ্ডলিনী হচ্ছে সাড়ে তিন চক্র করে থাকা মূলাধারস্থ সর্প।'[৬৩] যোগ সাধনার মধ্য দিয়ে সিদ্ধিলাভ করাই হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি অর্জন। এই সাধন-ভজন পদ্ধতিকে অনুসরণ করে বাউল সাধনার পর্যায়কে চার ভাগে ভাগকরা যায়। যথা— (ক) স্থূল (খ) প্রবর্ত (গ) সাধক ও (ঘ) সিদ্ধি।

বাউল সাধনার প্রথম স্তর স্থুল বা আত্মসমর্পণ। সাধনার প্রারম্ভকালে ভক্ত দেহ মুক্তি লাভের আশায় গুরুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করে। এরপর দ্বিতীয় স্তরে সমর্পিত শিষ্যকে গুরু নানা মাত্রিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এখানে তিনি সাধারণ জ্ঞানের চেয়ে দিব্যজ্ঞানের উপলব্ধি সম্পর্কে জ্ঞানদান করেন যাকে বলে প্রবর্ত। তৃতীয় স্তর সাধক তার নিজের মনকে স্থির করতে সক্ষম হয়, সাধনার এ পর্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাকে বলে সাধক। বাউল সাধনার শেষ এবং সর্বোচ্চ পর্যায় সিদ্ধি লাভ করা। সিদ্ধি লাভের ফলে সাধক ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দেহ-মন নিয়ন্ত্রণের অধিকার পায়। সকল বাউল সাধকেরা এই সাধন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন, তবে এই সাধন পদ্ধতিতে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বাউল প্রধানত দু'ধরনের (১) গৃহী ও (২) উদাসীন বা আখড়ার বাউল। গৃহী হোক বা উদাসীন, সকল সাধকই সেই আমিত্বকে জানার সন্ধানে এক মত-পথ অনুসরণ করে সিদ্ধি লাভের আশায় সাধনায় ব্রতী হন।

'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
তারে ধরতে পারলে মন বেড়ি দিতাম পাখির পায়॥'

বাউল কবি লালন সাঁই'র এই অমোঘ সত্য বাণী সাধকেরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে ধারণ করে চলে সেই অধরাকে খুঁজে পাবার আশায়। তারা বিশ্বাস করে সৃষ্টিকর্তা সর্বদা সর্বজীবে বিরাজমান। তারা সেই আমিত্বকে খুঁজে পেতে চায় তার সাধনার মধ্য দিয়ে।

২ : ৫.৪ বাউল কবি ও সাধক

যশোর জেলার বাউল কবিদের কথা বলতে গেলে লালন শাহ্'র নামটি সর্বাগ্রে চলে আসে। যদিও অনেকের অভিমত কুষ্টিয়ার বাউল কবি লালন। তদুপরি বিজ্ঞ জনের অভিমত হেতু ঝিনাইদহ মহকুমা যশোর জেলার অধীন হিসেবে আমরা বৃহত্তর যশোর অঞ্চলের কবি দাবি রাখতে পারি। যাঁর জন্ম গ্রহণ সমাজ তথা সমাজের মানুষ সর্বোপরি বিশ্বমানবতাকে যিনি এককেন্দ্রিভূত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর বাণীতে সব সময় মানব কল্যাণের কথা, বিশ্বমানবতার কথা জাগ্রত হয়েছে। ভেদাভেদ ভুলে মানুষ হিসেবে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীবকে যিনি প্রাধান্য দিয়েছেন প্রতিটি বাণীতে। যার স্বীকৃতি স্বরূপ তৎপরবর্তী সকল কবি তার পথ অনুসরণে ব্যাকুল হয়েছেন। বাউলের কোনো জাত নেই, কোনো ধর্ম নেই, নেই কোনো বাড়ি-ঘর। এমনই পাগল ঈশ্বর প্রেমী মানুষের ঠিকানা একটাই, সারা বিশ্বই তার ঘর। তবুও স্থানিক বিচারে ভৌগোলিক পরিকাঠামোয় আমরা যশোর অঞ্চলের বাউলকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করছি। লালন পরবর্তী বাউল কবিদের সম্পর্কে জানতে চাইলে বাউল মতলেব ফকির জানান, পাঞ্জু শাহ্ ফকির, দুদ্দুশাহ্ ফকির, চণ্ডীদাস গোঁসাই, পাগলা কানাই, বিনোদ গোঁসাই, পাঁচু শাহ্ ফকির, সত্যানন্দ পাগলা, পাগলা অধীর মালো, প্রফুল্ল গোঁসাই, শ্রীকান্ত ক্ষেপা, শুকচাঁদ শাহ্, জহরদ্দী শাহ্, কালাচাঁন ফকির, দীন শরৎ বাউল, খোদাবক্স শাহ্, মহীম শাহ্ প্রমুখ অসংখ্য মরমিয়া সাধকদের মধ্য দিয়ে বাংলার লোকায়ত এই অকৃত্রিম মানস সম্পদ নানা তরঙ্গ-ভঙ্গে বয়ে চলেছে। যশোরের লালন পরবর্তী লোককবি দুদ্দু শাহ্ ফকির গেয়েছেন—

'যে চেনা আপনাকে চেনা
ফরমায় নবী হাদিসে
আপনাকে আপনি চেনা যায় কিসে।'

[সংগ্রহ: মতলেব ফকির]

উল্লিখিত গানের বাণীতে বাউল তাঁর আত্মোপলব্ধির কথা বলেছেন। কোরআন-হাদিস ধর্ম গ্রন্থে স্বয়ং স্রষ্টা নিজেকে চেনার বা জানার কথা বললেও নিজেকে চেনার উপায় কি তা জানার চেষ্টায় ব্যাকুল হয়েছেন এই বাউল। আমার আমিত্বকে জানা হলে নিজেকে জানা হবে এমন কথাই এ গানে স্পষ্ট। ঈশ্বর প্রেমে ব্যাকুল হয়ে জানার যে ব্যাকুলতা তা এখানে নির্দিষ্ট। বাউল কবি বেহাল শাহ্ গুরুর প্রশ্নের উত্তরে গাইলেন—

'হেড মুণ্ড ঊর্দ্ধ পদে রয়েছে

সেই না দেশের কথারে মন ভুলে গিয়েছো।'

[সংগ্রহ: মতলেব ফকির]

অর্থাৎ পৃথিবীতে আসার যে প্রকৃতিগত নিয়ম তারই কথা গানে উদ্বৃত হয়েছে। গুরু লালন সাঁইয়ের প্রশ্নের উত্তরে কবি বলছেন জীবের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে। এছাড়াও বর্তমান সময়ে বাউল সাধনায় যারা অধিষ্ঠিত তাদের মধ্যে যশোরের বাউল সাধক সাদি তাইফ। যার লেখনীতে উঠে এসেছে সমাজের নানা চিত্র এবং ঈশ্বর প্রেমের অনেক বার্তা। সাদি তাইফের একটি গান—

'দেহের মাঝে ফুল ফুটেছে, রাসূল আমার হাল ধরেছে

ভব মায়া দূরে গেছে, চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে॥

মন আকারে আছেন যিনি, রূপের মাঝে অরূপ তিনি

কি প্রকারে তারে চিনি, রংমহল যে গড়েছে॥

রাসূলের দেখা নাহি পেলে, কি রূপেতে প্রেমিক হলে

গুরু প্রেমে রাসূল মেলে, সাদি'র মনে ঘুন ধরেছে॥'[৬৪]

উপরিউক্ত বাণীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ঈশ্বর প্রেমের মর্মবাণী। এছাড়াও ঈশ্বরকে পাবার ব্যাকুলতায় এই মরমী সাধককে করেছে ব্যাকুল। তিনি বলেছেন গুরুর প্রতি প্রেমভক্তি থেকেই বিশ্বগুরুর সন্ধান মিলবে।

২ : ৫.৫ পোশাক

বাউলরা একেকজন সাধক পুরুষ। তারা বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধান করে থাকেন। কেউ ধবল, কেউ গেরুয়া। কারও মাথায় বাবরি চুল, কারও মাথায় থাকে পাগড়ি। তবে বিশিষ্ট বাউল সাধক মতলেব ফকিরের সঙ্গে আলোচনা শেষে যে উত্তর মেলে তা হলো: বাউলদের বিশেষ রং ব্যবহার করার কারণ, নিবিষ্ট মনে ঈশ্বর চিন্তা করার বা সদা নিষ্পাপ মনে ভজনা করার প্রয়াস মাত্র। অর্থাৎ সাদা রং বাউলের মনকে পবিত্র রাখার উপায় হিসেবে বিবেচ্য। এখানে সাদা অর্থ খোদা। খোদাকে পাবার নিমিত্তে ব্যাকুল হয়ে শুভ্র রং ব্যবহার করেন বাউলেরা। এ জন্যে বাউল মতে দীক্ষা গ্রহণ করলে মেয়ে বা ছেলে যেই হোক না কেন তাকে সাদা শাড়ি বা ধুতি বসন হিসেবে ব্যবহার করতে হয় বা করে থাকেন। বিশিষ্ট গবেষক আবু ইসহাক হোসেন সাক্ষাৎকালে বলেন, "ভেকধারী বাউলেরা গেরুয়া পোশাক পরিধান করে থাকেন। যা বাউল গান পরিবেশনে দৃষ্টি নন্দন করার প্রয়াস মাত্র। তাঁর মতে, বৈষ্ণব মতাদর্শের সাধকেরা এ জাতীয় পোশাক ব্যবহার করেন, এর সাথে বাউল সাধকের কোন সম্পর্ক নেই।"

২ : ৫.৬ নাচের ব্যবহার

বাউল গায়করা গানের ভাব-ভাবনা অনুযায়ী অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করেন। বাউল গানের সাথে শিল্পীরা ভাবের বশে নিজস্ব ঢঙে নৃত্য পরিবেশন করেন যাকে বাউল নাচ বা বাউলের খেমটা নাচও বলা হয়ে থাকে। সুশিক্ষিত শাস্ত্রগত নৃত্যের সাথে তুলনা না করলেও বাউল নাচের আলাদা বৈশিষ্ট্য ও নান্দনিকতা রয়েছে।

২ : ৫.৭ ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র

বাউল গানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বলতে গায়ক নিজের হাতে একতারা, কোমরের সাথে বায়া এবং পায়ে বাঁধা ঘুঙুরে আঘাত পূর্বক বিশেষ ছন্দের মাধ্যমে গান পরিবেশন করে থাকে। এছাড়াও আসর ভিত্তিক যন্ত্রীদলের ব্যবহারে থাকে হারমোনিয়াম, ঢোল, বাঁশি, প্রেম জুড়ি এবং দোতারা। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ঢোলবাদক মাঝে মাঝে বাজনার তালে তালে বিশেষ কিছু নাচের ভঙ্গি প্রদর্শন করে থাকেন যা গানের ছন্দকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

২: ৫.৮ বাউল গানের আসর

আদিতে সন্ন্যাসী বাউল গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তত্ত্বকথায় পূর্ণ সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে ভিক্ষা গ্রহণ পূর্বক জীবকা নির্বাহ করতেন। তাঁরা ছিলেন আখড়া কেন্দ্রিক। এছাড়াও আসর কেন্দ্রিক বাউল গানেরও প্রচলন ছিলো তৎকালীন সময় থেকেই। সাধারণত শিষ্য বাড়িতে বেশির ভাগ সময় এ গানের আসর করা হতো। তবে আখড়াতেও প্রতিদিন আসর করে গান পরিবেশিত হতো। অধিকাংশ সময় বাউল গানের আসর সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়। গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ সারাদিন নিজ কাজকর্ম শেষে সন্ধ্যায় চিত্তবিনোদনের জন্য আসরে অংশ নেয় এবং এই গানের মর্মস্পর্শী বাণী ও সুর শ্রোতাদের আত্মোপলব্ধি ঘটায়। প্রথমত যাত্রাগানের মত একটি আসর তৈরি করে তা আলোকিত করবার জন্য হ্যাজাগ লাইট জ্বালিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ধূপবাতি প্রজ্জলন করে গান শুরু হয়। আসর পরবর্তী সিন্নীর ব্যবস্থা থাকে। উপস্থিত শ্রোতা আসর শেষে প্রসাদরূপে সিন্নী গ্রহণ করে। বিভিন্ন ফকির তাদের ইচ্ছাধীন গান পরিবেশন করে থাকে তবে তা তত্ত্ব মূলক, যা মনের কালিমাকে দূর করে জ্ঞানের সঞ্চার ঘটায়।

বাউলের মত-পথ, বাউলের চিন্তা-ভাবনা, বাউলের গান বা গানের বাণী সারা বিশ্বে একই ভাবধারায় বিরচিত যা জাগতিক পৃথিবীতে মানুষকে ঈশ্বর চিন্তা বা আমার আমিত্বকে জানার আকুতিতে ব্যাকুল করে তুলেছে। যুগ যুগ ধরে একই ভাবধারায় মানুষ সাধনপন্থা অবলম্বন করে এগিয়ে চলেছে সেই পরমাত্মার সন্ধানে। যশোর জেলার বাউল গান বা বাউল কবিরা তার ব্যতিক্রম নয়। এ জেলার বাউলরা আজও সেই পরমাত্মার সন্ধানে ব্যাকুল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জাগগান

জাগগান উৎসব কেন্দ্রিক গান। এই গানকে মেয়েলিগীত হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এই প্রার্থনা সংগীতের মধ্য দিয়ে গ্রামের সধবা (যাদের স্বামী বর্তমান) নারীরা পরিবারের মঙ্গল চিন্তা করে দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে এ গান গেয়ে থাকে। মূলত জাগগান হিন্দু নারীর ব্রত পালনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানে ব্রত বিষয়টি কি, তা আলোচনা করা সর্বাগ্রে প্রণিধানযোগ্য। বৈশাখের শুরু থেকে চৈত্রের শেষ, প্রতি মাসেই লেগে আছে কোনো না কোনো পূজা-পার্বণ বা ব্রত। আর সে কারণেই বাংলা প্রবাদ-প্রবচনেও বলা হয় 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'। জাগগান আলোচনার পূর্বে ব্রত এবং তৎপূর্বে আলোচনা করা আবশ্যক উৎসব সম্পর্কে। কেননা এ সমস্ত পূজা-পার্বণ ও ব্রত কথার সর্বাগ্রে রয়েছে উৎসব শব্দটি।

উৎসব— 'উৎসব হলো সামাজিক মানুষের ব্যবহারিক জীবনে আত্মপ্রকাশের এমন একটি স্বাভাবিক মানসবৃত্তি, যেখানে তার বাস্তব বুদ্ধি ও কল্পনাগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। উৎসব পালনের ভেতর দিয়ে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী নিজের ঐতিহ্যজাত সংস্কৃতির সঙ্গে রোজকার আটপৌরে জীবনচর্যার মেলবন্ধন ঘটায় এবং তাতে ধর্ম ও শিল্পসংস্কৃতির সঙ্গে প্রচুর লৌকিক আচার-আচরণেরও প্রভাব পড়ে। উৎসব তাই সচেতন মানুষের জীবনে শুধুমাত্র আমোদ-প্রমোদ কিংবা বিনোদন উদ্‌যাপনের ব্যবস্থাই নয় এর সঙ্গে দেশ, কাল, ধর্ম ও সংস্কৃতিভেদে মানুষের জাতিগত ইতিহাস এক অনিবার্য ও অপরিহার্য সম্বন্ধসূত্রে বাঁধা।'[৬৫] উৎসব কবে, কখন, কোথায়, কিভাবে শুরু হয়েছিলো তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে আদিমকালে এর উদ্ভব হয়েছে এ কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। অতীতে মানুষ যখন খাদ্য সংগ্রহের কাজ শেষ করে অথবা খাদ্য সংগ্রহের জন্য বসবাসকৃত গুহা থেকে বের হতো তখন বনে-জঙ্গলে বিপদের কথা চিন্তা করে দেব-দেবতার সাহায্য কামনায় উপাসনায় ব্রতী হতো। সকলে একত্রিত হয়ে অভিনয় সম্বলিত নাচ-গান করে আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি করতো যা উৎসবেরই নামান্তর। এই গোষ্ঠীবদ্ধ মানব সম্প্রদায় নিজেদের এবং তাদের সন্তানদের মানসপটের একঘেয়েমীতা দূর করে একটু আনন্দদানের জন্যেও এ ধরনের উৎসবের আয়োজন করতো। নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করলে এ কথাই দৃষ্ট হয় যে, উৎসবের ধারণাটি অতি আধুনিক নয় তা মানব সৃষ্টির প্রারম্ভিক কালের। যা সময়ের আবর্তে পরিবর্তীত হয়ে সেসব ধারাবাহিকতায় উৎসবের ভিন্ন ভিন্ন রূপ পেয়েছে মাত্র। বাঙালি সংস্কৃতির প্রধান অংশ এবং ঐতিহ্যই হলো উৎসব। আর এই উৎসবেরই রয়েছে নানান বৈচিত্র্যতা। এবারে উৎসবের শ্রেণি বিভাগ আলোচনা। 'উৎসব মানুষেরই সংস্কৃতির অঙ্গ। কিন্তু সংস্কৃতির কোনো চিরস্থায়ী রূপ নেই। আর্থসামাজিক কারণে যুগে যুগে তার নানাবিধ বিবর্তন আর পরিবর্তন ঘটে। এসবের ছোঁয়া অনিবার্য আর সহজবোদ্ধ কারণেই

তার অঙ্গ গুলিতেও লেগেছে। তাই কোনো উৎসবকেই এখন আর তার আদিরূপে পাওয়ার আশা করা সর্বদা সম্ভব নয়। যে উৎসব মূলে ছিলো কেবল উদ্দেশ্যমূলক, এখন হয়তো তা উদ্দেশ্যমূলক আর আনন্দজনক উভয়ই–কিংবা কেবল আনন্দের। আবার, যার জন্ম একান্তই কৃষি ভিত্তিক উৎসব রূপে, পরে হয়তো তা রূপ পেয়েছে ধর্মীয় বা অন্যবিধ উৎসবে।'[৬৬] উৎসবকে সর্বোপরি ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: '১. জীবিকার উৎসব; ২. ধর্মীয় উৎসব; ৩. সাংস্কৃতিক উৎসব; ৪. ঐতিহাসিক বা স্মরণ উৎসব; ৫. রাজনৈতিক উৎসব; ৬. সামাজিক-পারিবারিক উৎসব।'[৬৭] এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে ব্রত নামক অনুষ্ঠানের। বাংলার লোককথার এক ঐতিহ্যবাহী সম্পদ হলো ব্রতকথা। কোনো কিছু কামনা করে নিয়ম নিষ্ঠার সাথে দেবতার কাছে প্রার্থনা করার জন্য যে আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে,তাই ব্রত। বাঙালি জনগোষ্ঠীর 'ধর্ম, বিশ্বাস ও ব্রত অনুষ্ঠানের মধ্যেও অঞ্চলভেদে রয়েছে পার্থক্য। 'বৃ' ধাতু থেকে 'ব্রত' শব্দটির উৎপত্তি। (বৃ(বরণ করা) + অতচ্ র্ম্ম) যার অর্থ হলো নিয়ম; পুণ্যজনক পাপ ক্ষয়কর কর্ম। দেবতার কাছে কোনো কিছু কামনা-বাসনা করে নিয়ম সংযম পালনের মধ্য দিয়ে পাপ ক্ষয়পূর্বক উদ্দিষ্ট ফল লাভের জন্য পুণ্যজনক কর্মের নান্দনিক অনুষ্ঠান। ব্রতের মধ্যে মানুষের ইহলৌকিক কামনা-বাসনা জড়িয়ে আছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, "কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে আসছে তাকেই বলি ব্রত"।'[৬৮] 'ব্রতের আচার-অনুষ্ঠান শেষে ব্রতকথা শোনার নিয়ম। ব্রতী, ব্রতীনি ছাড়াও আশেপাশের মানুষেরা একসাথে বসে কারো বাড়ির উঠানে বা বারান্দায় মনযোগ দিয়ে ব্রতকথা শোনে। ব্রতের আচার-অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সাথে পালন করে ব্রতকথা শুনলে পুণ্য অর্জন হয় বলে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। লৌকিক দেবতাদের নিয়ে বাংলার ব্রতকথাগুলো গড়ে উঠেছে।'[৬৯] বাঙালির বহু ব্রত এক সময় আদিম সমাজে প্রচলিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

'১. অশ্বত্থ নারায়ণ, ২. অক্ষয় তৃতীয়া, ৩. অলক্ষ্মীর পূজা, ৪. অরণ্য ষষ্ঠী, ৫. ইতু, ৬. করম, ৭. কুক্কুটি, ৮. কুল কুলতি ৯. কুলায় ঠাকুর, ১০. গো-কাল, ১১. গো-ক্ষুর, ১২. গারসী, ১৩. খেঁটু, ১৪. জয় মঙ্গলবার, ১৫. তেজো দর্পন, ১৬. তারা, ১৭.তাল নবমী, ১৮. খোয়াথুরি, ১৯. দশপুত্তল, ২০. নখছুট, ২১. নাগ পঞ্চমী, ২২. পুণ্যিপুকুর, ২৩. পাঁচড়া পূজা, ২৪. বনদুর্গা, ২৫. ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া, ২৬. মধু সংক্রান্তি, ২৭. মাঘ মন্ডল, ২৮. যম পুকুর, ২৯. যাচাপান, ৩০. শস্ পাতা, ৩১. শিব, ৩২. সাবিত্রী, ৩৩. সেঁজুতি এবং ৩৪. হরিচরণ ব্রত।'[৭০] এই ব্রত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে জাগগান নামক ব্রতের অনুষ্ঠান।

২: ৬.১ উদ্ভব ও বিকাশ

'জাগগানের আভিধানিক অর্থ হলো রাত্রিকালে গীত পল্লীসংগীত বিশেষ। যা জাগর গান থেকে এসেছে। জাগর শব্দটিকে সংস্কৃতে "জাগৃ+অ(ভা)" এইমতে বিশ্লেষণ করা যায়। অর্থাৎ জাগৃ ধাতুর অন্তে অ প্রত্যয় যোগ

হয়ে জাগর শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। জাগর শব্দের অর্থ জাগরণ, নিদ্রাভঙ্গ, জাগ্রৎ অবস্থা।'[৭১] যশোর অঞ্চলে স্থানভেদে জাগগান, জ্যাগ্‌রোণগান বলা হয়ে থাকে। কবে, কখন, কিভাবে এ গানের উদ্ভব হয়েছিলো তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে এ গানের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের কালে শ্রীমতি চাঁপা রানী দে বলেন, 'প্রাচীনকাল থেকে এ গান ঐতিহ্যমণ্ডিত হয়ে অতি আড়ম্বরের সাথে পালিত হয়ে আসছে যশোর জেলার বিভিন্ন গ্রামগুলোতে। জাগগান একটি ব্রত, গ্রামীণ সমাজের স্বশিক্ষিত নারীরা তাদের স্বামী সন্তান নিয়ে সংসারের মঙ্গল কামনার্থে এ গান করে থাকেন।'[৭২]

২: ৬.২ উদ্দেশ্য

'কালী এবং শীতলা মায়ের আরাধনাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। শীতলা শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পুরাকালে বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাবে গ্রামের মানুষ মারা যেত এবং সেটি মহামারী আকার ধারণ করতো যার রক্ষার্থে এ পূজার আয়োজন। বিভিন্ন উৎসবে যেমন আল্পনা আঁকা বা উপবাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য বুঝিয়ে প্রকৃতিকে বসে এনে শান্তিতে জীবন যাপন করাটা লক্ষ্য থাকে, তেমনই এই ব্রত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে তুষ্ট রাখার চেষ্টা করা হয়। এটা একপ্রকার লৌকিক আচার এবং বিশ্বাস।

২: ৬.৩ উপকরণ

এই গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে উপকরণ হিসেবে কোথাও কোথাও বেতের তৈরি ছোটো আকৃতির হাঁড়ির (স্থানিক নাম আঁড়ি) গায়ে সিন্দূর দিয়ে হাত, পা অঙ্কিত করে তার ভিতরে ধান এবং উপরে লাল রঙের তাঁতের কাপড় আচ্ছাদিত করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ বেদীতে বসানো হয়। তার সম্মুখে একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে গান পরিবেশন করা হয়ে থাকে। জাগগানে স্থানভেদে ঢাক, কাঁশি, শঙ্খ, ধুনুচি, প্রদীপ ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

২: ৬.৪ সময়

শীতের শেষ এবং বসন্তের শুরুতে মূলত এ গান গাওয়া হয়ে থাকে। তবে যশোর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রকৃতি বিভিন্ন রকম সে ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও আবার এ গান পরিবেশনের সময়ে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন: কিছু অংশে আবার চড়ক পূজার এক মাস পূর্বে কোনো এক পূর্নিমা তিথি থেকে এ গান এক সপ্তাহ আবার কোথাও কোথাও পনেরো দিন ব্যাপী গাওয়া হয়ে থাকে। ক্ষেত্র বিশেষ চড়ক পূজা কেন্দ্রিক অষ্টক গান অধিবাসের পূর্বদিন পর্যন্ত গাইতে শোনা যায়।

২: ৬.৫ স্থান

নিম অথবা বেল গাছকে কেন্দ্র করে বেদী নির্মাণ করা হয়ে থাকে। ঐ বেদীকেই জাগগানের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করে তাকে কালীতলা, শীতলাতলা বা হরিতলা নামে অভিহীত করা হয়।

২: ৬.৬ মঞ্চ

গ্রামের মেয়ে এবং বিবাহিত নারীরা এ গান পরিবেশন করে থাকে। ঘরোয়া পরিবেশে স্বল্প পরিসরে এর আয়োজন করা যায়, সেজন্য আলাদা করে কোনো মঞ্চের প্রয়োজন হয় না। তবে কোথাও কোথাও যে স্থানে এ গান পরিবেশন হয় সেখানে মাথার উপরের অংশে সামিয়ানা খাটিয়ে নীচে বসার জন্য খেজুর পাতার তৈরি বেদেপাটির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। যেসব অঞ্চলে জাগগান দু'ভাগে বিভক্ত করে গাওয়া হয় সেস্থানে বেদীতে প্রার্থনা সংগীত এবং পাশে আলাদা মঞ্চে আনন্দ সংগীত পরিবেশনের ব্যাবস্থা করা হয়ে থাকে।

২: ৬.৭ বাদ্যযন্ত্র

জাগগান পরিবেশনের জন্য তেমন কোনো বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। কেউ যদি বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে হারমোনিয়াম এবং প্রেমজুড়ি বা মন্দিরার ব্যবস্থা করতে চায় তা করতে পারে। যেসব অঞ্চলে আনন্দ সংগীত পরিবেশনের জন্য আলাদা মঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়, সেখানে বাংলা ঢোলসহ কাঁশি, বাঁশি, করতাল বা মন্দিরা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লক্ষণীয়।

২: ৬.৮ শিল্পী সংখ্যা

নির্দিষ্ট কোনো শিল্পী সংখ্যা এ গানে কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই বিশেষ করে বলা যায়, নির্দিষ্ট একজন শিল্পী যে কোনো একটি গানের অংশ পরিবেশন করলে তার দোহার হিসেবে পুণ্যধামে উপস্থিত সকল নারীরাই সমস্বরে গাইতে শুরু করে এর জন্য নির্দিষ্ট শিল্পী সংখ্যা নেই। তবে যখন আনন্দ সংগীত পরিবেশন করা হয় তখন নির্দিষ্ট সংখ্যক শিল্পী দ্বারা এক একটি পালা বা কমেডি অংশের উপস্থাপন করা হয়।

২: ৬.৯ দোহার

নির্দিষ্ট সংখ্যক শিল্পীর নির্দেশ না থাকায় দোহারের সংখ্যা বেশি থাকে, যা এই গানকে উজ্জীবিত করে তোলে। উপস্থিত সকলেই এ গানে কণ্ঠ দিতে পারে।

২: ৬.১০ অভিনয়

ঈশ্বরের প্রার্থনায় এই গান পরিবেশিত হয়। তজ্জন্যে গানে তেমন কোনো অভিনয় লক্ষ্য করা যায় না। তবে অঞ্চল ভেদে কেথাও কোথাও বিভিন্ন দেব-দেবতার চরিত্রকে সাজ-সজ্জার মাধ্যমে বিশেষত করে তোলা হয়, আয়োজনকে আকর্ষণীয় করে তোলার নিমিত্তে। জাগগানের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. আরাধনা সংগীত, ২. আনন্দ সংগীত। নগর পরিক্রমণ শেষে নির্দিষ্ট স্থানে যেখানে এ গান পরিবেশনের আয়োজন করা হয় সেখানে সন্ধ্যা প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের সাথে সাথে আরতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আরাধনা সংগীত গীত হতে থাকে। আরাধনা সংগীতান্তে প্রসাদ গ্রহণের পর পুনঃরায় আনন্দ সংগীত শুরু হয়ে থাকে। এই সংগীত পরিবেশনকালে পালাকৃত গানগুলোর চরিত্র বোঝানো এবং শুধুমাত্র আনন্দ দানের জন্য অভিনয় করা হয়।

২: ৬.১১ পোশাক

নির্দিষ্ট কোনো পোশাক এ গান পরিবেশনে তেমন কোনো ভূমিকা রাখে না। সেজন্য নিয়মিত পোশাকেই পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে আনন্দ সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে শিল্পী হিসেবে আলাদা পোশাক ব্যবহার করা হয়।

২: ৬.১২ অনুষ্ঠানের ব্যয়

ঈশ্বরের আরাধনাই জাগগানের মূল উদ্দেশ্য। সংসারের মঙ্গলার্থে আয়োজন করা গ্রামের সহজ-সরল নারীদের একটি ঐতিহ্যপূর্ণ উৎসব এই জাগগান। সমাজের মঙ্গলচিন্তা করে গ্রামের নারীরা এর আয়োজন করে বিধায় আয়োজনে বেশি খরচ হয় না। গ্রামীণ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবেশে সার্বজনীন ভাবে আয়োজনের ফলে গ্রামের সকল পরিবার থেকে নির্দিষ্ট হারে অর্থ এবং চাল সংগ্রহ করে এর ব্যয় নির্বাহ করা হয়।'[৭৩]

জাগগান সম্পর্কে মাঠপর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে কথা হয় যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার পারখাজুরা গ্রাম নিবাসী শ্রীমতি চাঁপা রানী দে এবং বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার তৃপ্তি রানী শিকদারের সাথে। বিলুপ্তপ্রায় এই গান সময়ের আবর্তে হারিয়ে যেতে বসেছে ঠিকই কিন্তু এ সকল গ্রামের নারীরা আজও তাদের আচার-অনুষ্ঠান পালনের নিমিত্তে গানগুলো সংগ্রহ করে রেখেছে নিজ মনে। যার কোনো লিখিত রূপ সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি। ব্রত্যানুষ্ঠানের গান ছাড়াও মেয়েলী গীত সম্পর্কে তৃপ্তি রানী শিকদার বলেন, 'আমাদের সময়ে গ্রামের বয়ঃজ্যেষ্ঠরা গানগুলো শেখাতেন এবং আমরাও আনন্দের সাথে আগ্রহ ভরে তা গ্রহণ করতাম; কিন্তু বর্তমান সময়ে এ গানগুলো বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হয়ে উঠেছে কারণ এ প্রজন্মের মেয়েরা এই সকল গানের প্রতি কোনোরূপ আগ্রহ প্রকাশ করে না।' জাগগান মেয়েলী গীত হিসেবে যশোর অঞ্চলে সমাদৃত। শ্রীমতি চাঁপা রানী দে তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, 'এই গান প্রথমে বন্দনা দিয়ে শুরু করা হয়ে থাকে তারপর বিভিন্ন ধরনের পর্যায় ভিত্তিক গান গাওয়া হয় এবং শেষের দিন অর্থাৎ জাগগানের শেষ পর্বে থাকে বিসর্জন ও আসর তোলার গান।'

গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরেই কোনো না কোনো উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে মঙ্গল কামনা করাটাই মূল উদ্দেশ্য। যা ব্রত হিসেবে পালিত হয়ে আসছে আজ অবধি। যশোর অঞ্চল ছাড়া অন্য কোনো অঞ্চলে এ উৎসব পরিলক্ষিত হয় না। সেজন্য এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আয়োজিত গানই এতদঞ্চলে জনপ্রিয় এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হালই গান

যশোর জেলার লোকসংগীতে হালই গান অন্যতম। বাংলাদেশের অন্য কোনো অঞ্চলে এ গান তেমন পরিলক্ষিত হয় না। বাংলা লোকসংগীতের উৎপত্তি উৎসব কেন্দ্রিক হওয়ায় সব ধরনের লোকগানই কোনো না কোনো উৎসবকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে, তেমনই একটি হলো নবান্ন উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে হালই গান। গবেষণাকর্মে হালই গান সম্পর্কে বলতে গেলে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কারণ, বিলুপ্তপ্রায় গানের মধ্যে এ গানটিরও অবস্থান রয়েছে। 'দেশের নানা অঞ্চলে আদিমকাল থেকে নানা লোককবি নানা বিষয়বস্তু নিয়ে তাদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য লোকগীতি রচনা করে আসছে। লোক-সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতোই লোক ঐতিহ্য নানা অঞ্চলে গিয়ে তা আবার নানা রূপ নিয়েছে। কোনো কোনো গীতি আবার এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মোটেই ছড়ায় নাই। এই আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতার জন্য জাতিগত, ধর্মগত, সমাজগত এবং ভাষাগত কারণও থাকতে পারে। জনাব আশরাফ সিদ্দিকীর মতে, এই কারণ চারটি ছাড়া আরও দু'টি কারণ রয়েছে তা হলো— ভৌগোলিক ও প্রকৃতিগত অবস্থান।

হালই গান আলোচনা করতে এ বিষয়টির অবতারণা করার কারণ হলো, বাংলাদেশের লোকসংগীতে হালই গান এমন একটি বিষয়, যা কেবলমাত্র যশোর, খুলনা এবং খুলনা সংলগ্ন কিছু অঞ্চল ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোথাও এ গানের বিস্তার বা প্রসার ঘটেনি। তা কেবলমাত্র পূর্বে উল্লিখিত কারণগুলোর জন্যই হয়তো বা সম্ভব হয়েছে। আর সে কারণেই হালই গান সম্পর্কে তথ্য নির্ভর লেখা দূরে থাক, নামটি পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।'[৭৪]

২ : ৭.১ নামকরণ

হালই গান এক প্রকার আঞ্চলিক গীতি, এর আর এক নাম সায়ের গান। যশোর এবং 'খুলনা অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের একটি অংশ ছিল পুণ্ড্র, যার অপভ্রংশ হলো 'পোদ'। এদের প্রধান জীবিকা 'কর্ষণ' হওয়ায় এদেরকে হালো পোদও বলা হয়ে থাকে। আর এ বিষয়টি সন্দেহাতীত ভাবে সত্য যে, এই হালোদের গানই হলো 'হালই গান'। যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে হালই গানের কথা বা ভাষার কিছু পরিবর্তন হলেও সুরের যে ব্যাপক কোনো পরিবর্তন হয়েছে তা নয়। বৈচিত্র্যহীন সুরের তিনটি বা চারটি স্বরের উপর এর সাদামাটা সরল গতি দেখে বোঝা যায় যে, এ সুরটি আর্যদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে এখন পর্যন্ত তার স্বকীয়তা নিয়ে টিকে আছে। 'হালই' শব্দ দ্বারা সম্ভবত পিঠা বা পায়েশ জাতীয় মিষ্টান্নকে বোঝানো হয়েছে। প্রাচীন বাংলা অভিধান 'চলন্তিকা'য় 'হালৈ' শব্দটি না থাকলেও "হারৈকার" শব্দটি আছে। যার অর্থ আটা বা ময়দা দিয়ে যিনি মিষ্টান্ন তৈরি করেন। এক্ষেত্রে আটা বা ময়দার পরিবর্তে চাউলের গুড়া দ্বারা নির্মিত মিষ্টান্নকে অর্থাৎ পিঠাকে বোঝাতে "হালৈ" শব্দটি ব্যবহার'[৭৫] করা হয়।

২ : ৭.২ গীত পদ্ধতি

এই গান বিশেষত একরৈখিক সুরের চলনে ধুয়া প্রধান গান হিসেবে পরিবেশিত হয়। সাধারণ মানুষের গান হেতু আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় গাওয়া হয়ে থাকে। গানের কথা উল্লেখ করতেই ত্রিনাথচন্দ্র বিশ্বাস গাইলেন—

'তোরে বারণ করি ও সুন্দরী আমার কথা শোন
হিজেল ডাঙার বারে যেতে দিবো না কখন॥
ওরে বিশদুয়ারে গুলিগুল্লা,মুসড়ী (মসুরি) আগুন
পড়ন দ্বারে দশ বারো জন হয়ে গেছে খুন॥
ওরে উস্তাদ আমার বিপিন সরকার বেড়গ্রামে বাড়ি
ওরে ধান দেবেন কি পয়সা দেবেন আানেন তাড়াতাড়ি॥'

গ্রামের শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে প্রৌঢ়ত্বের দ্বার প্রান্তিক রসিক জনেরাও এ গানের দলে অংশ নিয়ে থাকে। দলে একজন প্রধান শিল্পী থাকে যিনি সুর ছাড়ার সাথেই দোহার শিল্পীরা একসাথে সমস্বরে হরে, হালই, স্থানভেদে গো শব্দযোগে মূল পদ বা মুখড়া গেয়ে থাকে।

২ : ৭.৩ এলাকা বা অঞ্চল

যশোর জেলার কিছু কিছু উপজেলায় এই গান পরিবেশিত হয়। যশোর সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামের অন্যতম হালই গানের শিল্পী ত্রিনাথচন্দ্র বিশ্বাসের সাথে আলাপ কালে তিনি জানান অভয়নগর, যশোর সদর, ফতেপুর প্রভৃতি অঞ্চলে আজও বেশ আড়ম্বরের সাথে হালই গান পরিবেশিত হয়।

২ : ৭.৪ উদ্ভব বা স্থায়িত্বকাল

খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে হালই গানের উদ্ভব বলে ধারণা করা হয়। গানের সুরবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে (বিশেষ করে ধুয়া প্রধান হালই গান) এ ধারণা আরও স্পষ্ট।

মনের কথা প্রাণের ব্যথা কার কাছে জানাই
মনে বলে পৌষ পার্বণে হিজল ডাঙ্গায় যাই॥
টেডি জামা টেডি কাপড় আলতা দিয়ে পায়
পুরুষ নারী সারি সারি চলেছে মেলায়॥

[সূত্র: সং. গান– ৬৮]

'গানের তাল-যন্ত্র, আঙ্গিক,বাচিক, উপস্থাপনার ঢং; শব্দ চয়ন ইত্যাদি একটু সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব অংশে হালই গানের প্রচলন নেই বললেই চলে। কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেছে সেই সময় এই এলাকার জন-মানুষের জীবিকা অর্জনের প্রধান অবলম্বন ছিল শিকার।

তবে হালই গান উদ্ভবের পর থেকে এখন অবধি বাংলাদেশের লোকসংগীতের একটি অজানা বিষয় হয়ে টিকে আছে।'[৭৬]

২ : ৭.৫ ধারক ও বাহক

সেই আদিকাল থেকে হালই গানের ধারক ও বাহক চাষী বা হালচাষ করা কৃষকেরা। এ অঞ্চলের ভূমির মালিক হোক আর ভূমিহীন চাষীই হোক হালই গান করেনি এমন লোকের সংখ্যা কম।

২ : ৭.৬ পৃষ্ঠপোষক

এই গান উদ্ভবের কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত পৃষ্ঠপোষক হাল চাষীরা। গ্রামের মানুষেরাই এ গানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আজও সমাদৃত। গ্রামের অশিক্ষিত এবং স্বশিক্ষিত মানুষ আজও তাদের শখের বসে নিজেদের স্বল্প অর্থায়নে এ আয়োজন করে থাকেন।

২ : ৭.৭ শিল্পী, ধারক ও বাহকদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থান

গ্রামের কৃষক শ্রেণিএই গানের স্রষ্টা। দৈনন্দিন জীবিকার সন্ধানে কর্মযজ্ঞে অধিষ্ঠিত থেকে প্রত্যেকেই নীরস জীবন যাপন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে কিছুটা আনন্দে অবগাহন করার ব্যাকুলতায় উৎসবের আয়োজন করে থাকে। শহুরে জীবনধারা এইমতো আয়োজনের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ নয়। আদিতে অন্ত্যজ শ্রেণির লোকেরা হালই গান পরিবেশন করলেও বর্তমানে সমাজের সব শ্রেণির মানুষ এই গান পরিবেশন করেন। যার ফলে কৃষক শ্রেণি থেকে এর পৃষ্ঠপোষকতার সৃষ্টি হলেও বর্তমানে সকলেই যার যার অবস্থান থেকে সহযোগিতা করে চলেছে।

২ : ৭.৮ বাদ্য ও যন্ত্রশিল্পী

হারমোনিয়াম, ঢোল, খঞ্জনী, করতাল, ঝাঁজ, কাঁশর, নূপুরের যৌথ বাজনায় এক আকর্ষণীয় পরিবেশে হালই গান গ্রামবাংলার নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে আনন্দ দেয়ার এক সনাতন মাধ্যম। হালই শুধু গান নয়, হিন্দু ধর্মের পূজার একটি অংশ। এই গান গাওয়ার জন্য লোকবাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার এখনও বিদ্যমান।

২ : ৭.৯ গানের বিষয়বস্তু

পৌষ সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে হালই গান গাওয়া হয়। এর মূল উদ্দেশ্য এই উৎসবকে কেন্দ্র করে গান পরিবেশনের মাধ্যমে গৃহস্থকে খুশি করে পিঠা খাওয়া এবং মাঙ্গন (বারোয়ারী কাজের খরচ নির্বাহ নিমিত্তে বাড়ি বাড়ি থেকে উত্তোলিত ধান-চাউল) তোলা। আয়োজন শেষে সংগৃহীত মাঙ্গন দিয়ে খিচুড়ী এবং পায়েস রান্না করে গ্রামবাসী ও সংশ্লিষ্টদের মাঝে আনন্দঘন পরিবেশে প্রসাদরূপে বিতরণ করা হয়ে থাকে। 'উপলক্ষ সংক্রান্তি হলেও হালই গানের বিষয়বস্তুতে নানা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় উপাখ্যান, সামাজিক ঘটনাবলি, ঐতিহাসিক কাহিনী'[৭৭] মূলক ছাড়াও হালই গানে নানা ধরনের বিষয় উপজীব্য হয়েছে। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যাবার সময় গান ছেড়ে মাঝে মাঝে এসকল শিল্পীরা চুটকি (পূর্বে কবি গানে গীত খেউড় তুল্য) পরিবেশন করে। যেমন:

‘কে বলি লটে বলি (হালৈ)
কুলি বিলাইলডা কি করলি॥ (হালৈ)
কুলি বিড়ালডা কুলি খাইছে (হালৈ)
দেখ কুলি কদ্দুর গেছে॥ (হালৈ)
রাইবন ভেঙে গেছে (হালৈ)
রাইবনে ঝুমঝুমি বুড়ি হলো কুমকুমি॥ (হালৈ)
এ বুড়ি তোর ভাঙবো দাত (হালৈ)
ক্যান আনলি পুষ মাস॥ (হালৈ)
পুষ মাসের একাদশী (হালৈ)
বুড়ির কপালে চন্দন ঘষি॥ (হালৈ)
ঘষতি ঘষতি পলো ফুটা (হালৈ)
সেই বুড়ির সাত বিটা॥ (হালৈ)
সাত বিটার আঠারো নাতি (হালৈ)
বাঘের মাথায় দিয়ে ছাতি॥ (হালৈ)
বাঘ গেলো করিমপুর (হালৈ)
খেয়ে এলো চাঁপা ফুল॥ (হালৈ)
বাস্তের নামে ফুল জল বাড়ায় (হালৈ)
দেও ধান পেয়ে যায়॥ (হালৈ)’

২ : ৭.১০ অভিনয়

কৃষিজীবী সমাজের গান হালই গান। সমস্বরে হালই শিল্পীরা গেয়ে থাকেন। অভিনয় এই গানের ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। ত্রিনাথচন্দ্র বিশ্বাস হালই গানে অভিনয়ের কথা বলতেই গানের দু’লাইন গেয়ে শোনান। গানটি হলো—

‘এলো শীতেরই আগমন
বুড়ো-বুড়ির লেগছে কাঁপন॥’

‘নবান্ন উৎসবের প্রাক্কালে নতুন ফসলের আগমনে বাস্তুপূজার কয়েকদিন আগ থেকে শখের শিল্পীরা বাড়ি বাড়ি হালই গান গেয়ে ধান-চাল, টাকা পয়সা উপহার পান। শীত ঋতুতে ফসলের আগমনে বাস্তুদেবতাকে (বাসতু ভিটা) পৌষ মাসের শেষ দিনে বাস্তুপূজা দেবার মাধ্যমে এই হালই গান শেষ হয়। মূল গায়ক থাকেন একজন একজন অধিকারী অর্থাৎ প্রোমোটার (যিনি গানের বাণী বলে দেন) থাকেন। পুরুষ ও মহিলারা মিলিত ভাবে নৃত্যের মাধ্যমে এই হালই গান বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিবেশন করেন। অনেক সময় পুরুষেরা মহিলা সেজেও এই

গানে অংশ নিয়ে থাকেন। আধ্যাত্মিক ও পুরাণের কাহিনী বর্ণনা করে এই গানে তাল, লয় ও নৃত্যের যৌথ সহযোগে এক রূপময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো দলে প্রত্যেক শিল্পীর হাতে একটি করে বড় রুমাল থাকে যা গানের তালে তালে দুলিয়ে এক মোহনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করা হয়।'[৭৮] এখানে সিলেট অঞ্চলের ধামাইল গানের সাথে হালই গানের তুলনা করলে অত্যুক্তি হবে না। সমবেত ভাবে নৃত্য সহযোগে ধামাইল গান পরিবেশিত হয়। ঠিক তেমনই ভাবে হালই গান পরিবেশিত হতে দেখা যায়। তবে ধামাইল গান বিবাহ কেন্দ্রিক আয়োজনকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া হয়। যেখানে হালই গান শুধু পৌষ সংক্রান্তির উৎসবকে কেন্দ্র করে সমাজের মঙ্গল কামনায় গাওয়া হয়ে থাকে।

২ : ৭.১১ গান পরিবেশনের সময়

সাধারণত পৌষ সংক্রান্তির পাঁচ থেকে সাত দিন আগে আবার কোথাও কোথাও মাসব্যাপী এই গান গ্রামে গ্রামে গাওয়া হয়। গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো প্রথমে একজন গানের বাণী উপস্থাপন করে সুর ধরে, তারপর অন্যরা গান এবং সাথে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। 'হালই গান পরিবেশনের জন্য ধরা-বাঁধা কোনো সময় সীমা নেই। মূল গায়ক তার ইচ্ছা মতো সময় ধরে গান পরিবেশন করে থাকে। প্রয়োজন বোধে গায়ক গান গাইতে গাইতে নতুন গান বেঁধে সেই গানও পরিবেশন করে থাকে।'[৭৯] তবে পরিবেশন সময় নিয়ে ত্রিনাথচন্দ্র বিশ্বাস বলেন, রাত্রি কালে এ গান পরিবেশিত হয়। গ্রামের কৃষকেরা মাঠের কাজ শেষ করে বাড়িতে ফিরে সন্ধ্যায় এসকল আনন্দ আয়োজনের শ্রোতা হয়ে মুগ্ধ হন এবং আনন্দ-উল্লাসের সাথী হয়ে থাকেন।

২ : ৭.১২ গানের শিল্পী সংখ্যা

হালই গান দলবদ্ধ ভাবে পরিবেশিত হয়। দল গঠনের জন্য শিল্পী সংখ্যার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে যতটুকু জানা যায় তা থেকে বলা যায় যে, সর্বনিম্ন ১২ থেকে ১৫ জন এবং সর্বোচ্চ ২৫ থেকে ৩০ জন পর্যন্ত শিল্পী নিয়ে এ গানের দল গঠন করা হয়ে থাকে। মূল গায়ক গান ধরলে বাকি শিল্পীরা সে গানের দোহার হিসেবে সুর লম্বা করে টেনে ধরে রাখে এবং নৃত্যের ভঙ্গিমায় হেলে-দুলে আয়োজনকে আনন্দঘন করে তোলে।

২ : ৭.১৩ গানে ব্যাবহৃত পোশাক

সৌন্দর্য সৃষ্টির নিমিত্তে গানের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন চরিত্রের বর্ণনা স্বরূপ পোশাক এ গানে দেখা যায়। পোশাকের পাশাপাশি সাজ-সজ্জারও ব্যবহার রয়েছে। পুরুষ যখন নারী চরিত্রে অভিনয় করে থাকে তখন সে পোশাকের মাধ্যমে তার অবয়ব একজন নারীর মত করে তৈরী করে। এ জন্য পোশাকও এ গানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ।

২ : ৭.১৪ গান পরিবেশনের ব্যয়

হালই গান পরিবেশনের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো খরচ নেই। গ্রামের উৎসাহী ও রসিক জনেরাই এ গানের আয়োজন করে থাকে। খেটে খাওয়া কৃষক তাদের নিজেদের শখে চাঁদা তুলে কখনো কখনো বিভিন্ন খাবার দান করে সহযোগিতা করে থাকেন এ আয়োজনের জন্য। তবে গ্রাম্য পরিবেশে সাধারণ মানুষের আয়োজন হেতু তেমন কোন নির্দিষ্ট অর্থায়নের প্রয়োজন হয় না।

২ : ৭.১৫ হালই গানের শেষ কথা

গানের শুরুতে আ....আ...আ...আ..। শেষে (হালই...) এবং (গো...) শব্দযোগে সুরকে দীর্ঘ এবং ছন্দবদ্ধ করা হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এক অজানা অধ্যায়ের নাম হালই গান যশোর অঞ্চলকে করেছে সমৃদ্ধ। মূলত সমাজের সার্বজনীন উৎসবকে একটি আনন্দঘন পরিবেশের মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা এর মূল উপজীব্য। তাছাড়া এ গানের মাধ্যমে লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকাংশে। তবে যশোর ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে এর কোনোরূপ চিহ্ন প্রকাশিত হয়নি। পৌষ সংক্রান্তির এ গান যশোর জেলার লোকসংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ। নমুনা হিসেবে যশোর অঞ্চলের হালই গানের বাণী সংগৃহীত গানে উল্লেখ্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যাত্রাগান

অভিনয় শৈলীর মাধ্যমে সংলাপ সহযোগে যাত্রাগান উপস্থাপন করা হয় যা দর্শক চিত্তে এক অভাবনীয় রসের সৃষ্টি করে থাকে। লোকসংস্কৃতির অনন্য ধারা যাত্রাগান যশোর জেলাকে করেছে সমৃদ্ধশালী। গ্রামবাংলার সমাজ চিত্র ফুটে ওঠে এ শিল্পের মাধ্যমে। বাংলাদেশে সর্বাধিক যাত্রাদল এ জেলাতেই সৃষ্ট। সংস্কৃতি বিকাশে যশোর জেলার রয়েছে অনন্য ভূমিকা। এ জেলার যাত্রাগান নিয়ে আলোচনার পূর্বে যাত্রাগানের উদ্ভব বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা আবশ্যক।

২: ৮.১ যাত্রাগানের উদ্ভব ও বিকাশ

যুগের বিচারে সাহিত্য-সংস্কৃতির তিনটি ধারা বহমান, 'দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আদি যুগ, ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগ এবং ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে চলমান সময় পর্যন্ত আধুনিক যুগ।'[৮০] যাত্রাগানের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে বিজ্ঞ জনেরা ভিন্ন ভিন্ন মতামত দিয়েছেন। বিশ্বকোষ-প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু যাত্রার উদ্ভব অতি প্রাচীনকালে হয়েছে বলে ধারণা পোষণ করেছেন। 'একাদশ শতাব্দী থেকে রাধা-কৃষ্ণলীলার উদ্ভব হয়। এই রাধা-কৃষ্ণলীলাই জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' রূপায়িত হয় কাব্য-সংগীত-অভিনয়গুণ ধারণ করে।'[৮১] ড. নিশিকান্ত মহাশয়ের গবেষণায় 'গীতগোবিন্দ' যাত্রা রূপে প্রকাশ পায়। 'রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম'কে ড. আহমদ শরীফ 'একটি নৃত্যসম্বলিত গীতিনাট্য' আখ্যা দিয়েছেন। সুকুমার সেন একে পালাগান বলেছেন এবং একে যাত্রাগানের আদিরূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রবোধবন্ধুর মতো ফোকলোরবিদ আশরাফ সিদ্দিকীও যাত্রার নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন দ্বাদশ শতাব্দীতে।'[৮২] 'মধ্য-পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর (১৪৮৬-১৫৩৩) ব্যাপক অবদান।'[৮৩] এই অবদানের ফলে তাঁর নামানুসারে এ সময়-কালকে চৈতন্য যুগ বলে অভিহিত করা হয়। 'তিনি নিজে যাত্রাভিনয় করেছেন বলে তাঁর জীবনীপাঠে জানা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতেই প্রথম অভিনয় অর্থে 'যাত্রা' শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।'[৮৪] বাঙালির প্রাচীন সংস্কৃতির ধর্মীয় উৎসবে যাত্রাগান অন্যতম। গবেষক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মতে, 'জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অভিনয় লীলা ইত্যাদির সাক্ষ্যে যাত্রাগানকে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী বা তার পূর্ববর্তীকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বাঙ্গালীর নাট্যরসপিপাসা নিবৃত্তির অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।'[৮৫] বিশিষ্ট গবেষক প্রভাত কুমার গোস্বামীর মতে, 'ষোড়শ শতাব্দীতে যাত্রার বীজ বাংলার মাটিতে উপ্ত হয়েছিল; তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে অঙ্কুরিত হয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে তা নানা শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বৃক্ষে পরিণত হয়।'[৮৬] বহুবিধ মতের সার হিসেবে আমরা হালের সর্বশেষ

গ্রহণযোগ্য বিশিষ্ট সংগীত গবেষক ড. করুণাময় গোস্বামীর মতের ভিত্তিতে বলতে পারি, "বড়ুচণ্ডী দাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দৃষ্টান্তেই যাত্রা রচিত হয়।"[৮৭]

'বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' জন্মখণ্ড থেকে রাধা বিরহ পর্যন্ত ১৩টি খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অভিনীত হতো। মূল চরিত্র তিনটি— শ্রীকৃষ্ণ, রাধা ও তাদের দূতী বড়ায়ি।'[৮৮] অতীতে যাত্রায় চরিত্রাভিনয় থাকলেও গান বেশি ব্যবহৃত হতো বলে একে 'যাত্রাগান' বলা হয়। কালক্রমে সংগীত নির্ভর থেকে গদ্য সংলাপময় যাত্রায় রূপান্তরিত হয়েছে। সঙ্গত কারণে উল্লেখ্য, যাত্রা শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে যাত্রাভিনেতা সুনীল কুমার দেবলেন, "তৎকালীন সময়ে জমিদারী প্রথায় সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন হওয়ায় পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাদের অনেক ভূমিকা রয়েছে এই শিল্পে। যাত্রাশিল্পীরা পেশাদারিত্বের জায়গাতে এক রাজদরবার থেকে যাত্রাভিনয় শেষ করে অন্য রাজদরবারে যাবার জন্য যে যাত্রা পথ অতিক্রম করে, এই পথকে কেন্দ্র করে যাত্রা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।"[৮৯] 'ইংরেজ রাজত্বের সময় থেকেই দেব মাহাত্ম্যের পরিবর্তে সামাজিক কাহিনী নিয়ে যাত্রাপালা রচিত ও অভিনীত হয়েছে। ভারতচন্দ্র যেমন 'চণ্ডীযাত্রা' রচনা করেছেন তেমনই 'বিদ্যাসুন্দর'ও রচনা করেছেন। পরবর্তীতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় বহু রচয়িতা নতুন গান যুক্ত করেছেন। বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে সর্প ভয় নিবারণার্থে মনসামঙ্গল ভেঙে রচিত ও অভিনীত হতো 'মনসার ভাসান' যাত্রাগান। গত শতাব্দীর যাত্রাগান রচয়িতাদের মধ্যে গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল রায়, মনমোহন বসু, মদন মাষ্টার, শিশুরাম, লোচন অধিকারী, পরমানন্দ অধিকারী, মধুসূদন কিন্নর, ব্রজমোহন রায় প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দ অধিকারীর 'নৌকা বিলাস' এককালে বাঙালির খুবই প্রিয় ছিল।'[৯০] যাত্রাগানের বিকাশে এ সকল রচয়িতাদের অসামান্য অবদান বাঙালি জাতি আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

২: ৮.২ যশোরের যাত্রাগান

সময়ের আবর্তে বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের বিভিন্ন অংশ যাত্রা জোয়ারে প্লাবিত হয়েছে। আদি ভূমিরূপের নিদর্শন স্বরূপ যশোরেও এর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে শুরুর দিকে। যাত্রাগানের প্রাণকেন্দ্র যশোর বললে অত্যুক্তি হবে না। বাংলাদেশে যাত্রাশিল্পের আবির্ভাবকাল থেকেই এই জেলায় যাত্রাগানের দল সৃষ্টি হয়েছে এ কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। যশোর জেলায় ঠিক কত সালে যাত্রাগানের আবির্ভাব হয়েছিলো তা সঠিক ভাবে জানা না গেলেও বিংশ শতাব্দীতে এর বিকাশ লক্ষণীয়। পূর্বে বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য গ্রামে গ্রামে শখের যাত্রাগান পরিবেশিত হতো, যা পেশাদার যাত্রাদল হিসেবে স্বীকৃত নয়। ড. তপন বাগচীর তথ্য মতে আমরা প্রথম স্বীকৃত যাত্রাদলের যে দৃশ্যরূপ পায় তা হলো '১৯১০ সালে অধিকারী নীলমাধব মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত নীলমাধবের দল।'[৯১] এ তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, যাত্রাদল হিসেবে নীলমাধবের দলের হাত ধরে

এতদঞ্চলে যাত্রাগানের আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা। বিশিষ্ট যাত্রাভিনেতা, লেখক ও সংগঠক মিলন কান্তি দে'র সাথে আলাপ চারিতায় জানা যায়, নীল মাধবের দল বেশ কয়েক বছর যাত্রাগান করার পর যশোর অঞ্চলে শখের যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে। পেশাদারিত্বের জায়গা থেকে সেসময় যাত্রাগান শুরু হয়নি। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত যশোর জেলার মনিরামপুর থানার সুধির কুমার দে একটি যাত্রাদল গঠন করেন যা 'সুধীর বাবুর দল' নামে পরিচিত ছিলো। এই প্রেক্ষিতে বলা প্রয়োজন, তৎকালীন সময়ে নির্দিষ্ট কোন নামকরণের মাধ্যমে যাত্রাদল গঠিত হতো না। তবে যতটুকু জানা যায় প্রধান সংগঠকের নামেই দলের নামকরণ করা হতো। তৎকালীন সময়ে যশোর জেলায় যাত্রাশিল্পীরা সৌখিন ভাবে যাত্রাগান করতেন এবং যা কিছু সম্মানী পেতেন তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতেন। ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রামের ডা. কবির এবং গোপী রুদ্র যৌথভাবে 'গীতশ্রী যাত্রা ইউনিট' নামে যাত্রাদল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে দলটি ভেঙে যাওয়ায় তারই সূত্র ধরে ১৯৭১ সালে বৃহত্তর যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার গাজীর হাট এলাকায় 'দি নিউ গীতশ্রী যাত্রা ইউনিট' নামে যাত্রাদল প্রতিষ্ঠা করেন গোপী রুদ্র। যা পরবর্তীতে তার দ্বিতীয় স্ত্রী রেখার মালিকানায় দল পরিচালিত হয়। তবে এসকল যাত্রাদলের নাম কখনো রেজিস্ট্রিকৃত না হওয়ায় গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যগুলি পেতে খুবই কষ্টসাধ্য বিষয় হয়েছে। এরপর যাত্রাদলের স্বর্ণযুগ শুরু হয় স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে। যা রেজিস্ট্রিকৃত যাত্রাদল হিসেবে পাওয়া যায়। বিষয়ের বিচারে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, সামাজিক ও পরিশেষ জীবনী ভিত্তিক পালা একের পর এক এ জেলার ভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময় মঞ্চায়ন হয়েছে। নির্মল বিনোদন ও সমাজ চেতনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে পেশাদারিত্বের জায়গা থেকে রেজিস্ট্রিকৃত দলের যে নির্দেশ পাওয়া যায় তা নিম্নে উল্লেখ করছি——

'দলের নাম	**অধিকারী**	**সাল**
ফাল্গুনী অপেরা	মফিজুল আলম	১৯৭২
জোনাকী অপেরা	নিরঞ্জন রায়	১৯৭৩
১নং জোনাকী অপেরা	নিরঞ্জন রায়	১৯৭৬
তুষার অপেরা	তুষার দাশগুপ্ত	১৯৭৪
শ্রী'মা নাট্য প্রতিষ্ঠান	পংকজ মণ্ডল	১৯৭৪
শিবদুর্গা অপেরা	শিবু রায়	১৯৭৫
বৈকালী অপেরা	প্রহ্লাদ বিশ্বাস(হিটলার)	১৯৭৫
প্রতিমা অপেরা	গনেশ চন্দ্র কুণ্ডু	১৯৭৮
মেঘদূত নাট্য সম্প্রদায়	সেলিম চৌধুরী	১৯৭৯

দলের নাম	অধিকারী	সাল
মানিক অপেরা	মানিক সেন	১৯৮০
চৌধুরী নাট্য কোম্পানী	অমূল্য প্রসাদ চৌধুরী	১৯৮১
গীতাঞ্জলি অপেরা	আখতার সিদ্দিকী	১৯৮১
সুদর্শন অপেরা	নির্মল কুমার সরদার	১৯৮২
দি তরুণ অপেরা	সুকুমার সরদার	১৯৮৩
সারথী যাত্রা ইউনিট	জগদীশ চন্দ্র বর্মণ	১৯৮৩
নিউ গীতশ্রী যাত্রা ইউনিট	জামির হোসেন মানিক	১৯৮৩
অগ্রগামী নাট্য সংস্থা	গৌরাঙ্গ বিশ্বাস ও ননী চক্রবর্তী	১৯৮৪
নিউ রাজদূত অপেরা	বজলুর রহমান	১৯৮৪
আদি অগ্রগামী যাত্রা সমাজ	ননী চক্রবর্তী	১৯৮৫
চণ্ডী অপেরা	সাধন মুখার্জি	১৯৮৬
পারুল যাত্রা ইউনিট	নীলরতন ঘোষ	১৯৮৮
আনন্দ অপেরা	বাবর চান বাবু	১৯৮৯
পারুল অপেরা	শহিদুল ইসলাম	১৯৯০
দি সিজার্স যাত্রা ইউনিট	শামসুল আলম	১৯৯১
আনন্দ অপেরা	মোশাররফ হোসেন	১৯৯২
পদ্মা যাত্রা ইউনিট	প্রদীপ হাজরা	১৯৯৩
নার্গিস যাত্রা ইউনিট	নওশের আলম	১৯৯৩
তিন কন্যা অপেরা	বশির আহমেদ	১৯৯৫
চ্যালেঞ্জার যাত্রা ইউনিট	স্বপন খাঁ/ওয়াসিম	১৯৯৬
মানিক অপেরা	মানিক সেন	১৯৯৭
নিউ চ্যালেঞ্জার অপেরা	আর ডি বর্মণ	১৯৯৭
সংগীতা যাত্রা ইউনিট	সুনীল চন্দ্র ঘোষ	১৯৯৯'[৯২]

উল্লিখিত যাত্রাদলগুলো বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাত্রাপালা মঞ্চায়ন করে সমাদৃত হয়েছে এবং সংস্কৃতি বিকাশে যশোর জেলাকেও সর্বোচ্চে অধিষ্ঠিত করেছে তাদের নৈপুণ্যতায়। আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, সাবলীল চলিত ও শুদ্ধ ভাষার মিশ্রণ প্রয়োগে যাত্রাপালা অভিনীত হয়ে আসছে সেই

আদিকাল থেকে। তবে অঞ্চলগত পার্থক্য থাকলেও ভাষা এবং পালার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। যশোর অঞ্চলেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। এ কারণে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যশোর জেলার যাত্রাগানে বিশেষ রূপ পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

২ : ৮.৩ যাত্রাগানে ভাষার প্রয়োগ ও ক্রমবিবর্তন

'শ্রীচৈতন্য অভিনীত 'রুক্মিণী হরণ' একটি কৃষ্ণযাত্রা। এই যাত্রার চিরায়ত আবেদন নিয়েই বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিন্যাসে, রূপকল্পে পালা রচনা শুরু হলো আঠারো শতকে।'[৯৩] যাত্রাগান বা পালায় ভাষার প্রয়োগ ও ক্রমবিবর্তন দেখা যায় তৎপরবর্তী সময়ে। এ সময়ে 'পরমানন্দ অধিকারী কিছুটা কথ্য ও গদ্য সংলাপ ব্যাবহারের চেষ্টা করেছিলেন। গোবিন্দ অধিকারীর (১৭৯৩-১৮৭০) নতুন ছন্দের একটি গান সেই সময় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। সেটি হচ্ছে—

"বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের
রাই আমাদের, রাই আমাদের।"

ভাববিন্যাসে এবং হৃদয়ের গভীরতায় কৃষ্ণযাত্রার নতুন রূপায়ণ দেখতে পায় উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে এবং এ ধারার বিপুল কৃতিত্ত্বের অধিকারী নবদ্বীপের কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮)।'[৯৪] 'কৃষ্ণকমল তাঁর পালাগুলোতে গদ্যসংলাপের চেয়ে গীত সংলাপের ব্যাবহার করেছেন বেশি।'[৯৫] 'সাহিত্য সমালোচকদের মতে– আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ কাব্য ভারত চন্দ্রের (১৭১২-১৭৬০) 'অন্নদামঙ্গল' এ কাব্যের একটি আখ্যান বিদ্যাসুন্দর নিয়ে একাধিক পালা রচিত হয় উনিশ শতকে। এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পান গোপাল উড়ে (১৮১৯-১৮৫৯)।'[৯৬] 'মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, গোপাল রচিত পালায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলার পাশাপাশি হিন্দী ভাষারও ব্যবহার মেলে।'[৯৭] 'যাত্রায় ভাষার ব্যবহারে মেধা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন পালাকার ব্রজমোহন রায় (১৮৩১-১৮৭৬)। ১৮৭২ সাল সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার বছর। এ সময় নিজে দল গঠন করে পালা লিখলেন অভিমন্যু বধ, সাবিত্রী সত্যবান ও কংস বধ। পালার সংলাপ রচিত হয়েছে পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ও গদ্যে। ভক্তি ও করুণ রসের মধ্য দিয়ে পালা কাহিনী এগিয়েছে পয়ার ছন্দে। যাত্রাপালায় অঙ্ক ও গর্ভাঙ্ক যুক্ত করার রীতি ব্রজমোহনই প্রথম চালু করেন। গানের পঙ্‌ক্তিগুলোও কমিয়ে নেন। অশ্লীলতা ও ভাঁড়ামি থেকে যাত্রাকে মুক্ত করে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুললেন আর এক বিশিষ্ট পালাকার মতিলাল রায় (১৮৩২-১৯০৮)। বিভিন্ন পালায় তিনি কথকতা, সংলাপ, অভিনয় ও সংগীতের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন। গানের ছন্দ ও অনুপ্রাস ব্যবহারে কৌশল তিনি নিয়েছেন দাশরথির পাঁচালি থেকে। নট-নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) হাতে পৌরাণিক যাত্রাপালা নতুন দৃষ্টি ভঙ্গিতে স্বতন্ত্র মাত্রা পায়। যাত্রা ও নাটকে তাঁর ভাষারীতি যেমন

নতুনত্বের দাবি রাখে, তেমনই এক সুললিত ছন্দ আবিষ্কার করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এটাই 'গৈরিশী ছন্দ' নামে পরিচিত। মিত্র, অমিত্রাক্ষরের সঙ্গে গৈরিশী ছন্দের ব্যবহারও যাত্রায় অনেক দিন ছিলো।'[৯৮]

'সৃষ্টির অফুরন্ত সম্ভাবনা নিয়ে বিশ শতকে এগিয়ে চললো যাত্রার রথ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে স্বদেশী যাত্রা নিয়ে এলেন মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪)। বক্তৃতা ও দেশের গান স্বদেশী যাত্রার বৈশিষ্ট্য। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুকুন্দ গাইলেন—

"ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে।"

এমন উদ্দীপনামূলক ভাষা ও শব্দ চয়নের মাধুর্য এর আগে কোনো যাত্রাপালায় দেখা যায়নি। ১৯০১ থেকে ২০০০ সাল, শতবর্ষের যাত্রার গৌরবের ইতিহাস। শোভা যাত্রার খোলস ছেড়ে আঠারো শতকে যেমন অভিনয় অর্থে যাত্রার যাত্রা শুরু হয়েছিলো ঠিক তেমনই ২০০ বছরের অনেক অসংগতি, অনেক বিচ্যুতিকে ঠেলে ফেলে যাত্রার জয়ধ্বনি শোনা গেল এই শতাব্দীতে। যাত্রায় আধুনিকতা এলো সমাজ জীবন ঠাঁই করে নিল। এই বিপ্লব সম্ভব হয়েছে ভাষার যথাযথ প্রয়োগ নৈপুণ্যে।'[৯৯] যাত্রা রচনা রীতির আমূল পরিবর্তন দেখা দেয় বিশ শতকে। ব্রজেন্দ্র কুমার দে তাঁর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পালার দুরবোধ্য শব্দ ভাণ্ডারকে ভেঙে করেছেন সহজতর এবং দীর্ঘ সংলাপকে করেছেন সংক্ষিপ্ত। আলংকারিক দিক থেকে সংস্কৃত অনুসারী শব্দালংকারকে রূপায়িত করেছেন সহজতর কাঠামোতে। যাত্রাপালায় সামাজিক, কাল্পনিক এবং জীবনীমূলক পালাগুলোর কর্তাপুরুষ তিনিই। ৮ থেকে ৯ ঘন্টার যাত্রাপালাকে তিনি ৩ থেকে ৪ ঘন্টায় এনে দর্শকের মাঝে উপস্থাপন করেন সুললিত ভাবে, শ্রোতা-দর্শককে বিনোদনের একঘেয়েমিতা থেকে মুক্ত করে আনন্দ দানে বাধিত করেছে এই ধারা। রাজ দরবারের রাজকীয় ভাষাকে তিনি নবরূপে রূপায়িত করেন। চরিত্র চিত্রায়ণে তিনি তৎকালে রাজা-রাণী, চাকর-চাকরানী ও কৌতুক নির্ভর চরিত্রের একই ভাষা রীতির চলনকে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করে চরিত্র চিত্রায়ণের দিক বিচারে চরিত্র উপযোগী ভাষাকেই চিত্রায়িত করেছেন সময়ের আবর্তে। যা সাধারণ দর্শক মনে এক ধরনের রসস্রোতের উদ্বেগ ঘটিয়েছে।

স্রোতধারার ক্রম বিবর্তে বিভক্ত বাংলায় ৫২'র ভাষা আন্দোলন যাত্রাপালার ভাষাকে দিয়েছে এক নতুন আঙ্গিক। মানবিক দায়বদ্ধতা ও শহীদের রক্তের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাবোধ থেকেই পালাকারদের মধ্যে ভাষাপ্রীতির ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় ব্রজেন্দ্র কুমার দে'র 'বর্গী এলো দেশে'। উল্লিখিত পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্র 'তরুণ সিরাজ তার নানা আলীবর্দী খাঁকে বলছে— দু'দিন দু'টো মোহর দিয়ে এক বাঈজির কাছ থেকে বাংলা কথা শুনেছি। বেঁচে থাক আমার বাংলা, বেঁচে থাক আমার মধুক্ষরা বাংলা ভাষা।'[১০০] তাছাড়া

যাত্রাগানে চলিত ভাষার সমধিক ব্যবহারে যারা নৈপুণ্য সৃষ্টি করেছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য খুলনার পরিতোষ ব্রহ্মচারী, বরিশালের মাস্টার সেকেন্দার আলী, নড়াইলের মহসিন হোসাইন, মাগুরার অতুলপ্রসাদ সরকার, ঢাকার ননী চক্রবর্তী, চট্টগ্রামের মিলন কান্তি দে, ঝিনাইদহের গিরিন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং যশোরের সাধন মুখার্জী প্রমুখ।

যশোর জেলার যাত্রাগানের কথা বলতে গেলে অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮৭৩-১৯২৪) নামটি এসে যায়। যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্ম। তাঁর নিজস্ব কিছু শব্দ নিয়ে যাত্রাপালা সাজিয়েছেন ফণীভূষণ। যাত্রাপালায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত —

'বসিয়া কদম্ব তলে
বাজায় বাঁশুরিরে রাধিকা রমন।'

গানটির ব্যবহার খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। বহুদিন যাবৎ এ গানটি যাত্রাপালার নায়ক-নায়িকার কণ্ঠে শুনতে পাওয়া যায়। তাছাড়া যশোর অঞ্চলের লোককবিদের গানও যাত্রার বিবেকে পরিলক্ষিত হয়। কার্তিকী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের মহারাস উপলক্ষে মনিরামপুর থানার হাকোবা সার্বজনীন রাস মন্দির কর্তৃক আয়োজিত যাত্রা মঞ্চে আমার দেখা 'শ্মশানে হলো ফুলশয্যা' যাত্রাপালার খুব জনপ্রিয় বিবেক গান হিসেবে লালনের ভাবপূর্ণ পদটি গীত হয়েছিলো —

'বল স্বরূপ কোথায় আমার সাধের প্যারি,
যার জন্যে হয়েছিরে দণ্ডধারী।'

সামাজিক, ঐতিহাসিক ও জীবন কাহিনী মূলক যাত্রাপালা যশোরের যাত্রাশিল্পের প্রাণ। ঐতিহাসিক পালা 'কুরুক্ষেত্রের কান্না'তে ব্যবহৃত হয়েছে —

'ঐ কালোর মাঝে লুকিয়ে আছে আমার বংশীধারী।'

'মায়ের চোখে জল' সামাজিক পালাতে বিবেক গান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে উল্লেখযোগ্য একটি গান—

'ভেঙে গেলো ভুলের বালু চরে
শখ করে তুই বাঁধলি বাসা শুকনো ডালে।'

যা আজও মানুষের মনের মণিকোঠায় স্বযতনে স্থান করে আছে। আজও মনে পড়ে 'কয়েদি' যাত্রাপালার কথা। যেখানে বিবেকের কণ্ঠে গীত হয়েছিলো—

'আমরা সবাই পথের পথিক
তুমি আমি সাধু জন।'

'বাগদত্মা' যাত্রাপালায় গৌরাঙ্গ আদিত্য বিবেক কণ্ঠে গেয়েছেন—

‘মন্দিরে দেবতা নাই অন্তরে খোঁজ তারে
প্রাণের দেবতা মনেরই দুয়ারে
ফিরে আসে বারে বারে।
পাষাণে কি পাবে ভগবান
মানুষের প্রেমে সে যে মহীয়াণ
হৃদয় সিন্ধু মহীত করিয়া
ফিরে আসে বারে বারে।’

‘সাধক রামপ্রসাদ’ পালায় বিবেকের কণ্ঠে শোনা যায়—

‘বোঝেনা বাঙালী বোঝেনা, স্বাধীনতা কি যে ধন।’

নির্যাতিত, ক্ষুধার্ত মানুষের কথা ভেবে ‘অশ্রু দিয়ে লেখা’ যাত্রাপালায় বিবেকের কণ্ঠ গেয়ে ওঠে—

‘খেতে দে আমায় খেতে দেরে, খেতে দে, খেতে দে
আমি ডুব দিয়েছি ক্ষুধার সাগরে
এবার আমায় খেতে দে।’

হৃদয়স্পর্শী গানটিতে কি দারুণ করুণ রসের সৃষ্টি করেছিলেন শিল্পী! যশোর অঞ্চলের যাত্রাপালা যেমন সমৃদ্ধ তেমনই পালার গানগুলো সমাদৃত। বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও উৎসবকে কেন্দ্র করে এ জেলায় চলে নানা ধরনের যাত্রাপালা। জীবিকার সন্ধানে এবং পেশা হিসেবে গড়ে ওঠে যাত্রাদল। অভিনয় শৈলীর নৈপুণ্যতায় ডাক পড়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে।

২ : ৮.৪ যাত্রাদল গঠন করার নিয়ম

শারদীয়া পূর্ণিমা তিথির মহাসপ্তমীর জয়ঢাক বাদনের সাথে সাথে যাত্রা মঞ্চে ঘন্টা পড়ে। বস্তুত এর আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ প্রতিবছর বাংলা সনের আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় অনুষ্ঠিত হয় জগন্নাথ দেবের রথভ্রমণোৎসব। উক্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে নাচ-গান সহযোগে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথকে টেনে নেওয়া হয় এক মন্দির থেকে আর এক মন্দিরে। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে মেলা পার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয়। সেই প্রাচীন আমল থেকে রথের রশিতে টান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা দলেও কিছু নিয়ম-নীতির প্রচল শুরু হয়। দলের অধিকারীগণ এই দিনে শিল্পী কুশলীদেরকে নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ করেন এবং আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে নতুন মৌসুমে যাত্রাপালায় অভিনয়ের চুক্তি সম্পাদন করেন। উল্লেখ্য যে, রথযাত্রার দিন সকালে প্রত্যেক দল মালিকের বাড়ি মঙ্গলঘট স্থাপন করা হয়। বাদ্য-বাজনা পূজার্চনা এবং ভক্তিমূলক সংগীতানুষ্ঠনের পর দল মালিক মঙ্গলঘটকে প্রণাম করে নটদেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন। একে ‘মাঙ্গলিক ঘট স্থাপন উৎসব’ বলা হয়।

যাত্রাপালায় অভিনয় শিল্পের দু'টি ধারা পরিলক্ষিত হয়। একটি দলের নির্ধারিত শিল্পী এবং অপরটিকে বলা হয় এ্যামেচার। অর্থাৎ এ্যামেচার শিল্পীরা দলের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো শিল্পীসত্ত্বা নিয়ে অবস্থান করেন না। তারা নির্দিষ্ট একটি বইকে (পালা) কেন্দ্র করে অভিনয় করার জন্য আসেন এবং রিহার্সাল করে সেই বইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে প্রস্থান করেন। অন্য দিকে দলের অধিভুক্ত শিল্পীরা নিয়মিত রিহার্সালের মাধ্যমে শিল্পের মাধুর্যতা সৃষ্টি করেন। পারিশ্রমিক হিসেবে দলের নিয়োগকৃত শিল্পীরা ৪০হাজার থেকে ১লক্ষ টাকা পর্যন্ত এক মৌসুমের জন্য এবং এ্যামেচার শিল্পীরা সেখানে একটি পালার জন্য ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত পেয়ে থাকেন। সেজন্য দলে অন্তর্ভুক্ত শিল্পীদের প্রত্যেকটি বই উপস্থাপনের দায়িত্বও থাকে বেশি।

২ : ৮.৫ যশোর অঞ্চলে অভিনীত যাত্রাপালা

যাত্রাপালার অভিনয় কল্পে সামাজিক ঐতিহাসিক যেসকল যাত্রাপালার কথা বলা হয় তা যাত্রার ভাষায় বলা হয় 'বই'। অর্থাৎ এই বই হলো যাত্রাপালা। প্রত্যেকটি যাত্রাদল তার নিজস্ব ঐতিহ্য বজায় রেখে নির্দিষ্ট সংখ্যক বইয়ের মহড়া দিয়ে যাত্রাপালার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে দল উপস্থাপনের মাধ্যমে এ সকল বই উপস্থাপন করে থাকেন। কখনও সামাজিক কখনও আবার ঐতিহাসিক কখনও বা রোমান্টিক যাত্রাপালা। গবেষণাকর্মে মাঠ পর্যায়ে যাত্রাশিল্পী ও দল মালিকদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এবং প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যাত্রার যে সকল বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পালাগুলো পাওয়া যায় তা নিম্নে উল্লেখ করছি—

'(১) নবাব সিরাজউদ্দৌলা (২) শ্মশানে ফুল শয্যা (৩) দুই পয়সার আলতা (৪) ঘর-সংসার (৫) বাবা কেন চাকর (৬) নবরাত্র (৭) অকালের বেশ (৮) সতীর ঘাট (৯) কয়েদি (১০) নাচ মহল (১১) প্রায়শ্চিত্ত (১২) স্বপ্ন সমাধি (১৩) বর্গী এলো দেশে (১৪) বেলোয়াড়ি ঝাড় (১৫) তাসের ঘর (১৬) বেগম (১৭) আসমান তারা (১৮) রিক্তা নদীর বাঁধ (১৯) পথের শেষে (২০) নীল কুঠির কান্না (২১) নাচ ঘরের কান্না (২২) আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও (২৩) অশ্রু দিয়ে লেখা (২৪) কারবালার কান্না (২৫) হাসির হাটে কান্না (২৬) ফেরিওয়ালা (২৭) রিক্সাওয়ালা (২৮) গরীব কেন মরে (২৯) বিশ্বাস ঘাতক (৩০) জীবন নদীর তীরে (৩১) সাতপাকে বাঁধা (৩২) একটি পয়সা (৩৩) ডাইনী বঁধূ (৩৪) গলি থেকে রাজ পথ (৩৫) পথের ছেলে (৩৬) নটিবিনোদিনী (৩৭) দেবী সুলতানা (৩৮) ক্লিওপেট্রা (৩৯) কে ঠাকুর ডাকাত (৪০) সন্তান হারা মা (৪১) অভিশপ্ত ফুল শয্যা (৪২) আমি অসতী নই (৪৩) নীচের পৃথিবী (৪৪) পাগলী মেয়ে (৪৫) আলোর পিপাসা (৪৬) চণ্ডী তলার মন্দির (৪৭) দস্যু রানী ফুলন দেবী (৪৮) বয়াতির বিলাপ (৪৯) একমুঠো অন্ন চাই (৫০) রক্তাহুতি (৫১) রক্ত দিয়ে কিনলাম (৫২) মোঘলে আজম (৫৩) গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা (৫৪) আভিজাত্য (৫৫) আগুন নিয়ে খেলা (৫৬) মা-মাটি-মানুষ (৫৭) আনার কলি (৫৮) কলঙ্কিনী কেন কঙ্কাবতী (৫৯) সোহ্‌রাব রুস্তম এবং (৬০) সাধক রামপ্রসাদ ইত্যাদি (৬১) লালন ফাকর (৬২) ঈশা খাঁ (৬৩) রক্তাক্ত প্রান্তর (৬৪) বাগদত্তা (৬৫) তাজ মহল।'[১০১]

২ : ৮.৬ যাত্রাগানের মঞ্চ

যাত্রাগান পরিবেশনে মঞ্চ তৈরি করা হয়ে থাকে খোলা স্থানে বিশেষ করে খেলার মাঠে। সাধারণ জনসমষ্টিই এর শ্রোতা হওয়ায় জায়গা প্রয়োজন হয় অনেক বেশি। মাঠের চারপাশে রঙিন কাপড়ের প্যান্ডেল করা হয়। অর্থনৈতিক বিষয়টি এর সাথে জড়িত থাকায় টিকিটের আয়োজন থাকে। টিকিটের নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী দর্শক-শ্রোতা নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে যাত্রাপালা উপভোগ করে থাকে। মূল মঞ্চের তিন দিকে দর্শক অবস্থান করে এবং একদিকে থাকে গ্রিনরুম যেখান থেকে অভিনেতারা পালার চরিত্র অনুযায়ী সাজপোশাক পরিধান করে মঞ্চে এসে অভিনয় করে থাকে। আনুমানিক ১৮/১৫ ফিট দৈর্ঘ্য প্রস্থের মঞ্চের উচ্চতা থাকে ৩.৫ ফিট। যা সাধারণ দর্শকের থেকে অভিনেতাকে আলাদা করে চিহ্নিত করে। মঞ্চের উপরে ছাউনী করা হয়ে থাকে। মঞ্চের খুব কাছাকাছি স্থানে এক পাশে অবস্থান করেন প্রম্পটিং মাস্টার, যিনি সম্পূর্ণ পালাটি মঞ্চের পাশে বসে উচ্চস্বরে পড়েন যা শুনে সাথে সাথে অভিনেতারা অভিনয় করে থাকেন এবং অন্য পাশে থাকে যাত্রার বিশেষ আকর্ষণ যন্ত্রশিল্পীরা।

২ : ৮.৭ যাত্রাগানের পোশাক

যাত্রাপালার তিনটি ধারা: (ক) সামাজিক, (খ) ঐতিহাসিক এবং (গ) কাল্পনিক। এই ধারা অনুযায়ী যে সময়ে যে পালাটি উপস্থাপিত হয়, ঠিক সেই পালার চরিত্র অনুযায়ী শিল্পীরা পোশাক পরিধান করে মঞ্চে এসে অভিনয় করে থাকেন। যা তার পোশাক দ্বারা চরিত্রকে অনেকাংশে নির্দেশ করে থাকে এবং সাধারণ দর্শকেরও বুঝতে সুবিধা হয়। যেমন: রাজা, উজির, প্রজা, চাকর, নায়ক, নায়িকা, বয়স্ক চরিত্র ইত্যাদি।

২ : ৮.৮ শিল্পী ও কলাকুশলী

প্রত্যেকটি যাত্রাদলে শিল্পী ও কলাকুশলী সংখ্যা থাকে সর্বনিম্ন ৩০ থেকে ৪০ জন। সেখানে যন্ত্রশিল্পী থাকেন নির্দিষ্ট সংখ্যক এবং অভিনয় শিল্পী পালার চরিত্র অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এখানে এ্যামেচার শিল্পীরও উপস্থাপন করা হয়ে থাকে যাত্রাপালার প্রয়োজন অনুসারে। যাত্রাপালার প্রয়োজন অনুযায়ী কখনো কখনো কমেডি বা কৌতুক অভিনেতার আগমন ঘটে। যিনি মঞ্চে উপস্থিত হয়ে ভারাক্রান্ত পরিবেশকে আনন্দ দানের মধ্য দিয়ে পুনরায় স্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি করেন। মঞ্চে আসার সময় থেকে মঞ্চে থাকা ও শেষে যাওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময়টুকু দর্শক শ্রোতা হাস্য-রসের সমুদ্রে ভাসতে থাকেন। একটি পালা উপস্থাপনের শুরুতে থাকে যন্ত্রসংগীতের ব্যবহার। ১৫ থেকে ২০ মিনিট ধরে চলে বাজনা যাকে যাত্রার ভাষায় কনসার্ট বলা হয়ে থাকে। কনসার্ট শেষ হওয়ার পরপরই শুরু হয় বন্দনা গান এরপর মূল যাত্রাপালা। প্রাচীনকালে বন্দনা গানটি দেবতাদের নাম স্মরণ করে মঞ্চে দাঁড়িয়ে চতুর্দিক ঘুরে গাওয়া হতো। কিন্তু কালের আবর্তে এখন দেশের গান ও অন্যান্য গান গাওয়া হয়ে থাকে। আজও একটি জনপ্রিয় গানের কথা মনে পড়ে, যা ছোটোবেলায় যাত্রার মঞ্চে দেখেছি। মঞ্চে ৬

জন, কখনো কখনো ১০ জন অভিনেত্রী এক সাথে সারি বদ্ধভাবে দু'টি লাইনে দাঁড়িয়ে গাইতেন খুব জনপ্রিয় একটি গান—

'এই পদ্মা এই মেঘনা এই যমুনা সুরমা নদী তটে
আমার রাখাল মন গান গেয়ে যায়
এ আমার দেশ এ আমার প্রেম
কত আনন্দ বেদনায় মিলন-বিরহ সংকটে॥'

২ : ৮.৯ যাত্রাগানে বিবেক

প্রত্যেকটি যাত্রাপালায় অর্থাৎ সামাজিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক সব পালাতেই কম-বেশি বিবেকের অবস্থান দৃশ্যত। দরাজ কণ্ঠে ঢিমা লয়ে কখনো আবার তাল ছাড়া বিবেক গান পরিবেশন করা হয়। যা শ্রোতামনে আত্মোপলব্ধি ঘটায়। সেজন্য যাত্রাপালায় বিবেকের চরিত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। পালার একটি বিশেষ মুহূর্তে এই বিবেক মঞ্চে উপস্থিত হয়ে গানের সুরে সাধারণ মানুষের মধ্যে জাগতিক চিন্তা ভাবনার অবসান ঘটিয়ে সৎ ও সত্যের পথকে নির্দেশ করে পরমে মিলিত হবার ভাবনাকে সামনে রেখে মানুষকে জ্ঞানদান করে থাকে।

'আপন বুঝে চল এই বেলা
ঐ ব্যস্ত শকুন উড়ছে মাথায় গো
বসে যুক্তি দিচ্ছেন হাড়গোলা।

এটি যাত্রাপালার প্রথম বিবেক গান। আজ থেকে ১১৪ বছর আগে ১৮৯৪ সালে যাত্রার আসরে প্রথম আগমন ঘটে বিবেকের। পালাকার অহিভূষণ ভট্টাচার্য তাঁর 'সুরথ-উদ্ধার' পালায় এ ধরনের একটি অভিনব ও মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রের অবতারণা করে যাত্রাভিনয়ের ইতিহাসে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন।'[১০২] যাত্রাপালার সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও যাত্রার প্রধান অবলম্বন হলো ধর্ম ও পুরাণাশ্রিত কাহিনী এ বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকবেনা বলে আশা করি। আর সে কারণেই তৎকালীন সময়ে যাত্রার সামগ্রিক উপস্থাপনায় ছিল সুরের প্রাধান্য মণ্ডিত। 'অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি সংগীতবহুল পালার নাম —'কৃষ্ণ-সুদাম', 'কমলে-কামিনী', 'নৌকা বিলাস', 'রাই উন্মাদিনী', 'স্বপ্নবিলাস'। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক এসব যাত্রাপালায় ছিলো বহুবিধ গানের ব্যবহার এবং সেগুলোর নামও ছিলো পৃথক পৃথক। যেমন: একানীর (শিশু শিল্পী অর্থে) গান, সখীর গান, ব্যলটের গান, ডুয়েট গান, জুড়ি গান এবং সবশেষে বিনিদ্র রজনীর দর্শককে নাড়া দিয়ে যায় বিবেকের গান।'[১০৩] বিবেক গান মনস্তত্ত্ব ও দর্শনবাদের চেতনায় সাজানো পঙ্‌ক্তিমালা। কখনো কখনো যাত্রাপালায় অভিনীত চরিত্রে দ্বান্দ্বিক মুহূর্তের ঘটনা ঘটে যা বিবেক নামক এই চরিত্রই ঘটিয়ে থাকে। 'বিবেক চলমান ঘটনায় ক্লাইমেক্স সৃষ্টি করে। পালা কাহিনীর কোনো চরিত্র যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, লোভ-মোহ-প্রলোভনে বিভ্রান্ত হয়, ভালো-মন্দের

টানা-পড়েনে প্রবলতর হয়ে ওঠে মানসিক অস্থিরতা তখনই বিবেক দিক নির্দেশ দিয়ে যায় গানে গানে।'[১০৪] এই বিবেক দু'ধরনের হয়ে থাকে শরীরী ও অশরীরী। শুরুতে বিবেক গান হতো অশরীরী এবং 'বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের মাঝামাঝিতে এসে অশরীরী বিবেক শরীরী রূপ পায়। বিবেক রূপান্তরিত হয় দাঁড়ি, মাঝি, ভিক্ষুক, চাষী, মজুর, বাউল ইত্যাদি চরিত্রে।'[১০৫] ব্রজেন কুমার দে প্রথম শরীরী বিবেকের আবির্ভাব ঘটান মঞ্চে। তিনি অহিভূষণ ভট্টাচার্যের অশরীরী বিবেককে প্রথম নাটকীয় কৌশলে পালা কাহিনীর একটি অন্যতম চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেন ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গবীর' যাত্রাপালায়। এরই ধারাবাহিকতায় যশোর জেলার যাত্রাশিল্পও বিবেকের জোয়ারে প্লাবিত হয়। তৎকালীন সময়ে বিবেক গান হিসেবে গান রচিত হলেও বিভিন্ন লোককবিদের ভাবপূর্ণ গান বিবেক গানে স্থান পায় এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। উদাহরণ স্বরূপ বিজয় সরকারের একটি বিচ্ছেদী গান—

'পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনী
একদিন ভাবি নাই মনে।'

২ : ৮.১০ যাত্রাগানে নারী চরিত্র

আদিতে যাত্রাগানে নারী চরিত্রের উপস্থিতি দেখা যায় না। সমাজের নানারূপ বিড়ম্বনায় তাদেরকে অন্দর মহলের বাইরে আসতে দেয়নি। তৎকালীন সময়ে নারী শিক্ষার কোনোরূপ ব্যবস্থা ছিলনা; ধর্মান্ধতা এর প্রধান কারণ। পরবর্তীতে রাণী রাসমণি, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত এর মতো বিদুষীরাই নারী শিক্ষায় ব্রতী হন। নারীকে এইরূপ অবমূল্যায়ন করা হতো যে সতীদাহ'র মতো জঘন্য প্রথা গীত-বাদ্য সহযোগে শশ্মান ঘাটে কৃত্য হতো। অমানবিক এই বর্বরতা থেকে সমাজকে মুক্তি দিতে তথা নারী সমাজকে তার ন্যায্য সম্মানে অধিষ্ঠিত করতে রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বরকানাথ ঠাকুর এর মতো ত্রিকালজ্ঞ যোগীপুরুষগণ ব্রতী হন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় এর দশক, বাংলার নারী সমাজ অন্দরের বাইরে তার যোগ্যতা অধিষ্ঠিত করেন মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার সাহসী পদক্ষেপের হাত ধরে। তারই ফলশ্রুতিতে নারী শিক্ষা গ্রহণ তথা বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞে নারীরা অংশ গ্রহণ শুরু করে। সমাজ ব্যবস্থার এই পথ চলায় বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ যাত্রাগানে তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যা বাঙালি সংস্কৃতিকে বেগবান করে। পূর্বে যাত্রাগানে নারী চরিত্র উপস্থিত করা হতো পুরুষকে নারী সাজিয়ে। মেকাপ এবং পোশাকের ব্যবহারের মাধ্যমে চরিত্রটি এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হতো যে অনায়াসে ঐ পুরুষই নারী রূপে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতো। উদাহরণ স্বরূপ 'বিশিষ্ট যাত্রানট নন্দ দুলাল অধিকারী'র কথা বলা যায়। যিনি মঞ্চে নারী চরিত্র অভিনয়ে সুখ্যাতির জন্য নন্দ রানী নামে সমধিক পরিচিত। রাণী ভবানী চরিত্রে রাণী সাজে সজ্জিত হয়ে তিনি যখন রাণী ভবানী, রাণী ভবানী, আমি রাণী ভবানী এ ভাবে বীর রসের সংলাপ বলতে বলতে আসরে ঢুকতেন এবং বিভিন্ন অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে পায়চারি করতে করতে এক অদ্ভুত ভঙ্গিমায় যখন সিংহাসনে বসতেন; তখন বিপুল সংখ্যক

Dhaka University Institutional Repository

দর্শকের মুহুর্মুহু করতালিতে সরগরম হয়ে উঠতো গোটা যাত্রা প্যাণ্ডেল।'[১০৬] এই নারী চরিত্রের বাস্তবিক শরীরীরূপ যাত্রামঞ্চে অধিষ্ঠিত হয় বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ এর দশকে। তখন থেকে যাত্রাশিল্পের নতুন রূপ প্রকাশ পায় এবং বিভিন্ন পালায় অতীব প্রশংসার সাথে এর বিকাশ ঘটে। যা অদ্যাবধি বর্তমান।

২ : ৮.১১ সামাজিক মর্যাদা

শুরুর থেকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কাছে এ শিল্পের গ্রহণ যোগ্যতা ছিলো সর্বাগ্রে। যাত্রাগানের স্বর্ণযুগে এর অবস্থান সমাজের মানুষকে এতটাই আকর্ষণ করেছিলো যে বিভিন্ন সময়ে যাত্রাশিল্পীদেরকে তাদের অভিনয়ের নাম ভূমিকায় মানুষ পরিচিত হতো। যা সকল শ্রেণিপেশার মানুষ তাদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো। বাজার, ঘাটে যেখানেই একজন শিল্পীর দর্শন হতো সেখানেই তাকে সমাদর করতো। জনপ্রিয়তার খাতিরে পেশাদার যাত্রাশিল্পী ছাড়াও শখের বসে ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ এই শিল্পের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বশতঃ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতো। তবে সময়ের আবর্তে যাত্রাশিল্পে অশ্লীলতা প্রবেশের ফলে এখন আর তা দেখা যায় না।

২ : ৮.১২ ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র

একটি পালা দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের সময় সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে যন্ত্রশিল্পের অনবদ্য সৃষ্টি। যা যাত্রাপালার প্রত্যেকটি চরিত্রকে আলাদা করে নির্দেশ করে থাকে। কখনো হাসি, কখনো কান্না, কখনো ভয়ের উদ্রেক ঘটায় এই বাদ্যযন্ত্র। যাত্রাপালায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে যে সকল বাদ্যযন্ত্র, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য— কঙ্গ, বঙ্গ, হারমোনিয়াম, ঢোল, তবলা, মৃদঙ্গ, ঝাঁজ, কাঁশি, বাঁশি, ক্লারিওনেট, সানাই, ব্যাগপাইপ এবং আধুনিক কালের বাদ্যযন্ত্র কী-বোর্ড, ড্রামসেট ইত্যাদি। নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্য থেকে এসকল স্ব-শিক্ষিত যন্ত্রশিল্পীরা প্রত্যেকটি অভিনেতার শব্দ প্রক্ষেপণের সাথে সাথে কোথায় কখন কি ধরনের মিউজিক বাজাতে হবে তা বুঝে যন্ত্রের ব্যবহার করে থাকে। কাঁশিতে একটি আঘাতের মাধ্যমে বোঝানো হয় একটি অঙ্কের শুরু। অর্থাৎ প্রত্যেকটি যাত্রাপালা কয়েকটি অঙ্কে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন: প্রথমাঙ্ক, দ্বিতীয়াঙ্ক, তৃতীয়াঙ্ক এবং শেষাঙ্ক। এসব অঙ্কের ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রোতারাও বুঝতে পারেন যে, কখন পালা শুরু বা শেষ হচ্ছে। সানাই বাঁশির প্রয়োগটা দেখা যায় করুণ রসের জায়গা গুলোতে। ক্লারিওনেট এসকল করুণরসকে আরও একটু উচ্চস্বরে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার রোমান্টিক অংশেও বাঁশির প্রয়োগ রয়েছে।

২ : ৮.১৩ উপস্থাপনের সময়

বর্ষার শেষ শরতের শুরু। প্রবহমান প্রকৃতির লীলায়িত ছন্দধারায় প্রকৃতি সাজে এক অপরূপ রূপে। শিউলি ফুলের হলুদ আভা এবং কাশফুলের শুভ্রতা মহামায়ার আগমনী বার্তাকে দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয় চিরকুট স্বরূপ। শরতের মোহনীও রূপমাধুর্যের রূপকে আরও বেশি দৃষ্টিনন্দন করতে ঋতু রানী শরতের প্রতীক হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

শিউলী ফুল সর্বজন স্বীকৃত। এই সময় থেকেই যাত্রাগানের শুরু। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে গ্রামে মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে এবং এসকল মেলাকে কেন্দ্র করেই যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়। মেলা উপলক্ষে প্রায় একমাস আবার কখনো দু'মাসও যাত্রাপালা চলতে থাকে একই স্থানে। তবে সবসময় এই পালাগুলি অনুষ্ঠিত হয় রাতে। অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে শুরু করে শেষরাত অবধি। এ সম্পর্কে বাবু গিরীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের সাথে আলাপ-চারিতার একপর্যায়ে তিনি এ কথা জানান। তিনি আরও বলেন, সমগ্র যশোর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে রাতের পর রাত জেগে যাত্রাপালায় অভিনয় করা এবং নির্দেশনা দেবার সেসব কাহিনী। শত কষ্ট এবং দুঃখের মাঝেও শিল্পীর শিল্পত্ব সৃষ্টির বাসনার কথা। দর্শকের অনুভূতি স্বচক্ষে উপলব্ধিতার কথা। রাতের গভীরতার সাথে সাথে শ্রোতারাও মন্ত্রমুগ্ধের মত মঞ্চের দিকে তাকিয়ে থেকে কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন, আবার কখনোবা ক্ষোভে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। প্রায় ৭৫ বছর বয়সেও তার কথাগুলো যেন বারবারই যাত্রা মঞ্চের সামনে বসে দেখা সিরাজউদ্দৌলা, নাচমহল বা শ্মশানে হলো ফুলশয্যার মত পালাগুলোকে মনে করিয়ে দিচ্ছে তার কৌতূহলী চোখ দু'টো, যা আবেগে ভেসে উঠছে বারংবার। মাঝে মাঝে তিনি আবেগের বশবর্তী হয়ে এ সব পালার ডায়ালগ বলছেন নির্দ্বিধায়।

বাঙালি সংস্কৃতির একটি ঐতিহ্যবাহী সম্পদ হলো যাত্রাশিল্প। যাত্রাগানের মধ্যেও সুসাহিত্যের উপাদান ও অভিজাত সংগীতের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন সমাজে কৃষ্ণযাত্রা থেকে আরম্ভ করে সব রকম যাত্রাগানই একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলো এবং জনচিত্তেও তা সমাদৃত হয়েছিলো, যা বর্তমানে খুব চোখে পড়ে না। তবে গবেষণাকর্মের জন্য বিভিন্ন যাত্রাশিল্পীর অভিমত অনুযায়ী একথা বলা যায় যে, সময়ের আবর্তে যাত্রাগানে অশ্লীলতা প্রবেশের ফলে যাত্রাশিল্পের জৌলুস হারিয়েছে। একসময় এ শিল্পের মাধ্যমে অনেক মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির অবসান ঘটেছে। যা পুনঃরুদ্ধার ঘটালে জাতীয় মূল্যবোধ এবং বাঙলা সংস্কৃতির ঐতিহ্যপূর্ণ এ শিল্পের মাধ্যমে সুসংগঠিত করে সামাজিক অবক্ষয় থেকে জাতিকে তথা বাংলাকে মুক্ত করে নতুন মাত্রার যোগসূত্র সৃষ্টি করা যাবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বায়নের কথা বলে যে সংস্কৃতির মুখে সমাজ জীবন ব্যহত হচ্ছে তা খুবই কষ্টের বিষয়। বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম ধারা 'যাত্রাগান' তার পুরনো ঐতিহ্য ফিরে পাক এ আশা রাখি মনে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. বাসুদেব বিশ্বাস বাব্‌লা, *দক্ষিণবঙ্গের লোকসংগীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃ.– ৬৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৬৮

৩. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৬৯

৪. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৬৯

৫. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৬৯

৬. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৭০

৭. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৭১

৮. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৭২

৯. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৭২

১০. সাক্ষাৎকার: বালাগানের বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যাদি প্রদান করেছেন মূল সন্ন্যাসী শ্রী আনন্দ মোহন দত্ত মহাশয়, স্থান: পারখাজুরা, থানা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর,তারিখ: ২১-০৬-২০১৬।

১১. আবু ইসহাক হোসেন, *বাংলা লোকগান (প্রথম খণ্ড)*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮। পৃ.– ১৬০

১২. বাসুদেব বিশ্বাস বাব্‌লা, *দক্ষিণবঙ্গের লোকসংগীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃ.– ৪০-৪১

১৩. মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পাদিত), *লোকসঙ্গীত*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ডিসেম্বর। ২০০৭, পৃ.– ৪৩

১৪. আবু ইসহাক হোসেন, *বাংলা লোকগান (প্রথম খণ্ড)*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮। পৃ.– ১৬১

১৫. বাসুদেব বিশ্বাস বাব্‌লা, *দক্ষিণবঙ্গের লোকসংগীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃ.– ৩৮-৩৯

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৩৯-৪০

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৪০

১৮. আবু ইসহাক হোসেন, *বাংলা লোকগান (প্রথম খণ্ড)*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮। পৃ.– ১৬১

১৯. বাসুদেব বিশ্বাস বাব্‌লা, *দক্ষিণবঙ্গের লোকসংগীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃ.– ১৫৬

২০. আবু ইসহাক হোসেন, *বাংলা লোকগান (প্রথম খণ্ড)*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮। পৃ.– ৫৩

২১. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল: অগ্রথিত গীতিগুচ্ছ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, মে, ১৯৮৩। পৃ.– ১

২২. শাহিদা খাতুন (সম্পাদিত), *ফোকলোর সংগ্রহমালা*-১: *কবিগান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ২০১০। পৃ.– সাত-আট

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ.– আট-নয়

২৪. বাসুদেব বিশ্বাস বাব্‌লা, *দক্ষিণবঙ্গের লোকসংগীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃ.– ১৬৩

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১৫৭

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১৫৯

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১৬০

২৮. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান ইতিহাস ও রূপান্তর*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে, ২০১১। পৃ.– ৬২

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৬২

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৬২

৩১. বাসুদেব বিশ্বাস বাব্‌লা, *দক্ষিণবঙ্গের লোকসংগীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃ.– ১৬১

Dhaka University Institutional Repository

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১৬২

৩৩. শাহিদা খাতুন (সম্পাদিত), *ফোকলোর সংগ্রহ মালা-১: কবিগান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ২০১০। পৃ.– নয়

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ.– দশ

৩৫. বাসুদেব বিশ্বাস বাব্‌লা, *দক্ষিণবঙ্গের লোকসংগীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃ.– ১৬৩

৩৬. আবু ইসহাক হোসেন, *বাংলা লোকগান (প্রথম খণ্ড)*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮। পৃ.– ৭৮

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৭৯

৩৮. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান ইতিহাস ও রূপান্তর*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে, ২০১১। পৃ.– ৫৪

৩৯. শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: যশোর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ২০১৪। পৃ.– ১৪৪

৪০. সুরঞ্জন রায়, *মোসলেমউদ্দিন বয়াতির জারিগান লোকধারার পারম্পর্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ২০১৩। পৃ.– ৫০

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৫১

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৫১

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৬৩

৪৪. মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পাদিত), *লোকসঙ্গীত*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০০৭। পৃ.– ৬৪

৪৫. অধ্যক্ষ কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, *জেলা ঝিনাইদহের লোক কবি ও লোক গান*, গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। পৃ.– ১৪৮

৪৬. সাক্ষাৎকার: মোঃ মনিরুদ্দিন মোড়ল, মনিরামপুর, যশোর, তারিখ: ২৫-০৬-২০১৬।

৪৭. শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: যশোর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ২০১৪। পৃ.– ১৪৫

৪৮. সুরঞ্জন রায়, *মোসলেমউদ্দিন বয়াতির জারি গান লোকধারার পারম্পর্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ২০১৩। পৃ.– ৫২

৪৯. শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: নড়াইল*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ২০১৩। পৃ.– ১২৭

৫০. সাক্ষাৎকার: মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, ঝিনাইদহ জেলা বাউল সমিতি, স্থান: জেলা বাউল সমিতি, পুরাতন শিশু একাডেমী ভবন, কাঞ্চন নগর, ঝিনাইদহ, তারিখ: ১৭-১২-২০১৭।

৫১. সাক্ষাৎকার: মোঃ জামিরুল ইসলাম বয়াতী, সাংগঠনিক সম্পাদক, ঝিনাইদহ জেলা বাউল সমিতি, স্থান: জেলা বাউল সমিতি, পুরাতন শিশু একাডেমী ভবন, কাঞ্চন নগর, ঝিনাইদহ, তারিখ: ১৭-১২-২০১৭।

৫২. সাক্ষাৎকার: মতলেব ফকির, স্থান: কালেক্ট্রি মার্কেট মাঠ, যশোর, তারিখ: ১৯-১২-২০১৭।

৫৩. ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ, ১৯৯৩। পৃ.– ৫৬

৫৪. ড. আব্দুল ওয়াহাব, *বাংলার বাউল সুফি সাধনা ও সংগীত*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১১। পৃ.– ১০০

৫৫. ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী, *লোক সংগীত*, প্যাপিরাস প্রকাশন, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৯। পৃ.– ৩২

৫৬. সামীয়ূল ইসলাম, *বাংলাদেশের লোকসংগীতের শ্রেণীবিন্যাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ২০০৭। পৃ.– ৩০

Dhaka University Institutional Repository

৫৭. আহমদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব*, পড়ুয়া, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ। পৃ.– ৪৩

৫৮. ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী, *লোক সংগীত*, প্যাপিরাস প্রকাশন, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৯। পৃ.– ৪১

৫৯. ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ, ১৯৯৩। পৃ.– ৫৬

৬০. আব্দুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন (২য় ও ৩য় খণ্ড)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮। পৃ.– ২৭০

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ.– ২৭৪

৬২. অধ্যক্ষ কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, *জেলা ঝিনাইদহের লোককবি ও লোকগান*, গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। পৃ.– ৪৮

৬৩. আহমদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব*, পড়ুয়া, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ। পৃ.– ৪৭

৬৪. সাক্ষাৎকার: সাদি তাইফ, মিরপুর, ঢাকা, তারিখ: ০২-০২-২০১৮।

৬৫. দীপিকা ঘোষ, *বাঙালির উৎসব*, গ্রাফোসম্যান, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০১৪। পৃ.– ১১

৬৬. আতোয়ার রহমান, *উৎসব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৮৫। পৃ.– ১২

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১৪

৬৮. কনক রঞ্জন দাস, *ব্রতপার্বণে বাঙালিসমাজ*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, বইমেলা-২০০৯। পৃ.– ১৩

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১৩১

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১৯-২০

৭১. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস কর্তৃক সঙ্কলিত, *সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, চতুর্দশ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর,১৯৯৩। পৃ.– ২৫৯

৭২. সাক্ষাৎকার: শ্রীমতি চাঁপা রানী দে, গ্রাম: পারখাজুরা, পো:+থানা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর,তারিখ: ২১-০৬-২০১৬।

৭৩. সাক্ষাৎকার: (ক) প্রাপ্তি শিকদার, ঝিনাইদহ সদর, তারিখ: ১৭-১২-২০১৭। (খ) শ্রীমতি পারুলবালা পাল, গ্রাম: পারখাজুরা, পো: + থানা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর, তারিখ: ২১-০৬-২০১৬।

৭৪. বাসুদেব বিশ্বাস বাব্‌লা, *দক্ষিণ বঙ্গের লোকসংগীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃ.– ২৭

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ.– ২৮

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৩০

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৩১

৭৮. শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: খুলনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন,২০১৪। পৃ.– ৪৪৫

৭৯. বাসুদেব বিশ্বাস বাব্‌লা, *দক্ষিণ বঙ্গের লোকসংগীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃ.– ৩১

৮০. তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ২০০৭। পৃ.– ১০

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১০

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১১

Dhaka University Institutional Repository

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১১

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১১

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১৫

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১৭

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১৮

৮৮. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ, ১৯৯৩। পৃ.– ৫৪

৮৯. সাক্ষাৎকার: যাত্রাভিনেতা সুনীল কুমার দে, কর্মকর্তা চারুকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তারিখ: ১২-০২-২০১৬।

৯০. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ, ১৯৯৩। পৃ.– ৫৪

৯১. সাক্ষাৎকার: ড. তপন বাগচী, গবেষণা বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, তারিখ: ১২-০২-২০১৮।

৯২. সাক্ষাৎকার: যাত্রাশিল্পী অনন্ত দেবনাথ, শ্রী তপন কুমার সরকার, সুনীল কুমার দে, অভিনেত্রী জ্যোৎস্না দাস, বাবু গণেশ কুন্ডু, শ্রী প্রকাশ কুমার ঘোষ, প্রবীর দেবনাথ, মনিরামপুর, যশোর, তারিখ:২২-১২-২০১৬। পূর্ণিমা রানী ভঞ্জ, কেশবপুর, যশোর, তারিখ: ২৩-১২-২০১৬। গিরীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, ঝিনাইদহ; তারিখ: ১৭-১২-২০১৭।

৯৩. মিলন কান্তি দে, *যাত্রাশিল্পের সেকাল-একাল*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫। পৃ.– ১২৬

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১২৬

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১২৭

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১২৭

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১২৭

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১২৭-২৮

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১২৮

১০০. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১২৯

১০১. সাক্ষাৎকার: যাত্রাশিল্পী অনন্ত দেবনাথ, শ্রী তপন কুমার সরকার, সুনীল কুমার দে, অভিনেত্রী জ্যোছনা দাস, বাবু গণেশ কুন্ডু, প্রবীর দেবনাথ, মনিরামপুর, যশোর; পূর্ণিমা রানী ভঞ্জ, কেশবপুর, যশোর।

১০২. মিলন কান্তি দে, *যাত্রাশিল্পের সেকাল-একাল*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা,ফেব্রুয়ারি, ২০১৫। পৃ.– ১০৭

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১০৭

১০৪. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১০৭

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১০৮

১০৬. সাক্ষাৎকার: শ্রী তপন কুমার সরকার, মনিরামপুর, যশোর।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

সুরবৈশিষ্ট্য

প্রকৃতিগত দিক থেকে নদীমাতৃক বাংলাদেশের যেমন বিষয় বৈচিত্র্যতা রয়েছে, তেমনি ভাবে রয়েছে সুর ও সঙ্গীতের বৈচিত্র্যতা। যশোর অঞ্চলের লোকগানের বিশেষত্বই ভাটিয়ালি সুরের প্রভাব। এ অঞ্চলের লোকগানে ভিন্নতা থাকলেও সকল প্রকার গানের মধ্যে সুচারু ভাবে ভাটিয়ালির সুর বিরাজমান। সুরের চলনে উঠা-নামা কিছুটা নদীর স্রোতের মতো, যা শ্রুতিতে অনন্য মাদকতার সৃষ্টি করে চলেছে। যশোর জেলার লোকগানের সুরবৈশিষ্ট্য আলোচনার প্রাক্কালে ভাটিয়ালির সুর সম্পর্কে আলোচনা আবশ্যক। বিজ্ঞ গবেষকগণ ভাটিয়ালির সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন স্বমতে নির্ভর করে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'ভাটিয়ালির প্রাচীনত্ব' প্রবন্ধে বাংলার লোকসঙ্গীতকে দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। 'প্রথমত: উৎসব-অনুষ্ঠান কিংবা কোনো বিশিষ্ট ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমবেত সঙ্গীত এবং দ্বিতীয়ত: নিঃসঙ্গ অবসর মুহূর্তে গেয় একক সঙ্গীত। তাঁর মতে, কর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমবেত সঙ্গীতকে প্রধানত: সারি শ্রেণির গান বলিয়া নির্দেশ করা যায়। নিঃসঙ্গ অবসরের একক সঙ্গীতই ভাটিয়ালি নামে পরিচিত। তিনি আরও বলেছেন, প্রত্যেকটি দেশের লোকসঙ্গীত প্রধানত: ইহার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সমাজ-মানসের পটভূমিকার উপর জন্ম লাভ করে।'[১] ড. ভট্টাচার্যের সংজ্ঞার আলোকে আমরা বলতে পারি খরস্রোতা নদীর স্রোতের তালে নৌকা যখন চলতে থাকে তখন ঢেউয়ের বেগে নৌকার গায়ে আছড়ে পড়া পানির আঘাতে এক মধুর ছন্দের সৃষ্টি হয়। এই ছন্দের সাথে বাতাসের শোঁ শোঁ ধ্বনির মিলনে মাঝি আপন মনে যে মোহনীয় সুরের সৃষ্টি করে তাকে ভাটির সুর বলে।

ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে এ জেলায় বিভিন্ন লোকগানের উৎপত্তি হয়েছে। এমনই একটি ধারার গান বালাগান। কপোতাক্ষ, হরিহর, মুক্তেশ্বরী, শ্রীনদী, ইছামতি, নবগঙ্গা এবং ভৈরব এ জেলার উল্লেখযোগ্য নদী। যশোর জেলায় যে সকল অঞ্চলে এ গানের প্রচলন আছে সেখানেই নদী দৃশ্যত ফলে ভাটিয়ালি সুরের প্রভাব এখানে প্রতীয়মান। সুর-ছন্দে গাওয়া গানটি মূলত মন্ত্র। গানগুলো রাগ ভিত্তিক কি না এ তথ্যের অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, খাম্বাজ ঠাটকে অবলম্বন করে গানগুলো গাওয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ খাম্বাজ ঠাটে ব্যবহৃত সা রা গা মা পা ধা ণা এ সাতটি স্বরের প্রয়োগ বালা গানে রয়েছে। একটি গানের বাণী—

'জল শুদ্ধ, স্থল শুদ্ধ, শুদ্ধ আপন কায়া
ত্রিকোণ পৃথিবী শুদ্ধ, শুদ্ধ মহামায়া।'

[সূত্র: সং. গান– ১২]

Dhaka University Institutional Repository

কোথাও সুরের চলনে উচ্চ, আবার কোথাও মধ্যম গ্রামের ব্যবহার এ গানে সব সময় দেখা যায়। নিম্ন গ্রামে অর্থাৎ উদারাতে গানের সুর দৃশ্যত নয়। বালাদার তার নিজস্ব ভঙ্গিতে গানটি পরিবেশন করে থাকেন। এর মধ্য দিয়ে গ্রামের সহজ সরল মানুষের জাগতিক উচ্ছ্বাস ও আত্মিক চাওয়া পাওয়ার মর্মার্থে ঈশ্বরের প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট ভাবে সংগীতে বিশেষ পারদর্শী না হয়েও সকল বালা সন্ন্যাসীরা এ গান সমস্বরে গাইতে পারেন এবং গেয়ে থাকেন। এখানে বালা সন্ন্যাসী বলতে দেউল বা নীল পূজাকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট যে সকল ব্যক্তি নিয়ম-নিষ্ঠার মাধ্যমে ব্রত পালন করেন তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। বালাদার গান ধরার সাথে সাথে তার দোহারশিল্পী হিসেবে বালা সন্ন্যাসীরা গানটি পরিবেশনের মাধ্যমে এর ভাবকে দর্শকের মাঝে তুলে ধরে গানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। সন্ন্যাসীদের হাতে রাখা বেতের ছড়ি, ঢাক এবং কাঁসির তালের সাথে ধীর লয়ে তিন তিন ছন্দে হেলে দুলে গানটি পরিবেশিত হতে দেখা যায়। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ বালা গানের অংশবিশেষ উল্লেখ করছি—

সৃষ্টি পত্তন

তাল: দাদরা

নাহি ছিল রবি শশী
সন্ন্যাসী তপস্বী ঋষি
নাহি ছিল এমনি সুন্দর।

স্বরলিপি:

II পা পা ধা । ধা র্সা -া I র্সা -া র্সা । ণা ধা -া I
না ০ হি ছি ল ০ র বি ০ শ শী ০

I পা -া পা । ধা ণা ধা I পা ধা পা । মা রা -া I
স ন্ ন্যা সী ত ০ প ০ স্বী ঋ ষি ০

I রা -া মা । মা পা -া I ধা া ণা । ধা পা -া I
না ০ হি ছি ল ০ এ ম ০ নি সু ন্

I পা -া -া । -া -া -া II
না ০ ০ ০ ০ ০

সমগ্র বালা গানটি কখনো তালের ছন্দে কখনো আবার কবিতার মতো পাঠ করা হয়। সুরে সুরে পাঠকৃত এই গানটি লক্ষ্মী ব্রতের পাঁচালির সাথে তুলনা করা যায়। যেমন—

‘ঘট কুমার নামে তারা সাতে আটে ভাই
মাটি খানি ছেনে নিয়ে রাখিলেন এক ঠাঁই।’

[সূত্র: সং. গান–৪]

গানের প্রতি চরণ শেষে ঢাকের তেহাই বাদনের মধ্য দিয়ে বালাগানের এক একটি অংশের সমাপ্তি বোঝানো হয়ে থাকে। বন্দনা, শিবের নিদ্রাভঙ্গ, পাটের নিদ্রাভঙ্গ, পাটের প্রণাম, সন্ন্যাসী ঘাটানো, শিবের প্রণাম, সরস্বতীর স্তব, গণেশের স্তব, শিবের প্রণাম, সর্ব দেবের বন্দনা, পাট জাগানো এভাবে পর্যায় ভিত্তিক এসকল বালার মন্ত্রগুলোকে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

ভাষা বা শব্দগত দিক বিচারে দেখা যায়, বালাগানে যে ধরনের ভাষার প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে শিক্ষিত সমাজের গান বলা কোনো রূপ ভুল হবে না। কারণ প্রত্যেকটি শব্দ সুললিত ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই গানের বাণীতে শুদ্ধ শব্দচয়ন এবং সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়। স্বশিক্ষিত সমাজের গান যে এতো সাবলীল–পরিচ্ছন্ন হতে পারে তা কোনো অবস্থাতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমরা যদি বালাগানের ভাষারীতিকে গীতিকার সাথে তুলনা করি তাহলে মধ্যযুগে সৃষ্ট নাথগীতিকার সাথে তুলনা করতে পারি। এর ছন্দের দিক বিবেচনা, সুললিত শব্দ চয়ন, নান্দনিক ভাবের প্রকাশ; সবকিছু মিলিয়ে অশিক্ষিত বা স্বশিক্ষত জনের রচনা বলা বাহুল্য। ভাব ও কাহিনীগত বিশ্লেষণে বেশিরভাগই পুরাণ অবলম্বনে সৃষ্ট; যা অশিক্ষিত জনের কোনোরূপ বোধ্য নয়। অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন বিশেষ জনেরাই এর স্রষ্টা পুরুষ হয়ে থাকবে। গবেষণায় উল্লিখিত বালাগান কবে কখন সৃষ্টি হয়েছিলো, কে সৃষ্টি করেছিলো তার নির্দেশনা পাওয়া যায় না। তবে ভাষারীতির বিশেষ প্রয়োগ ও ছন্দের দিক বিশ্লেষণ করে এটুকু বলা যায়, শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন কোনোব্যক্তি এর রচয়িতা। নিম্নে বালা গানের নমুনা —

বন্দনা

‘প্রণাম করিলাম ভক্তি আদ্য দেব আদ্য শক্তি
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি দেবা
দিবাকর নিশিপতি, দেবরাজ গণপতি
স্বর্গবাসী দেব পদে সেবা।’[২]

বালাগানের অবিচ্ছেদ্য অংশ অষ্টক গান। গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে এই গানের সৃষ্টি। একই উৎসবের দু’টি অংশ — বালা এবং অষ্টক গান। ক্ষেত্র বিশেষে যশোর অঞ্চলে অষ্টক গান, অষ্টক পালা, অষ্টক যাত্রা আবার অষ্টও বলা হয়ে থাকে। অষ্টক পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। বর্তমান অষ্টকের সুরের চলনের সাথে উত্তরাঞ্চলের চটকা গানের তুলনা করা যায়। চটকা, উত্তর অঞ্চলের ভাওয়াইয়া গানের একটি বিশেষ আকর্ষণ। যা দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়ে থাকে। পরিবেশন রীতি অনুযায়ী দেউল বা নীল পূজা শুরুর তেরো দিন বা পনেরো দিন পূর্ব থেকে অষ্টক গান গাওয়া হয়। জানান দেওয়া হয় নীল পূজার আগমনের। গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ি ঘুরে ঘুরে রাধা-কৃষ্ণ, কখনো আবার হর-পার্বতী সেজে এ গান পরিবেশন করা হয়। নির্দিষ্ট রাগের ব্যবহার এ সকল লোকগানে তেমন দেখা যায় না। তবে কোথাও কোথাও রাগের প্রকারন্তর সাদৃশ্য রয়েছে।

তাল: কাহারবা

'নবগঙ্গার দক্ষিণ ধারে

বসত করি পণ্ডিতপুর গ্রামে ওগো মা

মাগো তোমার সন্তান গণেশ, কার্ত্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী॥'

অষ্টক গানের বন্দনার একাংশ এখানে উল্লেখ করা হলো। যা গানের রাগ নিরূপণে সুবিধা হবে। গানের এ অংশে বিলাবল রাগের ব্যবহার দেখা যায়। বিলাবল রাগে আরোহণ– সা রা গা মা পা ধা না র্সা এবং অবরোহণ– র্সা না ধা পা মা গা রা সা স্বরগুলো সাবলীল ভাবে ব্যবহৃত। নিম্নে গানের রাগ অনুযায়ী স্বরলিপি——

II সা সগা গা মা । মা পা পা -া I -া -া -া -া । পনা -া র্সা ধা I
ন ০০ ব ০ গ ঙ্ গা ০ ০ র ০ ০ দ০ ক্ খি ০

I পা পধা পধা নর্সা । ধনা -া -া -া I নর্সা নর্সা ধনা ধপা। পনা ধপা -া -া I
ন ধা০ রে০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০

I পা না না নর্সা। নধা ধর্সা নধা পা I ধা পা মা গমা। গরা রমা গমা রগা I
ব ০ সত ক০ ০০ রি০ ০০ ০ পণ্ ডিত পুর গ্রা০ ০০ মে০ ০০ ০০

I সরা রা সা সরা। -া -া -া -সা I সা রা পা -া । পমা মধা পধা মপা I
০০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ও গো মা ০ ০০ ০০ ০০ ০০

I গমা রগা -া -া । -া -া -া -া II
০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সুরের চলন বিশেষে ভৈরব এবং ইমন রাগেরও আঙ্গিক মিল রয়েছে কোথাও কোথাও। পরিবেশন ক্ষেত্রে তালফেরতা অংশে তালের নৈপুণ্যতা লক্ষ্য করা যায়। মাঝে মাঝে কথোপকথন অষ্টক গানকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে।

বাংলাদেশ কবিগানের প্রাণকেন্দ্র আর কবিগানের মাতৃভূমি যশোর। কবিগান ভাব তত্ত্বমূলক এবং ভাব রসাত্মপূর্ণ গান। কীর্তনের ভাব এ গানকে করেছে সমাদৃত। কবিগানে রয়েছে বেশ কিছু পর্যায় যেমন: বন্দনা, চিতান, পরচিতান, উতোর, জোটের পাল্লা, ছড়াকাটা, মিলন ইত্যাদি। তবে আসর জমানোর জন্য মাঝে মাঝে কিছু ভাব গান গাওয়া হয়ে থাকে যাকে কবির ছুট গান বলে। কবির যুক্তি খণ্ডনেও এর ব্যবহার খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। সুরের মাধ্যমে তর্ক-যুদ্ধ এ গানের পরিবেশনা রীতি। গানের চলনে রয়েছে রাগের ব্যবহার। কবিগান সন্ধ্যা থেকে শুরু করে সারা রাত ব্যাপী হয়ে থাকে। যার ফলে ছুট গানের ক্ষেত্রে রাগের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। কবিয়াল দ্বয় একে একে আসরে এসে প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে সাধারণ শ্রোতার মধ্যে এক ঘেয়েমী ভাবের উদ্রেক

হওয়ায় মাঝে মাঝে রাগ-রাগিণী সহযোগে ছুট গান পরিবেশনের মাধ্যমে শ্রোতাকে আকর্ষণ করতে এ সকল রাগ ভিত্তিক গান ব্যবহৃত হয়। 'আঠারো শতকে ঝিঁঝিট, বেহাগ, দক্ষিণি প্রভৃতি রাগে কবিগান পরিবেশিত হতো। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভৈরবী, বাগেশ্রী, বেহাগ, ললিত প্রভৃতি রাগে কবিগান পরিবেশনের খবর পাওয়া যায়। একই গানের বিভিন্ন অংশ তখন বিভিন্ন রাগে পরিবেশন করা হতো, এমন তথ্যও জানা যায়। বিশেষতঃ কবিগানের সংকলন গুলোতে প্রতিটি গানের সঙ্গে নানা ধরনের রাগ নির্দেশ করতে দেখা যায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ বিভিন্ন রাগের মিশ্রণ ঘটিয়ে কবিগানের সুর সুনির্দিষ্ট আদল পায়।'[৩]

কবিগানে তালের বিষয় বলতে গেলে বলা যায় যে, 'কীর্তন গানে ছোটো লোফা, বড় লোফা, রূপক, যতি, তেওট, দোঠুকি, দশকোশী, দাশপেড়ে, শশীশেখর, বীরবিক্রম প্রভৃতি তাল ব্যাবহৃত হয়। মৃদঙ্গ দিয়ে এসব তাল বাজানো যায়। নড়াইলের কবিয়াল বিজয়কৃষ্ণ সরকারের দলে সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী নামের একজন শিল্পী মৃদঙ্গ বাজাতেন। তাতে মনে হয় বিজয়কৃষ্ণ সরকারের কবিগানে মৃদঙ্গসূত্রে ঔসব তালও অনুসৃত হতো। উনিশ শতকের কবিগানের যেসব নমুনা ছাপা হয়েছে, তাতে পশতো, দক্ষিণি প্রভৃতি তালের উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যদিকে বিশ শতকের সূচনায় পূর্ববঙ্গ পর্বের কবিগানে যেসব তাল ব্যবহৃত হতো, সেগুলো হলো– দাদরা, কাহারবা, ঝাপতাল, সুরফাঁক, গড়খেমটা,একতালা, কাওয়ালি, পঞ্চম সোয়ারি, দশকোশী, তেওট, রূপক প্রভৃতি।'[৪] শুরুতে কবিগানের ভাষা প্রয়োগে খিস্তি-খেউড় পরিবেশিত হলেও পরবর্তীতে তা সহজ সরল এবং সুধী সমাজে পরিবেশনের উপযোগী হয়ে ওঠার ফলে বিভিন্ন দেব দেবতার উদাহরণ সহযোগে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। বর্তমানে গুরু শিষ্য, নারী পুরুষ, প্রেম ও সমাজ সচেতন মূলক অনেক পালা গান হয়ে থাকে। পূর্বে যা শুধু পুরাণের দেব-দেবীদের নিয়ে রচিত হতো। বর্তমানে রাগ মেনে এ গান করা হয় না কারণ সাধারণ শ্রোতা সহজ-সরল কথা ও সুরের প্রয়োগকে বেশি গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। যশোর অঞ্চলে বর্তমান সময়ে কবিগানে রাগ-রাগিণীর ব্যবহার তেমন দেখা যায় না। যশোর জেলার বর্তমান সময়ের খুব জনপ্রিয় কবিয়াল নিশিকান্ত বৈরাগীর বক্তব্যে জানা যায়, "শ্রোতাদের মাঝে গান উপস্থাপনে কোনো রকম জটিলতাপূর্ণ সুর তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে ভেবে কবিয়লরা রাগের প্রতি তেমন অনুকম্পা নয়।"

এবারে জারিগানের সুরবৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা। 'কোনো বিষয় প্রচার বা জাহির করাকে সাধারণত জাহিরী বা জারি বলা হয়। আরবি 'জারি' শব্দের অর্থ প্রচার। পল্লী সাধারণের মধ্যে ধর্মীয় বাণী, নীতি-নৈতিকতা প্রচারের জন্য জারিগানের আবির্ভাব হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। জারিগানের বিষয়াবলীর মধ্যে রয়েছে মুসলমানদের বীরত্বের কাহিনী, শরীয়ত-মারফত, হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতি।'[৫] ফলে সকল ধর্মাবলম্বীদের নিকট জারিগানের আবেদন রয়েছে। এই গানের প্রধান গায়ককে বলা হয় বয়াতি। জারিগানের সুরের মধ্যে কোনো

বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় না। মূলত সুরের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণনা করাই এর মূল উদ্দেশ্য। বিশেষ ভাব প্রয়োগের মাধ্যমে জারিগানে রসের সঞ্চার করা হয়। তবে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, এ গানে বিলাবল রাগ এবং ইমন রাগের সাদৃশ্য মেলে। গানের চলনে সা রা গা মা পা ধা না কখনো কখনো না্ রা গা ক্ষা পা, রা গা রা, না্ ধা্ না্ রা সা স্বরের প্রয়োগ রয়েছে। তবে নির্দিষ্ট কোনো রাগ এ গানে ব্যবহৃত হয় না। যশোর অঞ্চলের একটি জারিগানের বন্দনা—

'সুজলা-সুফলা এদেশ বিশ্বপতির দান
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বাংলার জয় নিশান।
ফলে, জলে ভরা দেশ, সুখের তার নাইকো শেষ
এমন দেশটি পরমেশ্বর করিয়াছেন দান
এক ফোটাতে হইল সৃজন হিন্দু-মুসলমান॥'[৬]

উল্লিখিত গানে শুদ্ধ মধ্যম আবার কড়ি মধ্যমের ব্যবহার দেখা যায় অর্থাৎ কখনো ইমন রাগে কখনো বিলাবলের সুরে গানের পদগুলি পরিবেশিত হয়। লোকসংগীত যে মিশ্ররাগে পরিবেশিত হয় এখানে তা প্রতীয়মান। তবে নির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় জারিগানে নিম্ন গ্রামে অর্থাৎ উদারাতে কোনো সুরের ব্যবহার হয় না। একটি ঘটনার বর্ণনা করা হয় সুরে যা সাধারণের মাঝে বর্তমান সমাজের, কখনো কখনো পুরাকালের কাহিনী উপস্থাপিত হয়ে থাকে। উচ্চস্বরে পরিবেশন না করলে শ্রোতাদের মাঝে প্রচারের বিষয়টি লক্ষণীয় বা দৃষ্টিগোচর হয় না। সেজন্য এ গান সব সময় মধ্যম গ্রাম থেকে উচ্চ গ্রামে গাওয়া হয়ে থাকে। রামযাত্রা বা রামায়ণ গানের সাথে এর সাদৃশ্য বর্তমান বলে অনেকে মনে করেন।

'লোকায়ত সংস্কৃতির বিশিষ্ট ধারা বাউল সঙ্গীত। বাঙ্গালীর নিজস্ব সংস্কৃতি রূপের যে উজ্জীবন ও বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তারই বিশেষ প্রকাশ ঘটেছে এই বাউল সংগীতে। বাংলার উদারমুক্ত আকাশ-মাটি-নদীর সঙ্গে বাউলের সুর একাত্ম হয়ে মিশে আছে।'[৭] করুণ রসের উদ্রেক এ গানে প্রবল। বাউলের অজান্তে কখনো শ্যামা সঙ্গীত, কখনো কীর্তন, আবার কখনো ভাটিয়ালি সুরের প্রকাশ হয়েছে। তবে প্রকৃতিগত ভাবে সুরগুলি ভাবের উপর নির্ভর করে গাওয়া হয়ে থাকে। কীর্তন গান বিভিন্ন রাগ অনুসরণে গাওয়া হয়। আর কীর্তনের সুরের প্রভাব বাউল গানে প্রবল। কোনো বাউল যদি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে উপজীব্য করে কীর্তনের সুরকে অনুসরণ করে তার গানের সুরারোপ করেন এক্ষেত্রে তিনি জেনে বা না জেনে ঐ সব রাগের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ—

'ওগো বৃন্দে ললিতে
আমি কৃষ্ণ হারা হলেম জগতে।'

উল্লিখিত লালনের পদটি কীর্তনের সুরে গাওয়া হয়ে থাকে। ললিত রাগের প্রভাব এ গানের প্রাণ। এছাড়াও জানা-অজানায় রাগের ব্যবহার রয়েছে বাউল গানে।

'আমি অপার হয়ে বসে আছি,

ওহে দয়াময় পারে লয়ে যাও আমায়।'

এই গানের অন্তরাতে সুরের পরিবর্তন হয়ে খাম্বাজ রাগের উপর গাওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বলা যায়, মিশ্ররাগের ব্যবহারও পরিলক্ষিত হয় বাউল গানে। সা রা গা মা পা ধা না এমন শুদ্ধ স্বরের ব্যবহার যেমন রয়েছে, তেমনি তীব্র মধ্যমসহ কোমল স্বরেরও প্রয়োগ রয়েছে। ঋা জ্ঞা ক্ষা দা ণা এসকল কোমল ও তীব্র মধ্যম অর্থাৎ ক্ষা এর ব্যবহার বাউল সুরকে করুণ রসের মধ্য দিয়ে মোহনীয় করে তোলে। লালন সাঁই এর আর একটি পদ—

'কই হলো মোর মাছ ধরা

সারাকাল ধাপ ঠেলিয়ে হলাম কেবল বল হারা।'

উক্ত গানে শুদ্ধ মধ্যম (মা) এর ব্যবহারের পাশাপাশি একই সাথে তীব্র বা কড়ি মধ্যম (ক্ষা) ব্যবহৃত হয়েছে। যা ইমন কল্যান রাগের চলন স্বরূপ। ভাটিয়ালি সুরের প্রভাব এ গানে বিদ্যমান। গানের চলন উচ্চ গ্রাম থেকে নিম্ন গ্রামে আবার কখনো কখনো নিম্ন গ্রাম থেকে উচ্চ গ্রামে মীড় আকারে সুর উঠা-নামা করতে থাকে যা নদীর ঢেউয়ের সাথে তুলনীয়। বাউল গান চার অন্তরার হয়ে থাকে বিধায় সঞ্চারীর অংশটা বেশিরভাগ সময় উদারা অর্থাৎ নিম্ন গ্রামে পরিলক্ষিত হয়। যশোর অঞ্চলের বাউল গান লালনের ভাবধারায় প্রভাবিত। যেমন পাঞ্জু শাহ্'র একটি গান—

'শ্রীচরণ পাবো বলে ভব কূলে

ডাকি দীন হীন কাঙালে

সৃষ্টি করে আত্ম রসে কালের বসে

কোন বা দোষে ফেলাইলে।'

লালন শিষ্য পাঞ্জু গুরুর চরণ পাবার আশায় ব্যাকুল হয়েছেন এ গানে তারই বহিঃপ্রকাশ। কালা চাঁন ফকির গেয়েছেন —

'যার আশায় চেয়ে রইলা বসে

কথায় কথায় চলে যাই

নিষ্ঠা গুরুর স্বরূপ সাধন

কেমন করে হয়।'

উল্লিখিত গানের পদ দু'টির সুর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রাগ কাফির চলনের সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে। কাফি রাগের চলনে ব্যবহৃত স্বর যথা: সা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা র্সা। উদাহরণ স্বরূপ একটি গানের স্বরলিপির অংশ বিশেষ নিম্নে উল্লেখ করছি—

II র্সা র্সা র্সা । া র্সা র্রা I ণা র্সা ণা । ধা পা -া I
যার আ শা য় চে য়ে রই লা ম ব সে ০

I -া -া মা । পা ধা ণা I ধা -পা ধা । মা -া -া I
০ ০ আ শায় আ শায় চ ০ লে যা ০ ০

I -গা -রা -জ্ঞা । -রা -সা া I -া -া -া । -া -া -া I
০ ০ ০ ০ ০ য় ০ ০ ০ ০ ০ ০

I সা রা ণ্া । ণ্া সা সা I া রা রা । -া -া া I
নিষ্ ঠা গু রু স্ব রূ প সা ধ ০ ০ ন

I মা মগা রা। -া জ্ঞা রা I সা -া া । -া -া -া II
কে ম০ ন ০ ক রে হ ০ য় ০ ০ ০

বাণী এবং সুর বাউল গানে প্রাণের সঞ্চার সৃষ্টি করেছে এ কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। কোথাও কোথাও মিশ্ররাগ ব্যবহারের ফলে করুণ রসের সৃষ্টি হয়েছে যা শ্রোতাকে অশ্রুসিক্ত করে বাউল দর্শনের প্রতি ব্যাকুল করে তুলেছে।

জাগগানকে মেয়েলী গীত হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। জাগগান ব্রত পার্বনের গান। প্রত্যেকটি লোকগানের উৎপত্তিগত রহস্য উৎসব কেন্দ্রিক হওয়ায় গ্রাম্য ব্রত কথার গানও এখানে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ গানের সুরে কোনোরূপ রাগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। জাগগান সারা রাত জেগে গ্রামের নারীরা গেয়ে থাকে যা কখনো কোনো রাগের কথা চিন্তা করে গাওয়া হয়নি। কখনো সুরে কখনো আবার সুর ছাড়াও কবিতার মতো পরিবেশিত হতে শোনা যায়। যশোর অঞ্চলের লোকগানে ভাটিয়ালি সুরের প্রভাব থাকায় এ গানের সুরের চলনে উঠা-নামা একটু বেশি দেখা যায়। কিছুটা জারিগানের প্রভাব রয়েছে গানগুলোতে। কখনো কখনো ধুয়ো গানের মত করে গাইতে শোনা যায় জাগগান। যেমন—

'স্বর্গের থেকে আইলো রে চাষার এক ছেলে
সোনার কোদাল কাঁধে লয়ে
আমার হরি ঠাকুরের আসন খানা দাওনা চাঁছে-চুঁছে
সকাল বেলায় দুয়ার ঝাঁট, সন্ধ্যা বেলায় বাতি॥'[৮]

বাণী প্রধান হওয়ায় এ গানের সুরে কোনো বৈচিত্র্যতা নেই। এর মধ্যে কোনো ভিন্নতাও দেখা যায় না। একজন গানের পদটি গাওয়ার পর অন্যরা সাথে সাথে ধুয়ো ধরে গাইতে থাকে। গানের সুরে ভিন্নতা কম থাকায় এ গানের রসবোধ কম। সাধারণত শ্রোতাকে তেমন আকর্ষণ করেনা। গানগুলো মধ্য ও উচ্চ গ্রামে গাইতে শোনা যায়। সুর মীড়ের মত গড়িয়ে চলে। জাগগানে খেউড়, সংযাত্রা, ভাবরসাত্মক বাণীর প্রয়োগ দেখা যায়। কখনো কখনো অর্থহীন বিষয়কে কেন্দ্র করেও নাটিকা উপস্থাপন করা হয়। আনন্দ দানই যার মূল লক্ষ্য। গ্রামে অধিকাংশ সময় ভোর বেলাতে প্রভাতী কীর্তন শুনতে পাওয়া যায়, যা ভৈরব রাগ অবলম্বনে গীত। আর এ কীর্তনের সুরকে অবলম্বন করে জাগগানের রাত ব্যাপী চলা আসরের সমাপ্তি পর্ব গাইতে শোনা যায়। যেমন—

তালঃ কাহারবা

'ভোর হলো রজনী ওঠো নীল মণি

চান মুখে মা বলো, বলো শুনি॥'

II পা -া পা মা । জ্ঞা -া জ্ঞা মা I ঋা জ্ঞা জ্ঞা মা । ঋা জ্ঞা সা রা I
ভো র হ ল র জ নী ০ উ ঠ নী ল ম ০ ণি ০

I জ্ঞা দা দা া । দা -া দা ণা I পা া জ্ঞা মা । দা -া ণদা পা II
চা ন মু খে মা ০ ব লো ব ০ লো শু নি ০ ০০ ০

বাংলাদেশে হালই গানের তেমন প্রচলন দেখা যায় না। যশোর জেলার খুব জনপ্রিয় গান হালই (হালুই আঞ্চলিক শব্দ) গান। নবান্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে এই গান পরিবেশিত হয়। গ্রামের কৃষক শ্রেণি এ গানের স্রষ্টা হওয়ায় রাগের ব্যবহার এখানে গৌণ। জারি বা ধুয়া গানের মতো এ গান গাওয়া হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে পুঁথি পাঠের মত সুরে পরিবেশন করতে দেখা যায়। মূলত গানের বাণী একজন সুরে সুরে পাঠ করে আর অন্যরা তা ধুয়া ধরে গানটিকে দীর্ঘায়িত করে। হালই গান পরিবেশনের সময় সহযোগী শিল্পীরা গানের পদ শেষে গো বা হালই ধ্বনি উচ্চগ্রামে সমস্বরে উচ্চারণ করে। এ ছাড়া এ গানের সুরে কোনো বৈচিত্র্যতা দেখা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ—

শুন সবে ভক্তি ভাবে করি নিবেদন (গো)

কৃষ্ণলীলার কথা কিছু শুন দিয়া মন॥ (গো)

[সূত্রঃ সং. গান–৬৫]

নবান্ন উৎসব পালন করার জন্য গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গেয়ে মাঙ্গন সংগ্রহ শেষে বাস্তু দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ (অন্ন) রন্ধন করে শেষে সকলে মিলে একত্রিত হয়ে প্রসাদ গ্রহণ এবং আত্মিক আনন্দ উপলব্ধি

করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। উৎসব যেখানে মূখ্য সেখানে রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে রাগের অনুসন্ধান করলে সহজ-সরল সুরের চলনে বিলাবল রাগের স্বর পাওয়া যায়। যেমন—

তালঃ কাহারবা

স্বরলিপি:

II গা -া পা -া । পা ধা না র্সা I ধর্সা না ধা পা । পা গা গা মা I
এ ০ সো ০ কৃ ষ্ ণ ০ ব ০ সো ০ কা ০ ছে ০

I রমা গা রা সা । রা -া গা রা I মা -া গা -া । পা ধা পা মা I
০ ০ কও্ সে জ ন্ মে র ক ০ থা ০ গো ০ ০ ০

I গা রা সা সা । রা -া গা রা I মা -া গা -া । -া -া -া -া II
০ ০ কও সে জ ন্ মে র ক ০ থা ০ ০ ০ ০ ০

[সূত্রঃ সং. গান–৭০]

যশোর জেলার লোকসংগীতের ধারায় যাত্রাগান একটি অমূল্য সম্পদ। অভিনয় শৈলীর মাধ্যমে সংলাপ সহযোগে যাত্রাগান উপস্থাপন করা হয় যা দর্শক চিত্তে এক অভাবনীয় রসের সৃষ্টি করে থাকে। পূর্বে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং গীতগোবিন্দে রাগ-তালাদির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। 'যাত্রার ক্রমবিবর্তনের ধারায় পাওয়া যাচ্ছে কৃষ্ণনগর রাজ সভার পণ্ডিত ভারতচন্দ্র রচিত 'চণ্ডীনাটক বা চণ্ডীযাত্রা'। ভারতচন্দ্র যেমন চণ্ডীযাত্রা রচনা করেছেন, তেমনই 'বিদ্যাসুন্দর'ও রচনা করেছেন। পরবর্তীতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রাপালায় বহু রচয়িতা নতুন গান যুক্ত করেছেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'স্বপ্ন বিলাস' পালার একটি জনপ্রিয় গান এখনও শোনা যায়—

"শোন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে॥"

গানটি খাম্বাজ রাগে ও একতাল নিবদ্ধ। নীল কণ্ঠের এখনও বহুগান গীত হয়ে থাকে। যাত্রাগুলিতে নানা রকম গানের সঙ্গে আড়খেমটা নামক একটি রীতি প্রচলিত ছিল'[৯] তৎকালীন সময়ে।

বর্তমান সময়ে যশোর অঞ্চলের যাত্রাপালাতে সেই উচ্চগ্রামের গান আর তেমন শোনা যায় না। তবে যাত্রাগানের মূল বৈশিষ্ট্য মধ্যম গ্রাম থেকে তাঁর সপ্তকে অতি উচ্চ স্বরে সংলাপ বলা এবং উচ্চ স্বরে গান গাওয়া। কেননা অতীতে শব্দযন্ত্রের কোনরূপ ব্যবহার না থাকায় উচ্চস্বরে সংলাপ এবং গান পরিবেশিত হতো। তিন-চার ঘন্টার যাত্রাপালা যখন থেকে পরিবেশিত হতে শুরু করে তখন থেকে সংগীতের চেয়ে সংলাপের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। বর্তমানে বিনোদনের লক্ষ্যে যাত্রাগান উপস্থাপিত হতে শুরু হওয়ায় এর মধ্যে কোনো আবেগ বা

ভাবাবেগের স্থান নেই। চটুল এবং আসর জমানো গানের মধ্য দিয়ে কুরুচিপূর্ণ নৃত্যের সহযোগে দর্শক শ্রোতার মন আকর্ষণের চেষ্টা চলছে সর্বত্র। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলেছিলেন —‘এ গানে নোক শিক্ষে হয়।’ আজ আর সমাজের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা নিয়ে যাত্রাগান হয় না। যে সকল গানে মানুষের আত্মোপলব্ধি ঘটতো সে সকল বিবেক গান আজ আর নেই। এখন শুধু রঙমাখানো চটুল গানের প্রসার যার মধ্যে রাগ-রাগিণীর কোনোরূপ স্থান নেই। যশোর অঞ্চলের যাত্রাগান সংলাপ নির্ভর হওয়ায় এখানে সুরের প্রয়োগ বা রাগ-রাগিণীর ব্যবহার দেখা যায় না। যা আছে তা বিবেক গানে রামপ্রসাদী সুরে কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। একটি বিবেক গানের উল্লেখ করা হলো যা রামপ্রসাদ যাত্রাপালায় বিবেকের কণ্ঠে গীত—

‘আমায় দে মা তবিলদারী
আমি নমক হারাম নই শঙ্করী॥’

‘বাগদত্তা’ যাত্রাপালায় গৌরাঙ্গ আদিত্য বিবেক কণ্ঠে গেয়েছেন —

‘মন্দিরে দেবতা নাই অন্তরে খোঁজ তারে
প্রাণের দেবতা মনেরই দুয়ারে
ফিরে আসে বারে বারে॥
পাষাণে কি পাবে ভগবান
মানুষের প্রেমে সে যে মহীয়ান
হৃদয় সিন্ধু মহীত করিয়া
ফিরে আসে বারে বারে॥’

পূর্বেও বলা হয়েছে সংলাপ প্রধান হওয়ায় যশোর অঞ্চলের যাত্রাগানে কোনোরূপ রাগের ব্যবহার হয়না। যাত্রাগানের মধ্য দিয়ে যশোর জেলার লোকসংগীতের সুরবৈশিষ্ট্য আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, এই অঞ্চলের লোকগান সরাসরি রাগ-রাগিণী নির্ভর নয়। যা কিছু অল্পবিস্তর রাগের আধিক্য ও প্রভাব দৃষ্ট হয় তা পরোক্ষ আশ্রয়ে সুরারোপিত। প্রকৃতিগত ভাবে সাধারণ মানুষের চিত্তে যে সুরের উদ্রেক তৈরি হয় তা থেকে এ অঞ্চলের লোকগানের জন্ম। তবে নদীমাতৃকার ফলে ভাটিয়ালি সুর সর্বাগ্রে প্রনিধাণযোগ্য এবং প্রকৃতির সুরই এসকল গানের মূল।

তথ্যনির্দেশ

১. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *লোকসাহিত্য পত্রিকা (প্রবন্ধ: ভাটিয়ালির প্রাচীনত্ব)*, কুষ্টিয়া, প্রকাশকাল-১৯৮৭। পৃ.– ৭

২. সাক্ষাৎকার: আনন্দ মোহন দত্ত, পারখাজুরা, মনিরামপুর, যশোর।

৩. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান ইতিহাস ও রূপান্তর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মে, ২০১১। পৃ.– ২০৭

৪. প্রাগুক্ত, পৃ.– ২০৮

৫. শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: যশোর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ২০১৪। পৃ.– ১৪৪

৬. সাক্ষাৎকার: মনিরুদ্দিন মোড়ল, মনিরামপুর, যশোর।

৭. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *লোক সংগীত*, প্যাপিরাস প্রকাশন, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৯। পৃ.– ৩২

৮. সাক্ষাৎকার: চাঁপা রানী দে, পারখাজুরা, মনিরামপুর, যশোর।

৯. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ, ১৯৯৩। পৃ.– ৫৫

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

যশোর জেলার লোকসংগীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র

প্রত্যেকটি দেশের সংগীতের মধ্যে বাদ্যযন্ত্রের একটি ভূমিকা রয়েছে যা আবহমান বাংলাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বাদ্যযন্ত্র সংগীতের ক্ষেত্রে রস ও নান্দনিকতার সৃষ্টি করে। সংগীতের প্রাণ হিসেবে তালকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। এ উপলক্ষে একটি লোকজ প্রবাদ লক্ষ্য করা যায়– 'জর্দা ছাড়া পান আর বাদ্যি ছাড়া গান'। অর্থাৎ যারা নিয়মিত পানের রস আস্বাদন করে থাকেন তাদের কাছে জর্দা ছাড়া পান খাওয়াটা যেন শুধুই মূল্যহীন, ঠিক তেমনই ছন্দ সৃষ্টির জন্য বাদ্য ছাড়া সংগীত যেন একটি সৌন্দর্য হীন সুরে আবৃত্তি করা কোনো কবিতা মনে হয়। মানুষকে বিনোদন দেওয়ার জন্য সংগীত যদি মূল বিষয় হয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রে বাদ্য ছাড়া সংগীত প্রাণহীন হয়ে পড়ে। যশোর জেলার লোকসংগীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র গুলোকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই এ কারণে যে, আমাদের লোক সংগীতের ভাণ্ডার যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি তার সহযোগে যে বাদ্যযন্ত্রগুলো গানে প্রাণ সৃষ্টি করে তার বিশেষত্ব রয়েছে বাংলা গানের ক্ষেত্রে। যশোর জেলার লোকগান গুলোতে বিভিন্ন সময় এসকল বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। নিম্নে সে সকল বাদ্যযন্ত্রের বিবরণ উল্লেখ করা হলো—

দোতারা

বাংলা লোকসংগীতের প্রাণ হিসেবে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে দোতারা অন্যতম। এটি তত শ্রেণির লোকবাদ্যযন্ত্র। এ দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করেছে এই বাদ্যযন্ত্রটি। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার সাধারণ মানুষ এ বাদ্যযন্ত্রের সুরে অভ্যস্ত। 'রাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর 'বাংলা সঙ্গীত' নামক গ্রন্থে বলেন, পদ্মপুরাণেও দোতারার উল্লেখ আছে। ড. আহমদ শরীফ এর মতে, 'প্রচীন বাংলায় এবং মধ্যযুগে বসন্ত রাগের সাথে তার সঙ্গত হিসেবে যেসব বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় তার মধ্যে দোতারা অন্যতম।'[১] এই বাদ্যযন্ত্রটির বিশেষ গুণ হলো একই সাথে সুর সৃষ্টির পাশাপাশি তাল ও লয়ের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে এবং শ্রোতাকে অনায়াসে মোহিত করে।

চিত্রঃ দোতারা

গঠন প্রণালীঃ দোতারার তত শ্রেণির লোক বাদ্যযন্ত্র। বাংলা সকল লোকগানেই এর ব্যবহার প্রায়শই লক্ষ্যণীয়। দোতারার মূল কাঠামোটি তৈরি হয় সাধারণত কাঁঠাল অথবা নিম কাঠ দিয়ে। এর উচ্চতা সাধারণত ২ বা ২.৫ হাত এর মতো হয়ে থাকে। নীচের অংশে কিছুটা খুঁড়ে ফেলে ধ্বনি কুম্ভের গহ্বর করে সেখানে চামড়ার ছাউনি করা হয়ে থাকে যার উপর দিয়ে চারটি তার বসানো হয় সমান দূরত্বে। এর উপর টংকার দিলে সুর সৃষ্টি হয়। চামড়ার ছাউনির উপরি ভাগে একটি ছোটো কাঠের টুকরা বসানো হয় যাকে ব্রীজ বা সওয়ারি বলা হয়। মাথার অংশে একটি কাঠ অথবা তামার পাত বসানো হয় যাকে সরস্বতী বলা হয়। দোতারার মাথার অংশে চারটি বা পাঁচটি গোলাকৃতির কাঠের বয়লা পেঁচিয়ে লাগানো থাকে যাকে কান বলে। এর সাথে তারগুলো টানটান করে বাঁধা হয়। শক্ত ও টান করে বাঁধার ফলে তারে আঘাত লাগার সাথেই বেজে ওঠে এবং সুরের আন্দোলিত রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। দোতারা নাম হওয়া সত্ত্বেও এখানে চারটি তারের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তারগুলোর মধ্যে মাঝের দু'টি তার একই সুরে অর্থাৎ ষড়জ বা সা সুরে বাঁধা হয় যাকে সুরের তার বলে। নীচের মোটা তারটি উদারার পঞ্চম বা পা এবং সব শেষে ঝিলের তারটি অর্থাৎ ধাতব নির্মিত তারটি মধ্যম বা মা সুরে বাঁধা হয়ে থাকে। যেসকল দোতারায় পাঁচটি তার ব্যবহৃত হয় সেখানে একটি তার সুরের জন্য বিশেষ করে রে সুরে বাঁধা হয়ে থাকে। বাদ্যযন্ত্রটি বাজানোর সময় একই সুরে বাঁধা সা স্বরটি (মাঝের দু'টি তার) থেকে গান বাজানো হয় এবং নীচের তারটিতে সুর ধরে রাখা এবং ছন্দ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কখনো কখনো মা স্বরটিকে সা ধরেও গান বাজানো হয়। শিল্পীর সুরকে সরাসরি অনুসরণ করে বাজানো হয় বলে একে অনুগামী বাদ্যযন্ত্রও বলা হয়ে থাকে। লোক আঙ্গিকের গান হলে সকল গীতিকবির গানে এ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা যায়। বিদেশি বাদ্যযন্ত্র যেমন গীটারের মতো এর উপরিভাগে কোনো ফ্রেড্ থাকেনা বা স্বর ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট কোনো চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। শিল্পী বা বাদক নিজেই তার সুরের স্থান খুব সাবধানতা এবং দক্ষতার সাথে সৃষ্টি করে থাকে। সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য বাদ্যযন্ত্রটির মাথার অংশে লোকজ ধারার স্মৃতিকে সামনে রেখে একটি পাখি রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বাঁশি

বাংলায় বাঁশি শব্দটি উল্লেখ করলেই অলস দুপুরে মাঠের কোণে বট গাছের ছায়ায় বসে রাখাল ছেলের মেঠো সুরে বাজানো গানের সুর ভেসে আসা একটি কল্পচিত্রের কথা আমাদের সকলের মনে আসে। মুরলি, বেনু, বাঁশি যে কোনো নামে অভিহিত করলেই তা লোকজসংস্কৃতির একটি অন্যতম বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বুঝতে কারো বাকি থাকে না। বাংলা সাহিত্য থেকে শুরু করে সব ধরনের রচনায় এর স্থান উল্লেখযোগ্য। পৌরাণিক কাহিনীতেও এর কথা সুন্দরভাবে উল্লেখ করা আছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের যে চিত্র আমরা দেখতে পায় সেখানেও বাঁশির বিশেষ

আকর্ষণ রয়েছে। লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারার গানে যেমন: বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, কীর্তন, সারি, এমন কি যাত্রা, অষ্টক এবং রামায়ণ গানে বাঁশির ব্যবহার রয়েছে। রয়েছে পঞ্চগীতি কবির গানেও। বাংলা বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে এর আকর্ষণ যেন এক অন্য রকম অনুভুতির বহিঃপ্রকাশ। বাঁশি নিয়ে রয়েছে নানা ধরনের গান ——

'তরলা বাঁশের বাঁশি, ছিদ্র গোটা ছয়
বাঁশি কতই কথা কয়॥'

'চণ্ডীদাস এক পদে বলেছেন—

বিষম বাঁশির কথা কহিলো না হয়
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥'[২]

নিশুতি রাতে বাঁশির সুরে মন মাতিয়ে নারীর উদাসী হবার কথাও অনেক গীতি কবিতায় আমরা দেখতে পাই। যেমন:

'রাতদুপুরে বাজায় বাঁশি কদমের ডালে
আমি নারী হয় উতলা পতীধন মোর ঘরে॥'

লোকসংগীতে বাঁশির সুর প্রয়োগের ফলে সংগীতের মাধুর্যতা বেড়ে যায় এবং শ্রোতাদের অতি দ্রুততার সাথে গানটি আকর্ষণ করে সেজন্য এ বাদ্যযন্ত্রটি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাঁশির প্রকারভেদ লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাংলা লোকজ ধারায় বিভিন্ন প্রকারের বাঁশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন: আড় বাঁশি, সরল বাঁশি, টিপরা বাঁশি, মুখা বাঁশি প্রভৃতি।

চিত্র: বাঁশি

গঠন প্রণালী : মুরলী এক জাতীয় বাঁশ যে বাঁশের সাহায্যে এ বাঁশি তৈরি করা হয়ে থাকে। এ বাঁশের বিশেষত্ব হলো বাঁশের ভিতরের অংশ ফাঁপা। বলাই বাহুল্য যে, এই মুরলি বাঁশ ছাড়া বাঁশি তৈরি করা অসম্ভব। বাঁশিতে মোট সাতটি ছিদ্র থাকে। মাথার অংশের কাছাকাছি একটি ছিদ্র করা হয়, যেখান থেকে ফুঁ-কারের মাধ্যমে ভিতরে বাতাস প্রবাহিত করে বাঁশি বাজানো হয়। পরপর সম দূরত্বে ছয়টি ছিদ্র করা হয়ে থাকে যার উপর হাতের আঙ্গুল

উঠা-নামার মাধ্যমে সুরের ব্যঞ্জনা তৈরি করে। তবে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ ছিদ্র ছয়টি স্কেলের স্বর অনুযায়ী ছোটো বড় হয়ে থাকে। সবশেষে নীচের দিকে আরও একটি ছোটো ছিদ্র করা হয়ে থাকে যা শুদ্ধ স্বরের সাথে কোমল স্বরের সুর প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয়। যতদূর জানা যায় বাঁশি সম্রাট হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া এ প্রকার বাঁশির স্রষ্টা। অর্থাৎ বাঁশিতে সর্বমোট সাতটি ছিদ্রের জায়গায় আটটি ছিদ্র তিনিই উদ্ভাবন করেছেন। বর্তমান সময়ে বাঁশিতে রাগ সংগীতের সুর বাজানোর ফলে এই ছোটো ছিদ্রটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এ বাদ্যযন্ত্রটিকে শুষির বাদ্যযন্ত্র বলা হয়ে থাকে। ফুঁ-কার দিয়ে যে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় তাকে শুষির বাদ্যযন্ত্র বলে।

বাংলা ঢোল

অতি প্রাচীনকাল থেকে বাংলা সংগীতে ঢোলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটি লোকগানে ঢোল ব্যবহারের ফলে গানটি হয়ে ওঠে সমৃদ্ধ। ঢোলকে এক প্রকার আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র বলা হয়ে থাকে। একটি গানের বিশেষত্ব ফুটে ওঠে এ বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহারের ফলে। কাঠ দ্বারা নির্মিত এ বাদ্যযন্ত্রটির ভিতরটা ফাঁপা থাকে। অর্থাৎ একটি খোদাই করা কাঠের খোলের দু'পাশে চামড়ার ছাউনি করা থাকে যার একপাশের চামড়া মোটা (পুরু) থাকে। দু'হাতের সহযোগে ঢোল বাজানো হয়। বিভিন্ন মাঙ্গলিক কাজে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কবি, জারি, সারি, মুর্শিদি, মারফতি, বাউলসহ বিভিন্ন গানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর বাদককে ঢুলি বলা হয়।

চিত্রঃ বাংলা ঢোল

গঠন প্রণালী : বাংলা ঢোল তৈরিতে প্রথমে 'চার হাত বেড় ও দেড় হাত চওড়া আম কাঠের একটি খণ্ড এক মাস পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। এরপর খণ্ডটি পানি থেকে উঠিয়ে চতুর্দিকে এক ইঞ্চি পরিমাণ পুরু রেখে মাঝ অংশ খুঁড়ে টেকসই করার জন্য পনেরো দিন গো-চেনাইতে ভিজিয়ে রাখা হয়। অতঃপর রসুন সরিষা বা তিশির তেল

এবং শুকনা মরিচ বাটা ইত্যাদি একত্রে লাগিয়ে কাঠের খণ্ডটিকে রোদে শুকানো হয়। এই ফাঁপা ও স্ফীত কাঠ খণ্ডের বামদিকে পরপর গরুর চামড়ার দুইটি পর্দার ছাউনি থাকে। ডান দিকে থাকে এক চামড়ায় মোড়ানো, ঢোলের দুইপাশের বেড়ি দুইটি। চামড়ার দোয়ালী ষোলটি, পিতলের আংটা ২০টি।'[৩] ঢোল বাজানোর জন্য কামিনী ফুলের ডাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক হাতে লাঠি ধরে এবং অন্য হাতের দু'টি আঙ্গুলে বাঁশের চটার চিকন দু'টি কাঠি বেঁধে ঢোলে তাল তোলা হয়।

ঢাক

ঢাক বাংলার অন্যতম আর একটি বাদ্যযন্ত্র। বিভিন্ন উৎসবে ঢাক ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে পূজা-পার্বণে বেশি ব্যবহার হতে দেখা যায়। ঢাক ঢোলের মতই একই গোত্রের বাদ্যযন্ত্র। তবে এর শব্দ বেশি এবং বাদন কৌশলও ভিন্ন হওয়ায় সবক্ষেত্রে এর ব্যবহার দেখা যায় না। ঢাক বৃহদাকার আনদ্ধ লোক বাদ্যযন্ত্র। অনেক সময় সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পাখির পালক দিয়ে ঢাক সুসজ্জিত করা হয়। 'ঢাক, জয়ঢাক, বীরঢাক ও বীরকালী প্রভৃতি নানা রকম বাদ্য বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে বহুল প্রচলিত।'[৪] চৈত্র মাসের চড়ক এবং দুর্গা, কালী ও কাত্তায়ণী পূজায় এর ব্যবহার বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

চিত্রঃ ঢাক

গঠন প্রণালী : 'একটি বৃহদাকার কাঠের খোলকে দু'পাশে চামড়ার ছাউনি দিয়ে ঢেকে ঢাক তৈরি করা হয়। এর দু'দিকে দু'টো মুখ থাকে।'[৫] একটি মুখের ব্যাস দেড় থেকে পৌনে দু'ফুট হয়ে থাকে। ঢোলের মতো এরও এক দিকে মোটা চামড়া অপর দিকে পাতলা চামড়া দিয়ে ছাউনি করা হয়। পুরু চামড়ার ছাউনির দিকে বাঁশের পাতলা চটি ও বেতের সরু কাঠি দ্বারা বাজানো হয়ে থাকে। বেশির ভাগ সময় বাদক ঢাক কাঁধের এক দিকে ঝুলিয়ে নৃত্য সহযোগে বাজিয়ে থাকেন। যা দর্শক মনে আনন্দের সঞ্চার ঘটায়।

একতারা

বাউল, ভাটিয়ালি গানের সুরের সাথে এই বাদ্যযন্ত্রটির একটি যোগসূত্র রয়েছে। অতি প্রাচীনকালে এর উদ্ভব বলে মনে করেন বিভিন্ন গবেষকগণ। একতারাকে তত শ্রেণির বাদ্যযন্ত্র বলা হয়। বাউল গানের একান্ত সহযোগী হিসেবে ধরা হয় একতারাকে। একটি তারের সন্নিবেশ বলে একে একতারা বলে। সংগীত পরিবেশনের সময় শিল্পী ষড়জ (সা) অথবা পঞ্চমে (পা) আবার কখনো গানের গ্রহস্বরে সুর বেঁধে এর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে গান করে থাকেন। লোকসংগীতের প্রাণ একতারাকে অন্যতম লোকবাদ্যযন্ত্র হিসেবে ধরা হয়।

চিত্রঃ একতারা

গঠন প্রণালী : একটি লাউয়ের বস ৫ ইঞ্চি পরিমান কেটে ৭ থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত পানি দিয়ে ভিজিয়ে ঘরের এক কোণে রাখা হয়। এরপর ভিতরের নরম অংশটি নষ্ট হলে ভাল করে ধুয়ে ফেলে রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে বসের নিচের অংশ কেটে ফেলে খোল করা হয়। একটি চিকন বাঁশের গিঁটসহ সুন্দর করে ছয়/সাত ইঞ্চি পরিমাণ রেখে তাকে গিঁটের দু'পাশ থেকে কেটে চিমটা আকৃতির তৈরি করা হয়। এবারে লাউয়ের খোল অংশটার দু'দিকে শক্ত করে বাঁশের চিমটাকে তার দিয়ে সংযুক্ত করা হয়। লাউয়ের পেছনের দিকে চামড়া দ্বারা ছাউনি করা হয়। এবারে একটি তার ছাউনি করা স্থানে ছিদ্র করে কাঠির সাথে (যাকে সওয়ারি বলা হয়) সংযুক্ত করে বসিয়ে বাঁশের চিমটার যে স্থানে গিঁট আছে তার একটু নিচে ছিদ্র করে কাঠের বয়লা বা কান বসানো এর সাথে সংযুক্ত করা হয়। পরিমাণ মত কানটা পেঁচিয়ে টানটান করে সুরে বাঁধা তারটাতে টঙ্কার দিলে একতারাটি বাজতে শুরু করে। একতারার সুর খুবই সহজ সরল এজন্য সাধারণ মানুষের কাছে বাদ্যযন্ত্রটি অত্যন্ত সুমধুর এবং জনপ্রিয়। একতারা বাজানোর সুবিধার্থে বাদক একটি ইস্পাতের তৈরি তার দিয়ে মিজরাব বানিয়ে ব্যবহার করে থাকে যাতে বাজনাটাতে কোনো জড়তা তৈরি না হয়। বাউলরা কখনো একক, কখনো দ্বৈত ভাবে একতারা বাজিয়ে নৃত্য সহযোগে গান পরিবেশন করে থাকে, যা শ্রোতাকে আকর্ষণ করে।

খমক

বাংলা লোকগানের আরেকটি অন্যতম প্রাণস্পর্শী বাদ্যযন্ত্র খমক। অনেক নামেই ডাকা হয় এ বাদ্যযন্ত্রটিকে। যেমন: আনন্দলহরী, গুবগুবি এবং খমক। বাউল ও ভক্তিমূলক গানে এ বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়। এর সুর এবং ছন্দ আনন্দে মোহনীও করে তোলে বলেই হয়তো এর নামকরণ করা হয়েছে আনন্দ লহরী। যন্ত্রটি বাজানোর সময় গুব-গুবা-গুব আওয়াজ তোলে বিধায় অনেকে একে গুবগুবিও বলে। তবে মূল বিষয়টি ছন্দবোধ। নৃত্যের তালে তালে বাদ্যটি গানের সুরের সাথে মিলেমিশে একত্রে যে পরিবেশের সৃষ্টি করে তাতে বাংলার প্রাণবন্ত রূপের বহিঃপ্রকাশে সাধারণ মানুষের হৃদয়গ্রাহী হয়ে অন্যতম বাদ্যযন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

চিত্র: খমক

গঠন প্রণালী : একটি গোলাকৃতি কাঠের ছয় ইঞ্চি ব্যাস যুক্ত নিচের দিকে চামড়া সহযোগে তৈরিকৃত খমক। একটি গোলাকৃতির কাঠ খোদাই করে তাতে পিছনের অংশে টানটান করে চামড়া লাগানো হয়। এরপর চামড়াটির মাঝ বরাবর ছিদ্র করে কাঠের অথবা হাড়ের সওয়ারি বসিয়ে দু'টি শক্ত সুতা তার সাথে যুক্ত করে চামড়ার ছিদ্র অংশে প্রবেশ করিয়ে খমকের খোলা অংশের দিকে আনা হয়। মাথার অংশে একটি পিতলের ঘট আকৃতির পাত্র ছিদ্র করে তার সাথে যুক্ত করা হয়। যন্ত্রটি বাজানো বা ব্যবহারের সময় বাম হাতের বগলের নিচে চেপে রেখে বাম হাতের মুঠিতে পিতলের মাথাটি টান টান করে ধরে রেখে ডান হাতে রাখা মিজরাব দিয়ে সুতার উপর আঘাত করা হয়। যা থেকে সুরের সৃষ্টি হয়। বাজানোর সময় বাম হাতে ধরে রাখা অংশটুকু উঁচু-নিচু করার সাথে সাথে সুরের পরিবর্তন ঘটে এবং বিভিন্ন ধরনের সুর উৎপন্ন করে। খমকে জড়পের সুর অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

চটাই বা কাঠি

বাংলা সকল বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে এটি ভিন্নধর্মী বাদ্যযন্ত্র। যশোর জেলার বাগডাঙ্গা গ্রামে এর জন্ম। এই বাদ্যযন্ত্রটির উদ্ভাবক অসীম বিশ্বাস। সব ধরণের লোকগানের সাথে বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহৃত হতে পারে। তবে এই বাদ্যযন্ত্রটি শুধুমাত্র এ অঞ্চলেই পরিলক্ষিত হয়। গবেষণাকল্পে উদ্ভাবকের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে বাদ্যযন্ত্রটি সম্পর্কে জানতে পারি যে, তিনি বহু বছর পূর্বে বাদ্যযন্ত্রটি তৈরি করেন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুসঙ্গে সঙ্গত করে

আসছেন। পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে বিশ্বজিৎ বৈরাগী (পেশায় শিক্ষক) তিনি এ বাদ্যযন্ত্রটি সুকৌশলে বাউল, কীর্তন, জারি, ভাটিয়ালিসহ বিভিন্ন ধরনের গানের সাথে সঙ্গত করে থাকেন। বাঁশ দ্বারা নির্মিত হলেও বাজানোর সময় এটি কাঠের মতো ঠক্‌ঠক্‌ আওয়াজ করে, যা খুবই ছন্দবদ্ধভাবে গানের সুরের সাথে শ্রুতির সংযোগ ঘটিয়ে থাকে।

চিত্রঃ চটাই বা কাঠি

গঠন প্রণালী : বাঁশের মূল অংশ দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে বাদ্যটি। একটি বাঁশের গোড়া বা মূল অংশ যাকে আঞ্চলিক ভাষায় মুথা বলে। বাঁশের বাদ দেওয়া এ গোড়ার অংশ বা মুথা মাটি থেকে তুলে তার গায়ের অন্যান্য শিকড় গুলো পরিস্কার করে পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয় প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিন পর্যন্ত। পানি থেকে তুলে এবার ঐ নরম কাঠটি লম্বাকৃতির করে মাঝ বরাবর কেটে দু'টি অংশে বিভক্ত করে কাঠটিকে ধারালো ছুরি দ্বারা সমান ভাবে চাঁচ দেওয়া শুরু হয়। ঠিক নৌকাকৃতির মতো এর দু'মাথা নিচু মাঝখানটা একটু উঁচু। এক সাথে মোট চারটি কাঠি তৈরি করা হয়। দু'হাতের মুঠিতে সমান দূরত্বে আঙ্গুলের সাহায্যে ধরে রেখে তাল-ছন্দে বাজানো হয়। বিষয়টি যদিও কঠিন তবে অনেক বেশি চর্চা না থাকলে বাদ্যযন্ত্রটি বাজানো অসম্ভব। এর ছন্দ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের থেকে ভিন্নতর। দৈর্ঘ্যের পরিমাপে ৫ ইঞ্চি হয়ে থাকে।

করতাল

লোকগানে এর ব্যবহার অতুলনীয় ধারার সৃষ্টি করে থাকে। কীর্তন গানে বেশি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কিংকিনি শব্দের সাথে তাল-লয় যুক্ত করে মিষ্টি একটা শব্দ যা গানকে ছাপিয়ে যায় না অথচ সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে অটুট থাকে। নাম করতাল। দুই করের সাহায্যে পরস্পরকে আঘাতের মাধ্যমে শব্দ তৈরি হয় বলে একে করতাল বলা হয়। পিতলের তৈরি এই করতালের শব্দ ছন্দ ভিন্নতর ভাবে সংগীতকে প্রাণবন্ত করে তোলায় সাধারণ শ্রোতারা বাদ্যযন্ত্রটির প্রতি বিশেষ আগ্রহী। এটি এক প্রকার ঘন বাদ্যযন্ত্র।

চিত্রঃ করতাল

গঠন প্রণালী : কাঁসার তৈরি দু'টি কাঁধশূন্য সমান ছোটো গোলাকৃতির বস্তুই হলো করতাল। দেখতে থালার মত মধ্যে একটু ফাঁপা থাকে। দু'টি করতালের মাঝে একটি করে ছিদ্র থাকে যেখানে সুতা বা দড়ি পরানো হয়। এই সুতাটি আঙ্গুলের মাঝে আটকে রেখে দু'হাত জোড় করে একে অন্যের প্রান্তে আঘাত করলে মিষ্টি শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

মন্দিরা

মন্দিরা কাঁসার তৈরি এক প্রকার ঘন বাদ্যযন্ত্র। মন্দিরা বলতে একজোড়া পিতল নির্মিত ক্ষুদ্রকায় বাটি জাতীয় বাদ্যযন্ত্রকে বোঝায়। নানা প্রকার বাউল ও কীর্তন গানে এটি ঢোল ও মৃদঙ্গের সঙ্গে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বেশিরভাগ সময় কীর্তন এবং পঞ্চ কবির গানে এ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হয়। বিশেষ করে তাল-লয় ও ছন্দ নিরূপণে মন্দিরা বিশেষ সহায়ক বাদ্য।

চিত্রঃ মন্দিরা

গঠন প্রণালী : পিতল দ্বারা নির্মিত বাদ্যযন্ত্রটি দেখতে ছোটো বাটির মত। দু'টি পিতলের ক্ষুদ্রাকৃতির বাটি মুখের অংশটা সমান এবং গোলাকৃতির হয়ে থাকে। মাঝখানে ফাঁপা এবং দু'টি বাটির তলদেশে ছিদ্র থাকে যেখানে সুতা বা দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। দু'হাতের আঙ্গুলের মাঝে সুতা দিয়ে আটকে রেখে দু'হাত একসাথে করে বাজানো হয় বাদ্যযন্ত্রটি। ঠিক করতালের মত করে। তবে এর আওয়াজ করতালের থেকে কিছুটা ক্ষীণ।

কাঠ করতাল

ঘন শ্রেণির বাদ্যযন্ত্র কাঠ করতাল। এই বাদ্যযন্ত্রটিও লোকগানের সাথে বিশেষ করে মুর্শিদি গান ও বাউল গানে বেশি ব্যবহৃত হয়। নাম কাঠ করতাল। বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে এই বাদ্যযন্ত্রটি আলাদাভাবে প্রশংসিত। তাল ও লয়কে সমুন্নত রেখে ছন্দের সাথে মিলেমিশে লোকগানকে করে তোলে আরও বেশি সমৃদ্ধ।

চিত্রঃ কাঠ করতাল

গঠন প্রণালী : একটি কাঠের উপর এবং নিচের অংশে সমান দূরত্বে খুঁড়ে খোপ করা হয়। এরপর ঐ খোল অংশে একটি তারের ভিতর দু'টি করে ইস্পাতের চাকতি বসানো হয়। কাঠের যে অংশে এই চাকতিগুলো যুক্ত করা হয় ঠিক তার মাঝ বরাবর এমন ভাবে বড় ছিদ্র করা হয় যাতে একটি আঙ্গুল প্রবেশ করতে পারে। দুই আঙ্গুলে দু'টি কাঠ করতাল পরিয়ে একসাথে পাশাপাশি আঘাতের ফলে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। তাল-লয় ও ছন্দের সাথে এই বাদ্যযন্ত্র প্রয়োগে সংগীতে এক অনন্য মাত্রা যোগ করে। বাঙালির কাছে সহজলভ্য এই যন্ত্রটি খুবই জনপ্রিয়।

মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল

আনদ্ধ বাদ্যটি মাটির তৈরি। বর্তমানে ইস্পাত দ্বারাও তৈরি হতে দেখা যায়। বাউল ও কীর্তন গানে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মৃদঙ্গের বাদন শৈলী খুবই দর্শনীও বিষয়। ছন্দের সাথে নৃত্য সহযোগে বাদকরা এই বাদ্যযন্ত্রটি বাজিয়ে থাকেন। এর একদিক বড় এবং একদিক ছোটো গোলাকৃতির মুখ থাকে। তবলার মত দু'টি অংশেই চামড়ার উপরে পরিমাণ মত কালো রঙের প্রলেপ দেখা যায় যাকে ক্ষীরণ বলে। মাটির খোলে তৈরি বলে একে মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল বলে। চৈতন্য যুগে উদ্ভাবিত বলে অনেকেই ধারণা করে থাকেন। সারা বাংলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেম ও ভক্তি রসের কথা সুরের মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেব বিলিয়ে যে ভাব-রসের সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর সে ভাব-রস মিশ্রিত সুরের অনুষঙ্গ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল অন্যতম। প্রার্থনামূলক সংগীতের সাথে এ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হতে হতে এক সময় বাংলার লোকসংগীতের সাথে মিশে গেছে মৃদঙ্গ বা শ্রীখোলের সুমধুর আওয়াজ।

চিত্রঃ মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল

গঠন প্রণালী : 'মৃৎ+ অঙ্গ = মৃদঙ্গ' অর্থাৎ দু'টি শব্দের সমষ্টিতে এ শব্দটি এসেছে। দেড় থেকে পৌনে দুই ফুট লম্বা একটি মাটির খোল আগুনে ভাল করে পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হয়। এবার দু'পাশে দুটি চাকের সাহায্যে ছাউনিটা আটকানো অবস্থায় চারিপাশে এক থেকে দেড় ইঞ্চি দোয়ালের সাহায্যে টান টান করে বেঁধে রাখা হয়। যা বাদ্যযন্ত্রের শব্দটিকে শ্রুতিমধুর করতে সাহায্য করে। বাঁ দিকের মুখের ব্যাস আট থেকে নয় এবং ডান দিকের মুখের ব্যাস পাঁচ ইঞ্চি মতো চওড়া হয়ে থাকে। দু'দিকের চামড়ার ছাউনির উপরে কালো শক্ত প্রলেপ দেওয়া হয় যাকে গাব বা ক্ষীরণ বলে। দু'হাতের তালু এবং আঙ্গুলের সাহায্যে বাদ্যযন্ত্রটি বাজানো হয়ে থাকে।

সানাই বাঁশি

পূর্বে বাঁশির বর্ণনা দেওয়া হলেও সানাই একটি আকর্ষণীয় বাদ্যযন্ত্র। সানাই শুষির শ্রেণির বাদ্যযন্ত্র। লোকসংস্কৃতির আচার-অনুষ্ঠানের সাথে এটি বেশ পরিচিত বাদ্য। সাধারণত বিবাহ বা মাঙ্গলিক কাজে এ বাদ্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

চিত্রঃ সানাই বাঁশি

গঠন প্রণালী : দেড় ফুট লম্বা একটি নলাকৃতির কাঠের উপরিভাগে ছয়টি ছিদ্র করা হয়ে থাকে। মুখের অংশটা সরু রাখা হয় নিম্নাংশে থাকে একটি পিতল নির্মিত মুখ যা করবি ফুলের মত প্রশস্ত। মুখের অংশে ফুঁ দিয়ে বায়ু প্রবেশের জন্য বাঁশের দু'টি পাতলা চটা বা তাল পাতা দিয়ে তৈরিকৃত বাঁশি বসানো থাকে একে শর বলা হয়। এই শরে ফুঁ দিয়ে তৈরিকৃত ছয়টি ছিদ্রের উপরে আঙ্গুল রেখে এ বাঁশিটিকে সরল বাঁশির মতো করে বাজানো হয়। করুণ রসের সৃষ্টিতে সানাই বাঁশি অনন্য।

তথ্যনির্দেশ

১. ড. জাহিদুল কবীর, *ভটিয়ালী গানের উদ্ভব ও বিকাশ*, অন্বেষা প্রকাশনী , ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭। পৃ.– ২২০

২. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন (২য় ও ৩য় খণ্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮। পৃ.–৪৬৭

৩. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৪৮০–৪৮১

৪. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৪৮০

৫. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৪৭৯

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

যশোর জেলার উল্লেখযোগ্য লোককবি

যশোর জেলায় রয়েছে অসংখ্য লোকগানের স্রষ্টা বা লোককবি। যারা এ অঞ্চলের লোকগানকে করেছে সমৃদ্ধ। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

(১)

ইদু বিশ্বাস

(১৮১১–১৮৯৬ খ্রি.)

'চার পোতার এক ঘর বেঁধেছে,
ঘরামির নাম সৃষ্টিধর।
আড়ে দীঘে আছে প্রমাণ
ঠিক সমান সে ঘর॥'[১]

দেহতত্ত্ববাদের অপরূপ মূল্যায়ন উপরিউক্ত গানটির স্রষ্টা কবি ইদু বিশ্বাস। কবি, কবিয়াল, জারিয়াল, বয়াতি যেকোনো বিশেষণে বিশেষায়িত করা যেতে পারে এই সুধন্য শিল্পীকে। ইদু বিশ্বাস তৎকালীন বৃহত্তর যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার ঘোড়ামারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সময়ের হিসেবে **১৮১১** সাল। সময়ের এক সন্ধিলগ্নে জন্মেছিলেন এই মান্যবর লোককবি। শক্তিধর কবি পাগলা কানাই এর সমযোগী কবি ছিলেন ইদু বিশ্বাস। গুরু-শিষ্যের হিসেব তর্কে অনেক বাকযুদ্ধ হয়েছে এবং অদ্যাবধি চলমান ভক্ত সমাজ তথা সাধারণ জনমানসে। কবির জীবনাবর্তের বেশি ঘটনা বা বিবরণ পাওয়া ভার। কেননা তৎসময়ের কোনো লিখিত রূপ না পাওয়ায় লোক মুখের প্রচলন থেকেই এবং তাঁর বংশ পরম্পরার তথ্যানুযায়ী জানা যায় তিনি এক ধনাঢ্য কৃষি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতার পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদনমুখী জমি ছিল যা থেকে তাঁর জীবনধারণের অর্থের যথাযোগ্য যোগান আসতো। অর্থ সমস্যা না থাকায় ছোটোবেলা থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন গানের অগ্রজ প্রীতিপুরুষ। কবির সংসার সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তাঁর শিক্ষা জীবনের বর্ণনা বলতে তিনি প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মামা বাড়িতে থাকা অবস্থায় কবির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু এবং সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তীতে পারিবারিক অর্থানুকূল্যে গৃহ শিক্ষকের ছত্রছায়ায় আরবী, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষার পাঠ গ্রহণ করেন। বাংলা ছাড়াও এসব ভাষার পাঠ গ্রহণের দরুণ আরবী ও সংস্কৃত সাহিত্য তথা ধর্ম শাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন হয়। হাদিস, কুরআন, গীতা ও পুরাণে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। হয়ে ওঠেন শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন এক বোদ্ধাপুরুষ। কবির সমস্ত সংগীত কর্মকে বিশ্লেষণ করলে প্রধানত ছয়টি ধারায় ভাগ করা যায়: (১) দেহতত্ত্ব (২)

আল্লাহ তত্ত্ব (৩) হাস্য তত্ত্ব (৪) হিন্দু শাস্ত্রীয় (৫) ভক্তিবাদ ও (৬) সাধন তত্ত্ব। সংগীতে অভূতপূর্ব প্রেমের কারণে নিজে গানের দল গঠন করেন এবং বৃহত্তর যশোর ছাড়াও অবিভক্ত বাংলার পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান, ত্রিপুরা ও পূর্ববঙ্গ ভূখণ্ডের বিভিন্ন জনমহলে গান পরিবেশন করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। কথিত আছে— একবার ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ সংলগ্ন নলডাঙ্গা রাজবাড়িতে গানের আসর বসে। উক্ত সভায় ইদু বিশ্বাস ও পাগলা কানাইয়ের পাল্লা হয়। সাত দিন সাত রাত গান হওয়ার পরও কোনোরূপ যুক্তিতর্কের ভাটা পড়েনা। হাজার হাজার দর্শকের সামনে এই পাল্লা পরিবেশিত হয়। অপূর্ব পরিবেশনা দেখে নলডাঙ্গার রাজা প্রমথভূষণ দেবরায় উভয় কবিকে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন এবং ধুয়াজারি গানের শ্রেষ্ঠ জুটি হিসেবে ঘোষণা করেন। এমনি সব মোহনীয় বাণীবদ্ধ সুরের মহিমায় ভরিয়ে রেখেছিলেন তৎকালীন গ্রাম্য জনসমাজের সাধারণ মানুষকে। ইদু বিশ্বাসের ভাষার চৌকোষ প্রয়োগ ও সুতীক্ষ্ণ উপস্থাপনায় দর্শক বিভোর থাকতো গানের আসরে। জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রীয় আলোচনা ও যুক্তির বিচক্ষণতা ইদু বিশ্বাসের গানকে করে তুলেছে স্মরণীয়। অনেকে কবি পাগলা কানাইকে তাঁর গুরু বলে অভিহিত করেছেন। তৎসময়ে ইদু বিশ্বাস ও পাগলা কানাই সমযোগী শিল্পী ছিলেন। ইদু বিশ্বাস তাঁর ওস্তাদ সম্পর্কে বলেন —

‘নৈমুদ্দী জবর বুদ্ধি
বিদ্যাসাগর বুদ্ধিরসাগর
মৌলবী সম্প্রতি।’[২]

উপরিউক্ত গান থেকে এটায় প্রতীয়মান হয় যে, মৌলবী নৈমুদ্দি সাহেবই ইদু বিশ্বসের গুরু।

যুক্তিবাদী এ কবির সংসার ও গৃহকর্ম তথা অর্থের প্রতি কোনোরূপ লোভ-লালসা ছিলনা। তিনি নিজের পকেটের অর্থ ব্যায় করে তাঁর গানেরদল পরিচালনা করতেন। দেহের মাঝেই অসীমের প্রকাশ। সমস্ত জীবেই ঈশ্বর বিরাজমান এ অর্থকে প্রণিধানযোগ্য মনে করে সমস্ত ধর্মের মানুষের প্রতি ছিলেন সমসম্মান প্রদর্শী এক মহাপুরুষ। কবির একটি গানে তিনি তাঁর নিজের পরিচয়সহ সমসাময়িক কবিদের নাম পরিচয় তুলে ধরেছেন —

‘নামটি আমার ইদু বিশ্বাস ঘোড়ামারায় বাড়ি
চুল পেকে হয়েছি হুড়ো যত সব যোয়ান বুড়ো
করে দৌড়াদৌড়ি॥
কেহ হাসে মুখে পাকা দাড়ি।
ছিল রওশন, শাম, কানাই, নাই তুলনা
পাঁচুড়ে খাঁ যার বাড়ি॥
দিগরের কোরমানুল্লা
লক্ষ্মীপুরের তরীপুল্লা
পাগলা কানাই বেড়বাড়ি॥

আবাইপুরের পাগলা কোরেশ

বেশ ছিলো বয়াতী

হাগড়ার বিনোদ, তিলোক হোসেন

আড়াংঘাটার নওয়োজ আদিপুটের বসতি॥

বাকলির আকবর বয়াতী

বড় আকবর খাঁ বাড়ি ক'চো গাঁ

জাহের তাহের ঘুনিতি॥

আড়োর নঈমুদ্দীন জবর বুদ্ধি

বিদ্যার নাগর বুদ্ধির সাগর

মৌলবী সম্প্রতি॥

দানেশ ধোনাই মীরজান বুধোই

বদন বদন হেরাজতুল্লা

গানেতে বেড় না পাইল

দুইর হইল যাওয়া তাড়াতাড়ি॥'[৩]

হাস্য-রসাত্মক ভঙ্গির মাধ্যমে তিনি যশোর অঞ্চলের তাঁর সময়ের কবিদের কথা তুলে ধরেছেন। সমস্ত জীবদ্দশায় অসংখ্য গান রচনা করে আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন কবি ইদু বিশ্বাস। লোকসংগীতের ভাণ্ডারের অসংখ্য গানের মধ্যে তাঁর গান যশোর অঞ্চলের লোকসংগীতকে করেছে সমৃদ্ধ। ইদু বিশ্বাস রচিত একটি ধুয়ো গান—

'দক্ষ রাজা যজ্ঞ করতেছে

সেই যজ্ঞতে যজ্ঞ ধরে

তেতাড়ার হাড় খুলেছে রিণ গড়েছে

মহাদেব রাগিত হয়ে

সাপের ফণী ধরে সাঁড়াশি গড়েছে॥'[৪]

সংসার জীবনেরভববন্ধন থেকে ১৮৯৬ সালে ৮৫ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগত হন। নিজ বাড়িতেই এই মহান লোককবিকে সমাহিত করা হয়। তাঁর শিষ্যকুল আজও সেই প্রাণপুরুষের নির্দেশকে মাথায় নিয়ে সমাজ সংস্কারে এবং জাতি ও বর্ণ বিভেদের বিপক্ষে কবির বাণী প্রচার করার জন্য স্বচেষ্ট।

(২)

পাগলা কানাই

(১২০৯–১২৯৬ বঙ্গাব্দ)

বাংলা ধুয়াজারি গানের জসস্বী পুরুষ পাগলা কানাই। 'বাংলা ১২০৯ সালের ২৫ শে ফাল্গুন রোজ সোমবার'[৫] বৃহত্তর যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার লেবুতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বুড়োন শেখ ও মাতা মুমেনা খাতুন।

'শত রঙের দেখিরে গাভী
এক রঙের দুধ গো দেখি
তবে কেন এই জগতে
মানবিছ করতেছি
এক মায়ের দুধ গো আমরা
বাপ বিটায় খাতেছি॥'[৬]

সাম্প্রদায়িক বেড়াজালের ঊর্দ্ধের মানুষ ছিলেন কবি পাগলা কানাই। গানের আসরে গান গাওয়ার সময় তার চতুস্পার্শ্বের শ্রোতারা শ্রেণিভেদে আল্লাহ এবং হরিবোল বলে সমস্বরে স্বীকৃতি দান করতেন। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে এই চারণ কবি বাংলার গ্রামে গ্রামে গেয়েছেন ধুয়াজারি। 'কথিত আছে তৎসময়ে একবার দুর্গা পূজায় নলডাঙ্গা রাজবাড়িতে গানের আসর বসেছিলো উক্ত সভায় বহু শিল্পী ও গুণী জনের সমাগম হয়েছিলো। কবির তখন বেশি বয়স হয়নি, শিল্পী হিসেবে তেমন পরিচিতিও বাড়েনি। উপস্থিত রাজবাড়িতে গান পরিবেশনের ইচ্ছাপোষণ করেছিলো বটে কিন্তু অখ্যাত একজন বালক শিল্পীকে আয়োজক সভা অনুমোদন করেনি। দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে মণ্ডপের পিছনে বসে তখন আপন মনে গেয়ে চলেছেন তিনি। ক্ষণকাল পরে সমস্ত মানুষের কলধ্বনিতে কবিকণ্ঠ স্তিমিত হলো। পিছনে তাকাতেই দেখা গেল মায়ের প্রতিমা পিছন দিকে ঘুরে গেছে সভা স্থলে উপস্থিত সব সুধীজন ও শ্রোতা তা দেখে ভীষণ বিস্মিত হয়েছিল। সেই থেকে তাঁকে আধ্যাত্মিক জগতের লোক বলেও মানা হতো।'[৭] ছেলেবেলায় তিনি পিতৃহারা হন। সহোদর উজোল সবসময়কার সঙ্গী হয়ে ওঠেন কবির। হাসি-আনন্দের সাথী উজোল ছিলেন শান্ত প্রকৃতির; অপর পক্ষে কানাই ছিলেন দুরন্ত প্রকৃতির। আচরিত কোনো কিছুতেই তিনি তেমন একনিষ্ঠ ছিলেন না। ধরা-বাঁধা নিয়ম কানুনে তিনি বাঁধা পড়েননি কখনো। নিয়মের শিকলে মাত্র একদিন মাদ্রাসায় গমন করেছিলেন।

'লেখা-পড়া শিখবো বলে পড়তে গেলাম মক্তবে

পাগলা ছোঁড়ার হবে না কিছু ঠাট্টা করে কয় সবে।'[৮]

পরবর্তীতে পারিবারিক ও নিজস্ব চেষ্টায় বিভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। কবির পৈতৃক বসত ভিটা ছিলো তৎকালীন ঝিনাইদহ মহকুমার লেবুতলা গ্রামে। পার্শ্ববর্তী গ্রাম ছিলো নগরবাথান। এই নগরবাথান ছিলো নীল করদের কুঠিবাড়ি। যার অস্তিত্ব আজও দৃশ্যমান। নীল কুঠিয়ালদের অত্যাচারে কবি পিতা বুড়োন শেখ লেবুতলা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। আপন গ্রাম ছেড়ে তিনি আশ্রয় গড়েন বেড়বাড়ি নামক গ্রামে। বাস্তবিক দৃশ্যপটে কবি তাঁর জন্মস্থান হারান চিরতরে। আর সেই সুবাদে কবির কীর্তিধারিণী গ্রাম হয় বেড়বাড়ি। ছেলেবেলা থেকেই কবির স্বভাবে পাগলামী ছিলো; যার দরুণ তিনি নামের আগে পাগলা বলে পরিচিতি পান। তাছাড়া কথিত আছে—একবার মাঠে গরু চরানোর সময় তাঁর ভীষণ পেটে ব্যথা শুরু হয়। ব্যথায় তিনি ধুলায় লুটিয়ে পড়েছেন এমন সময় এক দৈব বার্তা এলো যা কিনা কবিকে ডাকছে– বাছা এই নে এক খণ্ড পোড়া কাঠ পাঠালাম, এই কাঠ ধরে এ পারে চলে আয়। ভাটপাড়ার নিকটস্থ কালীদহের অন্য পাড়ে ছিলো শ্মশান। এই শ্মশানে বাস করতেন এক যোগীপুরুষ। প্রেরিত পোড়া কাঠখানি ধরে যাত্রা শুরু করেন তিনি, ওপাড়ে পৌঁছে যোগীর সাথে কিছুক্ষণ আলাপচারিতায় মত্ত থাকেন এবং ক্ষণকাল পরে সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে ফিরে আসেন। প্রস্থান কালে তিনি কবিকে পাগলা বলে অভিহিত করেন। সে থেকেও তাঁকে পাগলা বলা হয় বলে অনেকে মনে করে। শিশু কাল থেকে কবি ছিলেন বিচক্ষণ কাব্যিক প্রতিভা সম্পন্ন। মাঠে গরু চরানোর সময় সহচরদের তিনি গান শোনাতেন যা ছিলো তৎক্ষণাৎ রচিত। সখারা তা দেখে শুধু মুগ্ধই হতেন না বিস্মিতও হতেন। সকলের মধ্যমণি ছিলেন পাগলা কানাই। উপস্থিত রচনা শক্তির বলে তাঁর সমযোগী কোনো গায়কই গানের পাল্লায় তার সাথে পেরে উঠতেন না। তিনি ছিলেন দরাজ কণ্ঠের অধিকারী। আসরে দাঁড়িয়ে গান শুরু করলে চার পাশের হাজারো দর্শক তা স্পষ্টতই শুনতে পেতেন। অপরূপ ছন্দময়তা ও যুক্তির খণ্ডনে তিনি আসরকে মাতিয়ে রাখতেন সব সময়। তাঁর সমস্ত গানের বাণী বিশ্লেষণে যা পাওয়া যায় তা হলো (১) শরীয়তি (২) মারফতি (৩) মুর্শিদী (৪) অধ্যাত্মবাদ। আবার এই অধ্যাত্মবাদের ভিতরে রয়েছে (ক) রাছুল তত্ত্ব (খ) দেহ তত্ত্ব (গ) আত্ম তত্ত্ব (ঘ) গুরু তত্ত্ব (ঙ) প্রেম তত্ত্ব এবং (চ) সাধন তত্ত্ব। তাছাড়াও তাঁর রচনায় রয়েছে ভাব ও কবি গানের সমাদৃত ভাণ্ডার।

জীবদ্দশায় কবি অল্প বয়সেই পিতা মাতা হারা হন। বড় বোন স্বরনারীর শ্বশুর বাড়ির পারিবারিক অবস্থা ভালো হওয়ায় কিছুদিন দুই সহোদর সেখানে আশ্রয় লাভ করেন এবং পরবর্তীতে নিজ গৃহ স্থাপন করেন। জীবনের বহু ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে প্রদীপ্ত যৌবনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার জীবনে পদার্পণ করেন। সুখী দাম্পত্য জীবনে অপরূপা সুন্দরী স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি লিখেছিলেন—

‘বিবির সুরৎ যেন দুতিয়ের চাঁদ,
আমি তালপাতার সিপাই।
তার কলামে ভাইরে ভাই-
ওরে হাসলে বিবি দেখায় ছবি পটোর পটের পর।
আমার কাছে এলে পরে নড়ে, যেন কল,
বিকলে যেন জলে ডোবা সুন্দীনালের ফল।
সেই পিরিতি মজেরে ভাই, আছি ভবের পর।’[৯]

স্ত্রী’র সম্পর্কে কবি নিজেই বর্ণনা করেছেন তবে কবির সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো— ‘কানাই সু-পুরুষ ছিলেন না। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায়, তাঁর অঙ্গের গঠন যেমন কদর্য, বেশভূষা তদনুরূপ আড়ম্বর শূন্য। তাঁর পৌত্রের বর্ণনাতেও উল্লিখিত তথ্যের সমর্থন মেলে, “তাহার রূপ চেহারা ভাল ছিল না। শরীর চিকন, খ্যাটখেটে, দাদো গা এর ন্যায় খসখসে ছামনের দাঁত দুইখানা উঁচু ছিল।” তাঁর এক ধুয়াতেও দাঁতের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়— কানাইয়ের দাঁত উঁচো, উজোলের মাজা কুঁজো।’[১০] সংসার জীবনে কবি তিন পুত্র ও এক কন্যার জনক ছিলেন।

জীবনে চলার পথে শত দুঃখ দারিদ্র্য কবিকে কখনো দমিয়ে রাখতে পারেনি। পিতা-মাতার বিয়োগ তৎপরবর্তী ভাইয়ের দেহত্যাগ কবি মনকে বিশেষভাবে ব্যথিত করে। ভাইয়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিলো অপরিসীম। যেখানেই যেতেন দু’ভাই একসাথে একযোগে। কলকাতায় একশত টাকা বেতনে চাকুরী পাওয়া সত্ত্বেও সহোদরকে রেখে তিনি সেখানে যাননি। দীর্ঘ জীবনে কবি গান করে বেড়িয়েছেন ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজশাহী, নদীয়া, চব্বিশ পরগণাসহ বৃহত্তর যশোরের সর্বত্র। সমকালীন সমস্ত কবিদের মধ্যে পাগলা কানাই ছিলেন সবচেয়ে শক্তিধর ও প্রতিভা সম্পন্ন কবি। কেননা কথায় কথায় ছড়াকাটা ও তাতে সুর বসিয়ে প্রতিপক্ষকে দমিয়ে দেওয়ার মত বিচক্ষণতা একমাত্র তাঁর মধ্যেই ছিলো। যৌবনে তিনি রাতের পর রাত জেগে বাংলার প্রতিটি লোকালয়কে সুরের মূর্ছনায় রেখেছেন মুখোরিত। অসাম্প্রদায়িকতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন কবি পাগলা কানাই। নিজ ধর্মে বিশ্বাস ও অন্য ধর্মের প্রতি সমমর্যাদাশীল এই মহাজ্ঞ পুরুষ আজীবন সুরকেই ভালোবেসেছেন। তাঁর বাণীতে প্রকাশ পেয়েছে ঈশ্বর প্রেম, ভক্তি ও উদার মানবতার জয়গান। ‘পাগলা কানাইয়ের সংগীত গুরু বা ওস্তাদ কে ছিলেন এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। কেননা তাঁর গানে গুরুর পরিচয় বেশি নেই। যতদূর জানা যায়, যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার অন্তর্গত রসুলপুর গ্রামের নয়ান ফকির ছিলেন তাঁর সংগীত গুরু। পাগলা কানাই গুরু সম্পর্কে একটি গানে উল্লেখ করেছেন—

ওস্তাদ আমার নয়ান ফকির

সভায় দিলাম পরিচয়।'[১১]

জীবন সায়াহ্নে ভক্তদের নিয়ে নিজ বাড়িতে গান বাজনা করে দিন কাটাতেন। ধর্ম কথার মর্মবাণী প্রচারে কবির বলীয়ান কণ্ঠস্বর সৈনিকের মতো কাজ করে গেছে। ইহলোকের কর্মযজ্ঞ শেষ করে 'কবি পাগলা কানাই ১৮৮৯ সালে (১২৯৬ বঙ্গাব্দে ২৮ আষাঢ়) পরলোক গমন করেন।'[১২] গবেষণাকর্মে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে লোকশিল্পী মতলেব ফকিরের তথ্যানুযায়ী যতটুকু জানা যায় পাগলা কানাই রচিত গানের সংখ্যা তিন হাজারের অধিক। তবে তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। কেননা এ পর্যন্ত তাঁর লিখিত গানের সংখ্যার কোনো সম্পূর্ণ রূপ পাওয়া যায়নি। কবি পাগলা কানাই যশোর জেলার লোকসংগীতকে সমৃদ্ধ করে লোকসংস্কৃতির ধারাকেই শুধু সমৃদ্ধ করেননি, তিনি নিজেই ধুয়াজারি গানের স্রষ্টাপুরুষ হিসেবে লোকসংগীতের একটি ধারা সৃষ্টি করে বাংলা লোকসংগীতে নিজেকে অধিষ্ঠিত করে গেছেন।

(৩)

পাঞ্জু শাহ্

(১৮৫১–১৯১৪ খ্রি.)

বাংলাগানের ভাবসম্পদে যুগে যুগে বহু মনীষীর জন্ম হয়েছে। সময়ের স্রোতে ভেসে যাওয়া সমস্ত দিনপঞ্জির পাতা খুঁজলে একে একে বেরিয়ে আসে সব মহামানবের আত্মকথা। ভাববাদ, সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্র আলোচনার প্রেক্ষিতে বেরিয়ে আসে বাংলাগানের ভাবসম্পদের বিবরণ। রাজনৈতিক পালাবদলে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ড বহুবিধ শাসক গোষ্ঠী দ্বারা শোষিত হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশ তার নিজস্ব সংস্কৃতি সত্ত্বায় বহমান। চাণক্যনীতি, বিদুষী খনার বচনসহ হাজারো মহামনীষীর মন্দ্রধ্বনিতে মুখরিত থেকেছে। সময়ের ব্যবধানে ভিনদেশী সব পীর, দরবেশ, আউলিয়া, সাধু জনের আগমন হয়েছে বারংবার। তথাপি আমাদের নিজস্ব ভূখণ্ডে জন্ম নিয়েছে স্বধন্য সব মহাপুরুষ। মরমী কবি পাঞ্জু শাহ্ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বাংলা, বাঙালির দর্শন বাউল দর্শন। 'মরমীবাদ ইংরেজি মিস্টিসিজম (Mysticism) শব্দের বাংলা রূপান্তর। মরমী বলতে অস্পষ্ট গূঢ়-অর্থপূর্ণ গুপ্ত রহস্য মণ্ডিত হৃদয় দ্বারা অনুভূত বিষয় বুঝায়। স্রষ্টার সাথে প্রত্যক্ষ সংযোজন স্থাপনে সক্ষম ব্যক্তিকেও মরমী বলা হয়। অর্থাৎ পরম সত্যের সাথে যাঁর মর্ম বা অন্তঃকরণ সংযুক্ত তিনিই মরমী এবং দার্শনিক প্রমাণাদি দ্বারা নির্ণীত তাঁর সিদ্ধান্ত বা মানসতত্ত্ব মরমীবাদ নামে অভিহিত।'[১৩] মরমীবাদের প্রতিপাদ্য আর বাউলের প্রতিপাদ্যে যথেষ্ট মিল লক্ষণীয় এই অর্থে যে, গূঢ় ও গুপ্ত রহস্য শব্দটি দু'য়ের ভিতরই রয়েছে আপন সত্ত্বায়। 'কবি পাঞ্জু শাহ্ ১২৫৮ বঙ্গাব্দের (১৮৫১ খ্রি.) ২৮ শ্রাবণ ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময় কবির পিতা খাদেমালি খোন্দকার কবি মাতা জহরা বেগম শৈলকুপাতেই তাঁদের নিজস্ব জমিদার ভবনে বাস করতেন।'[১৪] বাংলা ভাবগানের জনক বলা হয় মরমী কবি লালন শাহ্কে। কিন্তু ভাবগানের পরিপূর্ণ রূপ বিকাশে লালন পরবর্তী কবি পাঞ্জু শাহ্ই বিশেষভাবে খ্যাত। ভৌগোলিক পরিমণ্ডল এক হওয়ায় কবি পাঞ্জু শাহ্ দীর্ঘ সময় লালন শাহ্'র খুব কাছাকাছি থাকার সুযোগ পেয়েছে। সান্নিধ্যের শুভদৃষ্টি কিছুটা হলেও পাঞ্জু শাহ্'র উপর পড়েছিলো। তিনি কখনো কোনো মঞ্চে গান করে বেড়াননি তবু যা কিছু গেয়েছেন তা একেবারেই ঘরোয়া। 'একবার লালন শাহ্ এসেছিলেন হরিশপুরে পাঞ্জু শাহ্'র বাড়িতে অনুষ্ঠিত সাধুসভায় অর্থাৎ আখড়ায়। তখন পাঞ্জু শাহ্ ছিলেন যুবক। সে সভায় লালন শাহ্ দু'টি গান নিজেই পরিবেশন করেন এবং তার জবাব চান। যুবক পাঞ্জু শাহ্ গান দু'টির যথাযথ জবাব দেন কাব্যিক ভাষায়। ফলে আনন্দের আতিশয্যে লালন শাহ্ যুবক পাঞ্জু শাহ্কে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন। প্রশ্ন ও উত্তরের পর্ব দু'টি নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

প্রশ্ন:১॥ লালন শাহ্—

কে মুরিদ হয়, কে মুরিদ করে॥
শুনলে জ্ঞান হয়, তাইতে সুধাই,
যে জান সে বল মোরে॥
হাওয়া রূহু লতিফারা, হুজুরের কারবারী তারা,
বে-মুরিদ হলে এরা, হুজুরে কি থাকতে পারে॥
মুরশিদ বাল্কা এই দুইজনে, কোনমোকামে বসত করে,
জানলে মনের যেত আঁধার, দেখতাম কুদ্রত আপন ঘরে॥
নতুন সৃষ্টি হলে পরে, মুরশিদ লাগে শিক্ষার তরে,
তাই বলছে লালন, সব পুরাতন, নতুন সৃষ্টি হচ্ছে কে-রে॥

জবাব: পাঞ্জু শাহ্—

মুরশিদ তত্ত্ব কে সুধায়, চিনতে না রে।
যে সুধায় জ্ঞান পাবার আশে,
সেকি পুরাতন নহে রে॥
রূহু ইনছানি হায়ানি, মুরশিদ বাল্কা এই দুই শুনি,
লেখে ফোরকানে,
মহামায়া রিপুর ভোলে, হায়ানি পড়ে গোলমালে,
আপন মুরশিদ ইনছানিরে, না চিনে পড়েছে ফেরে॥
হাওয়া লতিকা রূহানী, সবের মুরশিদ হয় ইনছানি,
পূর্বপরে তাই, মুহম্মদি রূহু রহে, ইনছানি লা মোকাম নূরে,
হায়ানী কালেবে থেকে, না চিনে ফের মুরিদ হয় রে॥
বে-মুরিদ এই অজুদেতে, কেহ নাই তা সত্য বটে,
চিনারই দরকার
দয়া করে মুরশিদ দেখায়, তারে মুরশিদ বলিতে হয়,
পাঞ্জু বলে আঁধার ঘুচায়, থাকব তাঁর কদম ধরে॥

প্রশ্ন: ২॥ লালন শাহ্—

রঙ মহলে চুরি করে কোথায় সে চোরের বাড়ী॥
পাইলে সে চোরেরে, কয়েদ করে, পায়ে দিতাম মনবেড়ী॥
সিংহ দরজায় চৌকিদার একজন, অহর্নিশি থাকে সচেতন,
কখন তারে ভেল্কি মেরে, কোনঘড়ি করে চুরি॥
ঘর বেড়ে ষোলজন সিপাই, এক এক জনের বলের সীমা নাই,
তারাও চোরের টের পেল না, কার হাতে দিবে দড়ি॥
পিতৃধন সব চুরি করে, লেংটি ঝাড়া করলো মোরে,
লালন বলে, একই কালে, চোরের হলো কি আড়ি॥

জবাব: পাঞ্জু শাহ্—

বাওহারে এক জুতের ঘর॥
মালটি সুন্দর দুটি কাঠে বেঁধেছে ঘর কামিল কর॥
এক ঘরেতে গোলেমালে বসত করে ষোল জনে,
একি চমৎকার;
ঘরের মালেক এক বেটা, সে বসে আছে মটকার পর।
উঁই, ইঁদুর, ছারপোকা, ছুঁচো, মশা, সর্প বাকা,
ছয়জনা জঞ্জাল;
দশ দ্বারে দশ চোরের আড়ি, বশত করা হলো ভার॥
ঘরের মধ্যে মালের কুঠি, বার করে ইঁদুরে কাটি,
এসব দুষ্টোরই কারবার;
কাম দেবতা চোর চালাচ্ছে, খিড়কী দ্বারে বারাম তাঁর।
মনুরায় চোরের রাজা, দুষ্ট যত তারই প্রজা,
ভাঙ্গল সাধের ঘর,
পাঞ্জু বলে স্বামীর সঙ্গে, ঘরে শয়ন করব কবে আর॥'[১৫]

ভাবগানের তত্ত্ব বিচারে এই দুই ভাবুক কবি শিল্পী দু'পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন ও জবাবের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করেন। পুরাণ-কুরআন বিভিন্ন শাস্ত্র কথা ও দেহতত্ত্ববাদের অপূর্ব মিলন সহযোগে ভাবগান পরিবেশিত হয়। পাঞ্জু

শাহ্'র সমস্ত গানের বিষয়কে একটি বিভাজন চিত্রে চিত্রায়ন করা যায়। '১২টি ভাগে বিভক্ত তাঁর এই বিভাজন কর্মটি গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হচ্ছে — ১. আল্লাহ তত্ত্ব, ২. রাছুল তত্ত্ব, ৩. সৃষ্টি তত্ত্ব, ৪. মুরশিদ তত্ত্ব, ৫. দেহ তত্ত্ব, ৬. মানুষ তত্ত্ব, ৭. প্রেম তত্ত্ব, ৮. পরম তত্ত্ব, ৯. পারাপার তত্ত্ব, ১০. সংসার ও সমাজ তত্ত্ব, ১১. খেরকা তত্ত্ব, এবং ১২. গোষ্ঠ ও অষ্ট তত্ত্ব।'[১৬] পিতা খাদেম আলী খোন্দকার গোড়া মুসলিম গোছের মানুষ ছিলেন। জীবনের সমস্ত ভাবধারায় তিনি মুসলিম বিধান মেনে তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন। নিজে মুসলিম বিধান অতিক্রম করেননি এবং তাঁর ভাবধারায় পুষ্ট কাউকেই তিনি তার বাইরে যেতে দেননি। সন্তানদের পড়াশোনাতেও তিনি আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়েছেন। ধর্মীয় গোঁড়ামির অতল গহ্বরে হারিয়ে বাংলাকে তিনি বয়কট করেছিলেন বললে ভুল হবে না। পরবর্তীতে পিতার অগোচরে বাংলা ভাষা শিখেছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই কবি পাঞ্জু শাহ্ মরমী ভাবধারার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বাবার কড়া শাসন ও পাছে তিনি মনঃকষ্ট পান এই ভাবনায় গোপনে সাধুসঙ্গ রক্ষা করতেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি গৃহত্যাগ না করে সম্পূর্ণ রূপে বাউল মতে খেরকা গ্রহণ করেন। কারণ তিনি মনে করতেন গৃহকর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ তবে তার মধ্যে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে।

কবির 'সপ্তম ঊর্ধ্বতন পুরুষ নওয়াজেশ আলী খাঁ আফগানিস্তানের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি বাংলার সুবাদারের সুপারিশ ক্রমে দিল্লির বাদশাহ্ শাহজাহানের ফরমান অনুসারে মোহম্মদশাহী পরগণার শৈলকুপা এলাকার জমিদারি লাভ করেন। তাঁরই ভাষায় তাঁর বংশ পরিচয়—

পাঠান কুলেতে জন্ম জানিবে আমার
হপ্তম কুরছি নাম লিখি পর পর
নেয়াজেশ খাঁর বেটা দুদ্দু নাম তাঁর
এলছ খাঁ তার বেটা ছোবহান খোন্দকার
তিনা হতে খোন্দকারী দাদাজী আমার
খাদেম আলী খোন্দকার মেরা বাপজান
তাঁর বেটা হীন পাঞ্জু অতি হতজ্ঞান॥'[১৭]

পাঞ্জু শাহ্'র দাদার মৃত্যুর পর তার পিতা জমিদারী লাভ করেন। কিন্তু 'পরবর্তীকালে স্বীয় গোমস্তার ষড়যন্ত্রে জীবন বাঁচাতে স্বপরিবারে রাতের আঁধারে সব ছেড়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার হরিশপুর গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পূর্ব থেকেই হরিশপুর গ্রামে তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা পরাণ গাজীর বাড়িতে যাতায়াতের সূত্র ছিল। সেখানে জোতদার ফকির মাহমুদের সহায়তায় বাটিকামারা বিলের ধারে তিনি বসত বাড়ি গড়ে তোলেন।'[১৮] উল্লিখিত গ্রামখানি বৃহত্তর যশোর জেলার আওতাধীন ছিল যা পরবর্তীতে ঝিনাইদহ জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর উক্ত

প্রশাসনে সীমানাবদ্ধ হয়। তাঁর সমস্ত জীবনের সৃষ্টিকর্মকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়– প্রথমত, তিনি সেসময়ের একজন বলিষ্ঠ কাব্য প্রণেতা এবং দ্বিতীয়ত, একজন সংগীত স্রষ্টা ও গায়ক পুরুষ। যুক্তির বিচারে ও কাব্যময় ছন্দের প্রয়োগে তাঁর গান আজও বিশেষ স্থান লাভ করে রয়েছে।

ব্যক্তি জীবনে চলার পথে কবি দু'বার দ্বার পরিগ্রহ করেছেন। মরমীবাদের অপরূপ দৃষ্টান্ত কবি পাঞ্জু শাহ সর্বধর্ম মতের সমর্থক ছিলেন। সামাজিক ভেদনীতি তিনি সব সময় অগ্রাহ্য করেছেন। নারী ও পুরুষকে তিনি এক অভিন্ন সত্ত্বায় বেঁধেছেন। কেননা তিনি মনে করতেন এ দু'য়ের সন্ধিবদ্ধ প্রয়াসই একটি সমাজকে সঠিক পথে চালনা করতে পারে। নারী পুরুষের উপযুক্ত মিলনে যদি নব জন্মের সূচনা হতে পারে তবে নারীর মূল্য কম কোথায়? ধর্মীয় গোঁড়ামি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সামাজিক কুসংস্কার শাসকের দুঃসহ সব বিচার ব্যবস্থাই সমাজে এক অগ্নিসম পরিবেশ বিরাজমান। উত্তপ্ত ভূমিতে দাঁড়িয়ে ভাটির উল্টো হাল টানা কম সাহসের কাজ নয়। লালন শাহ্'র সান্নিধ্য ধন্য এই মরমী কবি হস্ত-পদ সমেত মানুষ আকারকে প্রকৃত মানুষ রূপে দেখতে চেয়েছেন সর্বদা। "তিনি বলেন—

দলীল পড়িয়া ভাই
মৌলভী হলো তাই হায় গো।
মনেতে ভেবেছে এই ভেস্তে যাবে চলে।
আবার ইঞ্জিল পড়ে কেউ
সর্দ আদমী হলো সেও, হায় গো
মোর দিন ভাল বলে ডংকা মেরে চলে।
ভগবত পড়ে কেউ
পণ্ডিত হলো সেও হায় গো।
বলে সেও স্বর্গে যাবে, হিন্দু লোকের দলে
নাচা নাচি করে তারা পড়লো গোলমালে।

পাঞ্জু বলেন, কোনো শাস্ত্রানুসারে স্বর্গ লভ্য নয়। গুরুবাদী লালন বলেন, 'দেহ চিনে সাঁই ধর পার পাবা পারাপার'।"[১৯] 'সমাজ জীবনেও পাঞ্জু শাহ্ অত্যন্ত অমায়িক ও জনপ্রিয় ছিলেন। সমাজের মান্য ব্যক্তিগণকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন, তাঁদের নিয়ে দরবারে বসতেন এবং সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের পরামর্শ চাইতেন। অতিথি পরায়ণতা তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো। কোনো প্রার্থীকে তিনি শূন্য হাতে ফিরাতেন না। অন্ধ, আতুর, কালা, বোবা ইত্যাদি ভিক্ষুক সর্বক্ষণ তাঁর কাছ থেকে ভিক্ষা পেতো।'[২০]

১৭৯৩ সাল। দেশ সামন্ত শাসন ও শোষণের নিগূঢ় জালে আবদ্ধ। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে বাংলার কৃষক জমি থেকেও সে ভূমিহীন; সে পরের জমি আবাদ করছে। শোষণ চলছে জমিদারের, অত্যাচার চলছে নীলকরের। ইংরেজ সরকারের রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়াই জমিদারী হাত বদল হচ্ছে, কৃষক তার কিছুই জানেনা। সে কেবল রাজস্বের যোগানদার, এর বেশি তার আর কোনো অধিকার নেই। আমাদের লোককবি, ধ্যানী কবি সরল তার মন, সে চিন্তা চেতনা ও জীবন যাপনে সর্বতো ভাবেই অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, প্রেম-ভক্তি প্রগাঢ়, সুফিবাদসিক্ত বৌদ্ধ-উর্বর; তাঁর সমাজমন-সামন্ত সমাজের শোষণ-নির্যাতন-অত্যাচারের শিকার সে নিজেও। তাই অত্যাচার-পীড়ন-নির্যাতনের চিত্র সে অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করেছেন এবং সেই চিত্র তিনি তাঁর কাব্য ভাষায় চিত্রিত করেছেন। হাজার বছর ধরে গড়ে উঠা কৃষিজীবী মেহনতি মানুষের মাঝে ধনী মাতবর বা বিত্তশালী মোড়লের বাস। দরিদ্র প্রতিবেশির জীবন এদের অত্যাচারে জর্জরিত। গরিব কৃষাণ-বধূর সতীত্বের প্রতিও হাত বাড়ায়। কবির ভাষায়—

গ্রামেতে বহুত লোক মালদার ছিল
কাঠুরে গরীব সেই একলা আছিল॥
সোনার পোদ্দার এক সদাগর ছিল
বিবিকে দেখিয়া তার আসক হইল॥
কুটনী লাগায়ে সেই বিবিকে কহিলো
তওবা বলিয়া বিবি মুখ ফিরাইল॥

সমস্ত সমাজে নারী নির্যাতনের এ এক চিরন্তন প্রবণতা।'[২১] জীবদ্দশার সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টার ক্রান্তি লগ্নে মানব প্রেমী এই মরমী কবি ১৩২১ বঙ্গাব্দে (১৯১৪খৃ:) ২৮ শ্রাবণ ৬৩ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। হরিশপুরে তাঁর আখড়াবাড়ির প্রাঙ্গনে তিনি সমাহিত আছেন। শিষ্যদের উদ্যোগে মাজারটির উপর পাকা স্মৃতি সৌধ নির্মিত হয়েছে।'[২২]

(৪)

দুদ্দু শাহ্

(১৮৪১–১৯১১ খ্রি.)

যুগে যুগে মহামনীষীর আগমনে এ ধরাধাম ধন্য হয়েছে। সময়ের চলনে অনাচার অত্যাচার ও অবিচারে পৃথিবী কলুষিত হয়েছে বারংবার। অন্তিম ক্রান্তিতে সবুজ জগতের সূর্য সন্ধান দিতে জন্ম নিয়েছে মানবরূপী ঈশ্বর প্রদত্ত দূত। সামাজিক বেড়াজালের যূপকাষ্ঠে মানুষে মানুষে সংঘাত, বিবাদ ও হানাহানি প্রাচীনকাল থেকেই ছিলো। অতীতে গুহাবাসী যাযাবর মানব সম্প্রদায় নিজেদের বাঁচার তাগিদে সংঘবদ্ধ হয়ে আবাস গড়ে তুলেছে। ভিন্ন ভিন্ন সংঘবদ্ধ এ আবাসের সাথে মল্ল যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে উভয় সম্প্রদায় একই মানব সম্প্রদায় তাদের ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা কল্পে একে অপরকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে। অতীতের মানব সমাজ নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে তথা বন্য পশুর হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রথম ভাগে অস্ত্র তৈরি ও তার প্রয়োগ করেছে। কালক্রমে সেই অস্ত্রের ব্যবহারিক অপব্যবহার হয়েছে স্বজাতির মধ্যে এবং সর্বোপরি তার প্রয়োগ হয়েছে ক্ষমতা ও যশের প্রতিষ্ঠা কল্পে। সনাতন শাস্ত্রানুযায়ী চার যুগের শেষ যুগের এক ক্রান্তিকালে জন্ম নিয়েছে বাংলার অন্যতম শক্তিধর লোককবি তথা মরমী কবি দুদ্দু শাহ্। তাঁর জন্মকাল নিয়ে বহুবিধ মতের ও পথের প্রচলন রয়েছে। মতভেদে তিনি 'বাংলা ১২০৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন।'[২৩] স্থানিক তথ্যানুযায়ী তিনি বৃহত্তর যশোরের কবি ছিলেন। 'এ প্রসঙ্গে ড. খন্দকার রিয়াজুল হক বলেন— যশোর জেলার হরিণাকুণ্ডু থানার বেলতলা গ্রামে দুদ্দু শাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। এসব মতবিরোধের মীমাংসাকল্পে ড. এস.এম. লুৎফর রহমান বলেন — প্রকৃত পক্ষে দুদ্দু শাহ্'র জন্মস্থান বৃহত্তর যশোর জেলার (অধুনা ঝিনাইদহ জেলা) হরিণাকুণ্ডু থানার (এখন উপজেলা) হরিশপুরের পূর্বপার্শ্ব সংলগ্ন বেলতলা গ্রাম। আমরা এস.এম লুৎফর রহমানকৃত এই মত যুক্তিগ্রাহ্য বলেই মনে করি।'[২৪]

'তাঁর পিতা ঝড়ু মণ্ডল। দুদ্দু শাহ্'র আসল নাম ছিল দবিরুদ্দিন। ফকিরি মতে দীক্ষা নেওয়ার পর তিনি দুদু মল্লিক শাহ্ বা দুদ্দু শাহ্ নামে পরিচিত হন।'[২৫] প্রখর মেধাসম্পন্ন এই কবির স্মৃতি শক্তির কথা অবাক করার মতোই। তিনি বাল্যকালে স্কুল জীবন সমাপ্ত করে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নে বিশেষ মনোযোগ দেন এবং তা করায়ত্ব করতে বিশেষভাবে সমর্থ হন। আরবী-ফারসী ভাষায় তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। সমস্ত কোরাআন শরীফ তাঁর মুখস্ত ছিলো। সে সুবাদে তিনি কোরআনে হাফেজ ছিলেন। তাছাড়া শ্রীগীতা, চৈতন্য চরিতামৃত, বাইবেল, ত্রিপিটক সহ অন্যান্য সব ধর্মগ্রন্থে তিনি প্রখর বুদ্ধিদীপ্ততা অর্জন করেন। অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান তাঁকে মানবতার সর্বোচ্চ স্থানে আসীন করেছিলো।

সমস্ত জীবদ্দশায় তিনি বহু গান রচনা করে গেছেন। যুক্তিবাদী সমাজ চেতনার উন্মেষ কল্পে তিনি ছিলেন এক যোগীপুরুষ। সমাজ তান্ত্রিক এক উদার মনস্ক লেখক যোদ্ধা ছিলেন কবি দুদ্দু শাহ্। কথিত আছে তিনি

একবার যা শুনতেন পরবর্তীতে তা হুবহু বলে দিতেন। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত এই কবি জীবনের বেশিরভাগ সময় লালন সাঁইজী'র সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। সমস্ত জীবনের এক আনন্দঘন পরিবেশে তিনি কাল কাটিয়েছেন কেননা বাঙালি দর্শনবাদের অপরূপ কীর্তিমান ফকির লালন শাহ্'র অত্যন্ত স্নেহধন্য হয়েছিলেন তিনি। অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ সব বিশ্লেষণধর্মী মনচেতনা ও জিজ্ঞাসু মনের অপরূপ ভিত্তিযোগে তিনি সাঁইজীর পাদপদ্মে সহজে স্থান করে নিয়েছিলেন। তৎসময় লালন শাহ্'র যত শিষ্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে দুদ্দু শাহ্ অন্যতম।

ইংরেজ শাসনের নির্মমতা ও সামাজিক ধর্মন্ধতার বিরুদ্ধে তিনি সব সময় কলম ধরেছেন। নির্দিষ্ট বিশেষ ধর্ম মতে তিনি নতমস্তক ছিলেন না। সর্বমতের একমত– মানবতার জয় হোক, এই মতবাদে বিশ্বাসী কবি দুদ্দু শাহ্ জীবনভর বিভিন্ন ধারার গান রচনা করেছেন। 'ড. এস.এম. লুৎফর রহমান তাঁর গানকে নানা ভাবে বিভাজন করেছেন। যেমন: ১. ইতিহাস চেতনা, ২. দেশ ও ভাষা চেতনা, ৩. অসাম্প্রদায়িক মানস চেতনা, ৪. শ্রেণি সচেতনতা, ৫. সমাজ চেতনা, ৬. মানবিকতা, ৭. বাস্তব সচেতনতা, ৮. সংস্কার শূন্যতা। ড. রহমানের এই বিভাজন কর্মটি যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়; তবে এ কথা বলা যায় যে এ বিভাজনের সবগুলো বিষয়ের মর্মার্থ হচ্ছে সমাজ সচেতনতা। দুদ্দু বলেন—

তন্ত্র মতে বুদ্ধের বাণী
সেই তন্ত্র শিরোমণি
দুদ্দু বলে আমরা জানি
লালন সাঁই দরবেশের দয়ায়॥'[২৬]

বাউল ধর্ম মতের উদ্ভব কথার জানান দাতা ফকির লালন শাহ্। মানবতাবাদের অপর নাম হলো লালন সাঁই। বাংলা তথা বাঙালির দর্শন বাউল দর্শন আর এর সারতত্ত্ব হলো মানবতার জয়গান। বাউলের সমস্ত মত-পথ ও চিন্তার জায়গাতে মানবের জয়গান গাওয়া হয়েছে। বাউলের সমস্ত গূঢ় ও গোপন তত্ত্বকে কবি দুদ্দু শাহ্ সহজ সরল ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। ফকিরি ভাববাদের প্রতি বিশেষ আসক্তির ফল স্বরূপ তিনি বলেছেন—

'বাহাছ করিতে এসে বয়াস হইনু
আমি অতি অভাজন লালন সাঁই বিনু॥'[২৭]

উল্লিখিত তথ্য মতে নিশ্চিত যে, তিনি লালন শাহ্'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। লালন মতাদর্শের এই মহাপুরুষ সব সময় সকল ধর্ম মতের ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানবের জন্মকথা বিচারের কঠিন যুক্তিতে তিনি ধর্মকে ক্ষীণ করে দেখেছেন। তিনি গেয়েছেন —

'আগে মানুষ পরে ধর্ম জাতির পরিচয়
ধর্ম জাতি আগে হলে শিশু বালক কে না জানতে পায়॥

দর্শন শ্রবণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে
শেখে শিশু হিন্দু যবন আর খ্রিষ্টানে
বিচার আচার হিংসা ঘৃণা উদয় হয় মনে
এসব জন্মগত নয়॥
মানুষের জাত ধর্ম সৃজন
ঈশ্বর কিংবা প্রকৃতির নয় কখন
দীন দুদ্দু শাহ্ বলেরে মিলন কবে যে হয়॥'[২৮]

'তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে অধ্যাপক খোন্দকার রিয়াজুল হক বলেন — প্রাণবন্ত ছন্দ যদি প্রাণের চিন্তাধারার উৎকর্ষে পরিণত হয়, তবে দুদ্দু শাহ্ যথার্থ কবি। অনুভূতির দল-পাপড়িগুলো যদি কাব্যে ও ভাষায় নবমাল্য সৃজনে আত্মোমহিমায় প্রথিত হয় তবে দুদ্দু শাহ্ সার্থক শিল্পী। হৃদয় ডুবানো উপলব্ধি যদি গীতিকা গগনে নক্ষত্রের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য লাভে ধন্য হয়, তবে দুদ্দু শাহ্ মরমী গীতির অতুলনীয় স্রষ্টা। সুরের অনুরণন যদি সম্মোহন রচনা করে মনকে উচ্চ থেকে উচ্চ গ্রামে পৌঁছে দিয়ে অতীন্দ্রিয় লোকের রসাস্বাদনে উদ্বুদ্ধ করে, তবে দুদ্দু শাহ্ প্রকৃত ভাবগীতির জনক। সত্যই তিনি বঙ্গ মাতার এক কৃতি সন্তান।'[২৯]

একেশ্বরবাদে মিলনের আশায় কবি সর্বদা মানুষের জন্মকথা, জন্মের রহস্য ও তার আসা যাওয়ার পথকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে দেখেছেন। জন্মকালে মানুষ জানেনা তার ধর্ম কি; সে কোথা থেকে এসেছে এবং তার চলার পথ কি হবে! সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি অনুযায়ী একটি শিশু সন্তান বেড়ে ওঠে যা কখনো ধর্মকে আবৃত করে নয় বরং প্রাকৃতিক চিন্তা চেতনার প্রবৃদ্ধিতে। পরবর্তীতে যা সমাজের ধর্মান্ধ মানুষের গোঁড়ামির ফলশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে চিত্রায়িত। এ সকল ধর্মভেদকে চিন্তা করে দুদ্দু শাহ্ বলেন —

'ছোটো বলে ত্যাজো কারে ভাই
হয়তো ওর রূপে এলেন ব্রজের কানাই॥
শূদ্র-চাড়াল-বাগদি বলার দিন
দিনে দিনে হয়ে যাবে ক্ষীণ
কালের খাতায় হইবে বিলীন
দেখছি রে তাই॥
ছোটো হীন বলে যারে
ঘৃণা করে দিলে দূরে
আজি সে বসবে উপরে

Dhaka University Institutional Repository

দেখিতে তাই পাই॥

এলো রে ধর্ম কলিকাল

ছোটো বড়ো এক হবে সকল

সেই আশাতে ফেলছে নয়নজল

দুদ্দু সর্বদাই॥'[৩০]

সমাজের বাঁধা নিয়মকে তিনি কখনো মানেননি। মানুষ তার কর্ম অনুযায়ী কেন সামাজিক অবস্থানে নির্দেশিত হবেন? মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে, প্রকৃতিকে ভালোবাসবে এটাই তার মূল প্রতিপাদ্য কেননা মানব দেহে ঈশ্বর বিরাজমান। সর্বজীবে ঈশ্বরের অবস্থান ভ্রাতৃত্ববোধের এক মহামিলনের স্বপ্নে কবি বুক বেঁধেছেন সর্বদা। যুক্তির স্বপক্ষে তিনি অকাট্য সব প্রশ্ন রেখে গেছেন। তিনি বলেছেন—

১.

'ধলা- কালার একই বীজ ভাই

সর্ব জাতি যাতে হয় উদয়

কর্মগুনে এই সমাজে ভিন্ন গোত্র আখ্যা পাই।

দীন দুদ্দু বিনয় করে কয়

আমার কোনোজাতি গোত্র নাই

দিয়ে মানুষের দোহাই মানুষের গুন গাই...॥

২.

মহম্মদের জন্ম যদি হতো এ দেশে

বেহেশতের কোন ভাষা হতো, বলতো এসে॥

কেন কূপমণ্ডূক হওরে ভাই

হিসেব করে বোঝ সবাই

খোদার সত্ত্বার কোথাও খোঁজ নাই

অধীন দুদ্দু ভেবে বলে॥'[৩১]

৩.

'হজ্জ করিলে যদি যেত গুণা

মক্কায় জন্মিয়ে কেউ পাপী হতো না॥'[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

মানব জন্ম এবং ধর্মান্ধত্বের বিষয় তাঁর উল্লিখিত বাণীতে যথেষ্ট সাক্ষ্য রেখেছে। সমাজের সকল বিষয় তার গানে পরিশীলিত ভাবে স্থান পেয়েছে। 'মরার আগে মরা অর্থাৎ জীয়ন্তে মরণ সাধকের লক্ষ্য। এ বাণীর প্রতিফলন ও অনুসরণ শুনি দুদ্দু শাহ্'র কণ্ঠে। তিনি বলেন—

'জীবন থাকিতে মরতে কয়
জানি না সে কেমন মরণ
শুনতে মনন হয়॥'

দুদ্দু শাহ্ ছিলেন একজন স্বভাব লোককবি। তাঁর সংগীতের ভাষা ও গাম্ভীর্য ছিলো উন্নতমানের। এ সাধক কবি ১৯১১ সালে (১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৭ই পৌষ) মৃত্যু বরণ করেন। তিনি সমাহিত আছেন জন্মগ্রাম বেলতলায় নিজ বাড়ির প্রাঙ্গণে। তাঁর পুত্র তিনজন — হাকিম শাহ্, একিন শাহ্ ও জসীম শাহ্ তারাও আজ আর পৃথিবীতে নেই। তাঁদের বংশধরেরা বেলতলায় বসবাস করছেন। এ বংশের কেউ দুদ্দু শাহের পথ ধরে রাখতে পারেনি।'[৩৩]

(৫)

বিজয় সরকার

(১৯০৩–১৯৮৫ খ্রি.)

বাংলা বিচ্ছেদী গানের কর্তাপুরুষ কবিয়াল বিজয় সরকার। সময়ের এক শক্তিধর কবি হিসেবে তাঁর আবির্ভাব। বিজয় সরকার কবিয়াল, সুকণ্ঠী গায়ক, মরমী কবি, বিচ্ছেদী গানের স্রষ্টা এমনই বহুবিধ ভূষণে ভূষিত করা যায়। আলোচিত নানা মাত্রিক বিচিত্রতা ও স্বচিত্রতা নিয়ে সংগীতের এক অনন্যধারা রূপ কবিগান রচনা করেছেন যা বাংলার মানুষের কোমল হৃদয়কে আজও মোহিত করে। অতীতে কবিগানের বিষয়-বৈচিত্র্য ছিলো সম্পূর্ণ রূপে অশ্লীলতাপূর্ণ। সময়ের পরিক্রমায় একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে অদ্যবধি তার নিজস্ব স্বকীয়তায় বর্তমান। বহু পথ পাড়ি দিয়ে একটি সাবলীল ও রসব্যঞ্জক ধারা অবলম্বন করে আজকে সকল শ্রেণির মানুষকে আনন্দ দানে সক্ষম হয়েছে। বাংলা ভাব সংগীতের জগতে অসংখ্য গায়ক ও কবিয়ালের পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে তন্মধ্যে কবিয়াল বিজয় সরকার অন্যতম।

'পিতার নয়টি সন্তানের মধ্যে পাগল বিজয় সর্ব কনিষ্ঠ।'[৩৪] 'তিনি ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ৭ ফাল্গুন মোতাবেক ১৯০৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে বর্তমান নড়াইল জেলার সদর থানার ডুমদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।'[৩৫] প্রখর মেধা সম্পন্ন কবিয়াল বিজয় সরকার স্কুলের ভালো ছাত্র হিসেবেই পরিগণিত ছিলেন। পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি গান রচনা ও গাওয়াতে ছিলেন পারদর্শী। সুরেলা কণ্ঠের জন্য শিশু বিজয়কে এলাকাবাসী ও পাঠশালার শিক্ষকগণ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। কবির বাস্তুভিটা ও জন্ম পরিচয় সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো— 'বিজয় সরকারের পূর্বপুরুষ বৈষ্ণব-গুরু নাটু বৈরাগী ও উদ্ধব বৈরাগী। বৈরাগী সমাজ এক সময় যশোর শহরের উত্তর পার্শ্বে কোনো এক স্থানে বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়। বিশেষ কোনো কারণে বিজয় সরকারের পূর্বপুরুষ বর্তমান নড়াইল শহরের প্রায় তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বের বিলের মাঝখানে ডুমদী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ডুমদী গ্রাম কয়েকটি টিলার উপরে স্থাপিত। বিজয় সরকারের পিতামহ গোপালচন্দ্র বৈরাগী। পিতার নাম নবকৃষ্ণ বৈরাগী। মাতা হিমালয় কুমারী বৈরাগী।'[৩৬] কবির পিতা নবকৃষ্ণ বৈরাগী অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন এক বলীয়ান পুরুষ ছিলেন। সময়ের এক প্রখ্যাত লাঠিয়াল ছিলেন। লাঠি খেলায় সেসময়ে তার সাথে পেরে উঠার মতো কেউ ছিলো না বললেই চলে। তাছাড়া তিনি একজন সুকণ্ঠী গায়কও ছিলেন বটে। কবিগানের তিনি একজন বোদ্ধা শ্রোতা ও ধর্মীয় গানের গায়ক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। বহুরাত তিনি এলাকার সাধুসঙ্গে গানের তর্জা জমিয়েছেন।

বিজয় সরকারের বংশানুক্রম যেটুকু জানা যায় তা নিম্নরূপ—

Dhaka University Institutional Repository

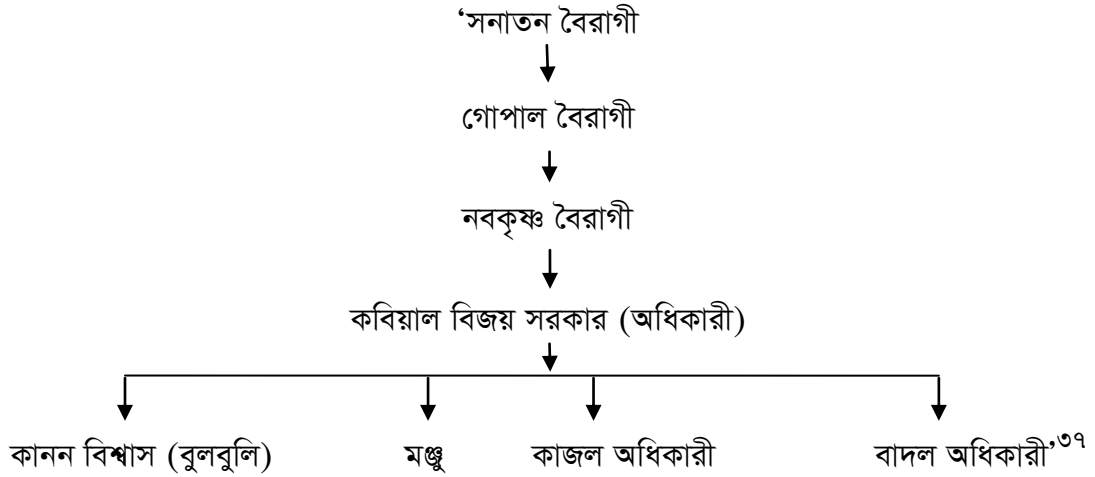

বিজয়ের পিতা সামান্য শিক্ষিত হওয়ায় সন্তানকে ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনার এক বিশেষ ব্যবস্থা করে দেন। 'বিজয়ের জ্যাঠ্তুত ভাই অভয়চন্দ্র বৈরাগী শিশু বিজয়কে পড়াশুনায় উদ্বুদ্ধ করেন। বিজয়ের থেকে তিনি কয়েক বছরের বড় ছিলেন। অভয়চন্দ্র বাড়িতে বসে শিশু বিজয়কে লেখার হাতে খড়ি দেন। এরপর পিতা নবকৃষ্ণ বিজয়কে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন ডুমদী গ্রামের মধ্যপাড়ার নেপাল বিশ্বাস। লোকে তাঁকে নেপাল পন্ডিত বলে ডাকতো। নেপালবাবু শুধু শিক্ষকতাই করতেন না, তিনি ছিলেন সঙ্গীতে ওস্তাদ। এছাড়া যাত্রাদলের অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিলো। নেপাল বাবুর কণ্ঠ ছিলো অতি মধুময়। কিশোর বিজয় পাঠশালায় অধ্যয়নকালে গ্রাম্য মেয়েদের বিয়ের গান ও জাগরণগানে কণ্ঠ দিয়ে নেপাল বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নেপাল বাবু কিশোর বিজয়কে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে গান শিখাতে থাকেন। এইভাবে বিজয় সরকারের সঙ্গীতে হাতে খড়ি হয়।'[৩৮] 'লোয়ার পাঠশালার অধ্যয়ন শেষে বিজয়ের মেজদাদা হৃদয়নাথ বৈরাগীর আন্তরিক ইচ্ছেয় পার্শ্ববর্তী গ্রাম হোগলাডাঙ্গা ইউপি স্কুলে বিজয় ভর্তি হন। এসময় কিশোর বিজয়ের মধ্যে সংগীত প্রতিভার স্বভাবজাত কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। সেসময় ঘটনাক্রমে ডুমদি গ্রামে উপস্থিত হয়েছিলেন ফরিদপুরের বিখ্যাত কীর্তন গীতিকার চণ্ডি গোঁসাই। গান রচয়িতা হিসেবে সেযুগে চণ্ডি গোঁসাইয়ের নাম মুখে মুখে ফিরতো। আজও গ্রাম্য প্রাচীন গায়কদের কণ্ঠে চণ্ডি গোঁসাইয়ের সুমধুর পদ শোনা যায়। বিজয়ের মুখে গান শুনে চণ্ডি গোঁসাই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, "ভগবান তোমাকে একদিন বড় গায়ক করবেন"।'[৩৯] স্কুল ফেরার পথে ও যাওয়ার পথে বিজয়কৃষ্ণ বিভিন্ন পালাকীর্তনের অংশ বিশেষ নিজে নিজে গাইতেন। কখনো বাঁহাতে থাকা ছাতির বাটে তাল রেখে গেয়ে চলতেন আপন মনে যা শুনে সহপাঠী ও এলাকাবাসীর মনে রীতিমত উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিলো। সময়ের সাথে কবির জীবন এগিয়ে যেতে থাকে। নয়

Dhaka University Institutional Repository

ভাই বোনের মধ্যে কবিয়াল বিজয় সরকার সব থেকে আদরের ছিলেন। সাংসারিক ক্রিয়াদি সম্পন্নে মাকে সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে; ফলে বড় বোনই তাঁর আদর যত্নের বেশিরভাগ ভার গ্রহণ করেছিলেন।

স্কুলে পড়াকালীন সময়েই কবির যাত্রায় অভিনয় করার সুযোগ আসে তৎসময়ে 'নড়াইলের জমিদার মনীন্দ্রনাথ রায় একটি সখের যাত্রাদল গঠন করেন। পাগল বিজয় ঐ যাত্রাদলের একাঙ্গি বালক হিসেবে কাজ করেন। তিনি ঐ দলের সঙ্গে থেকে হরিশ চন্দ্র, অনন্ত মাহাত্ম্য, সুরথ উদ্ধার, রাম বনবাস, সীতা হরণ প্রভৃতি যাত্রা নাটকে অভিনয় ও বিবেক গান পরিবেশন করে বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেন।'[৪০] সংগীত, যাত্রাভিনয়, কাব্য রচনা ও পারিবারিক পথচলায় কবি জীবনের এক সূর্য সময় পার করে যাচ্ছে। সময়ের অমোঘ নিয়মে আলো-আঁধারের হেয়ালীপনায় বিধির অকরুণ বিচারে হঠাৎ পিতৃ বিয়োগ; মাধ্যমিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ সব কিছু মিলিয়ে মানসিক দিকদর্শনে কবি মন ভাঙনের চাপা কান্না কাঁদতে থাকে। '১৩৩৩ সনে বিজয় সরকার ফরিদপুরের দুর্গাপুর গ্রামের মনোহর সরকারের বাড়িতে কবিগান শিক্ষা করতে যান। বিজয় মনোহর সরকারের নিকট দু'বছর এবং রাজেন সরকারের নিকট এক বছর কবিগান শিক্ষায় অবস্থান করেছিলেন। ছাত্রাবস্থায় বিজয় সরকারকে বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাটাতে হয়েছে। কবিয়ালকে গুরু, এমনকি গুরুর স্ত্রী-পরিজনের কাপড় ধোয়া থেকে গরু-রাখালি পর্যন্ত করতে হতো। ঐ সময় কোথাও গান গেয়ে পারিশ্রমিক পেলেও গুরুকে অবলীলায় দিয়ে দিতে হতো। সে সময়কার কবিয়াল-গুরুদের এটাই ছিলো নিয়ম।

১৩৩৬ সনের ১২ অগ্রহায়ণ রোজ বুধবার মনোহর সরকারের অনুমতি নিয়ে বিজয় সরকার কবিগানের পৃথক দল গঠন করেন। দল গঠনের পর প্রথম গান করেন তিনি ভেন্নাবাড়ি গ্রামের কবিয়াল মহিম সরকারের সঙ্গে। মধুকণ্ঠের অধিকারী বিজয় সরকারের নাম-যশ অল্প দিনে সর্বত্র প্রচারিত হয়। পুরানো কবিদলের কবিয়ালদের বায়না অপেক্ষাকৃত কম হতে থাকে।'[৪১] সংগীতের আমিত্ব বিকাশে কবিয়াল বিজয় সরকার বিভিন্ন জনপদে কবিগান পরিবেশন করতে থাকেন। পাল্লার আসরে বহুবিধ শাস্ত্রজ্ঞানে জ্বলন্ত বহ্নিশিখা রূপে অল্পদিনেই খ্যাতির আলোয় উদ্ভাসিত হন। যৌক্তিক ব্যাখ্যা, ছন্দবদ্ধ শব্দ চয়ন ও সুরের বন্যায় শ্রোতা মনকে ভাসিয়ে দিতে থাকেন।

১৩৪২ সনে বিজয় সরকার বীণাপাণি পান্ডের পাণি গ্রহণ করেন। বীণাপাণি বরিশাল জেলার বড়মগরা গ্রামের শশীভূষণ পান্ডের কন্যা। বীণাপাণি লেখাপড়া জানতেন। তিনি কলিকাতা 'বাণীভবন' ব্রাহ্মসমাজ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। বীণাপাণির গর্ভে বিজয়ের দু'টি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে তারা হলেন— কানন বালা (বুলবুলি) ও মঞ্জুরানী। শেষোক্ত কন্যাটি শিশু বয়সেই মারা যায়। বিজয়ের একমাত্র শ্যালক অক্ষয় কুমার পান্ডের টি.বি. হলে বীণাপাণি বরিশালে ভাইকে সেবাদি করতে গিয়ে ভাই ও বোন দু'জনই পর পর ইহলোক ত্যাগ করেন। বীণাপাণি ১৩৫২ সনের ২৪শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ডুমদীতেই দেহ রাখেন। স্ত্রী বিয়োগের পর

Dhaka University Institutional Repository

বিজয় সরকার লিখলেন, 'তেরশো বাহান্ন সাল, চব্বিশে মাসবেদ, গুরুবারে শুরু হলো বিজয় বীণার ভেদ।'[৪২] প্রথমা স্ত্রী'র বিচ্ছেদ বেদনা কবি মনকে ব্যাকুল করে তোলে। সমস্ত সৃষ্টি কর্মের একটা বড় অংশই শ্রাবণকে ঘিরে, যা তাঁর স্ত্রী বিয়োগের আতিশয্যে রচিত—

'আষাঢ়ের কোন ভেজা পথে এলো ঐ এলো রে
এলো আবার দূরন্ত শ্রাবণ
আমার এমনি দিনে মনের কূলে
লেগেছে ভাঙন॥
চূর্ণি নদীর ঘুর্ণি পাকে যেথা পলো চর
সেই চরেতে বেঁধেছিলাম বসতি এক ঘর
শেষে ভেঙে গেল দিন কয়েক পর
এসে এক প্লাবন॥
মেঠো আগুন নেভেরে জলের ছিটা লেগে
রাবণের চিতা নেভে না শ্রাবণের মেঘে
ও সেই আগুন জ্বলে দ্বিগুণ বেগে
দুঃসহ দাহন॥
শ্রাবণ আসিলো ফিরে একটি বছর পর
ফিরে আসার আশা নাই আর জলে ভাসা ঘর
পাগল বিজয় বলে এমন তর
বিধাতার বাঁধন॥'[৪৩]

প্রিয়া বিয়োগে কবি মনের সমস্ত বাসনা ভঙ্গ হয়েছে। শ্রাবণের বর্ষণ ধারা তাঁর সব সুখ-শান্তিকে ধুয়ে নিয়ে গেছে, যা কবি নিপুণ উপমায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি আরও গেয়েছেন—

'আমার পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনী
একদিন ভাবিনাই মনে
সেকি আমায় ভুলবে কখনে॥
থাকতো পাখি সোনালী খাঁচায়
বলতো কত কি আমায়, বসে রূপালি আড়ায়
স্ফটিকের বাটি ভরে

Dhaka University Institutional Repository

কত খাবার দিতাম থরে থরে

নিঠুর পাখি খাইতো আনমনে॥

.....

পাখির মায়ায় পড়ে কত লোক

পেল আমার মত শোক, সদায় জল ভরা দুই চোখ

অসীম গগণের পাখি

তারে আপন ভেবে কেন ডাকি

পাগল বিজয় কাঁদে বসে বিজনে॥'[৪৪]

কথিত আছে স্ত্রী বিয়োগের সংবাদে কবি তৎক্ষণাৎ আসরে দাঁড়িয়ে এই গান রচনা করেন। অদম্য মেধা শক্তির এই অপূর্ব রূপায়ণ সমস্ত বাংলা সংগীতকে এক অনন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। নান্দনিক সাহিত্য মূল্য, হৃদয় নিংড়ানো সুর সব কিছুর এক পরিপূর্ণ মিলন। পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন'র নক্‌শী কাঁথার মাঠ কাব্য বিশ্লেষণে কবি বিজয় সরকার লিখেছেন—

'নকসী কাঁথার মাঠে রে ভাই

সাজুর ব্যথায় আজও কান্দে

রূপাই মিয়ার বাঁশের বাঁশি॥

সমস্ত জীবদ্দশায় তিনি অসংখ্য গান রচনা করেছেন। ১৯৭১'র মুক্তিযুদ্ধে হানাদার বাহিনী কবির সমস্ত পরিশ্রমকে অগ্নিস্যাৎ করে দেন। দিশেহারা কবি সময়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আবার নতুন দিগন্তে পা বাড়ান। আজ অবধি বিজয় সরকারের প্রায় চারশত'র মতো গান লিখিত হয়েছে।'[৪৫]

'১৩৫৩ সনে ফরিদপুর জেলার সাতপাড় গ্রামের রমেশচন্দ্র বিশ্বাসের কন্যা প্রমদা বিশ্বাসকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। প্রমদার সংসার জীবনে বিজয় সরকার প্রচুর অর্থ উপায় করেছিলেন। তিনি তাঁর কন্যা কাননকে নিজের মতো করে মানুষ করেন। সংসার বিরাগী বিজয় সরকার প্রমদার উপর সংসারের দায়িত্ব দিয়ে চিন্তামুক্ত হয়েছিলেন। প্রমদার গর্ভে বিজয় সরকারের দু'পুত্রের জন্ম হয় কাজল কুমার অধিকারী ও বাদল কুমার অধিকারী।'[৪৬]

জীবনের শেষ সময় অবধি তিনি রামায়ণ ও কবিগান গেয়েছেন; তবে রামায়ণ গান গেয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেননি কখনো। শেষ জীবনে ধর্মকথা ও শাস্ত্রীয় আলোচনা করেই বহু মতদর্শী এই কালজ্ঞ পুরুষ দিনাতিপাত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

‘এই পৃথিবী যেমন আছে তেমনই ঠিক রবে
সুন্দর এই পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে
সেই নগদ তলব তাগিদ পত্র নেমে আসবে যবে॥
আমার যখন মহাঘুমে বুজিবে দুই চোখ
পাড়া-পড়শী প্রতিবেশী পাবে কিছু শোক
শেষে আমিও যে এই পৃথিবীর লোক
ভুলে যাবে সবে॥’[৪৭]

উল্লিখিত গানের বাণীর মধ্যদিয়ে বোঝা যায় তিনি ভাবুক কবি। যিনি এই চিরায়ত সত্য মানুষের মাঝে জীবদ্দশায় উপস্থাপন করে রেখে গেছেন। সত্যিইতো মানুষের যাওয়া কিংবা আসার মাঝে কোনো কিছুই নেই। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ পৃথিবীতে আসে এবং প্রকৃতির নিয়মেই চলে যায়। সব কিছুই অবিকল থেকে যায় যা মানুষের যাওয়া কিংবা আসার উপর নির্ভর করে না; শুধু মানুষের কর্মফল পৃথিবীতে মায়াকারে থেকে যায়। কবিয়াল বিজয় সরকার তেমনই সব অসংখ্য সৃষ্টিকর্মের বহমান স্রোতে সবাইকে অশ্রুজলে ভাসিয়ে ‘১৯৮৫ সনের ৪ ডিসেম্বর রাত ১০.৫৫ মিনিটে’[৪৮] ইহলোক ত্যাগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, *জেলা ঝিনাইদহের লোক কবি ও লোক গান*, গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ২০১৩। পৃ.– ১৬১

২. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১৬০

৩. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১৫৯

৪. সংগ্রহ: মতলেব ফকির, গ্রাম: লেবুতলা, থানা: খাজুরা, জেলা: যশোর। এছাড়া কবির জন্ম এবং মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্যাদি দিয়ে সহযোগীতা করেছেন মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম বাদশাহ, ঝিনাইদহ জেলা বাউল সমিতি।

৫. মুহ.মু'তাছিম বিল্লাহ,মিন্টু, *চারণ কবি পাগলা কানাই*, বেগবতী প্রকাশনী, ঝিনাইদহ, বাংলা-১৪২৩। পৃ.– ২৬

৬. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১৮৪

৭. সাক্ষাৎকার: মতলেব ফকির, গ্রাম: লেবুতলা, থানা: খাজুরা, জেলা: যশোর।

৮. মুহ.মু'তাছিম বিল্লাহ মিন্টু, *চারণ কবি পাগলা কানাই*, বেগবতী প্রকাশনী, ঝিনাইদহ, বাংলা-১৪২৩। পৃ.– ২৭

৯. প্রাগুক্ত, পৃ.– ৩৭

১০. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন (২য় ও ৩য় খণ্ড)*, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ.– ২২৭

১১. আনোয়ারুল ইসলাম, *জেলা ঝিনাইদহের লোক কবি ও লোক গান*, গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। পৃ.– ১৪৮

১২. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১৫০

১৩. খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমী কবি পাঞ্জু শাহ্ জীবন ও কাব্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৯০। পৃ.– ৩

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ.– ২৯

১৫. আনোয়ারুল ইসলাম, *জেলা ঝিনাইদহের লোক কবি ও লোক গান*, গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ২০১৩। পৃ.– ৪৭-৪৮

১৬. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন (২য় ও ৩য় খণ্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮। পৃ.– ৩৪০

১৭. শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: ঝিনাইদহ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ২০১৪। পৃ.– ১২৫

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১২৪-২৫

১৯. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন (২য় ও ৩য় খণ্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮। পৃ.– ৩৪০

২০. খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমী কবি পাঞ্জু শাহ্ জীবন ও কাব্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯০। পৃ.– ৩০

২১. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন (২য় ও ৩য় খণ্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮। পৃ.– ৩৪২

২২. খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমী কবি পাঞ্জু শাহ্ জীবন ও কাব্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯০। পৃ.– ৩১

২৩. আবদুল ওয়াহাব,*বাংলাদেশের লোকগীতি: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন (২য় ও ৩য় খণ্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮। পৃ.– ২৬৮

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ.– ২৬৮

২৫. শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: ঝিনাইদহ*,বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ২০১৪। পৃ.– ১২৮

২৬. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন (২য় ও ৩য় খণ্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮। পৃ.– ২৭৭

২৭. শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: ঝিনাইদহ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ২০১৪। পৃ.–১২৮

২৮. মহসিন হোসাইন, *বৃহত্তর যশোরের লোক কবি ও চারণ কবি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৮। পৃ.– ১০

২৯. কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, *জেলা ঝিনাইদহের লোক কবি ও লোক গান*, গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। পৃ.– ৫৩

৩০. মহসিন হোসাইন, *বৃহত্তর যশোরের লোক কবি ও চারণ কবি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৮। পৃ.– ১০-১১

৩১. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন (২য় ও ৩য় খণ্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮। পৃ.– ২৭০-৭১

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ.– ২৭৪

৩৩. কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, *জেলা ঝিনাইদহের লোক কবি ও লোক গান*, গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। পৃ.– ৫৩-৫৪

৩৪. মহসিন হোসাইন, *বৃহত্তর যশোরের লোককবি ও চারণকবি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৮। পৃ.– ৯৭

৩৫. মহসিন হোসাইন, *কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সঙ্গীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৪। পৃ.– ১১

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১১

৩৭. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার: জীবনী গ্রন্থমালা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৮। পৃ.– ১১

৩৮. মহসিন হোসাইন, *কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সঙ্গীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৪। পৃ.– ১২

৩৯. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার: জীবনী গ্রন্থমালা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৮। পৃ.–১৪

৪০. মহসিন হোসাইন, *বৃহত্তর যশোরের লোককবি ও চারণকবি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৮। পৃ.– ৯৭

৪১. মহসিন হোসাইন, *কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সঙ্গীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৪। পৃ.– ১৪

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ.– ১৫

৪৩. সাক্ষাৎকার: শ্রীমতি মণিমালা বিশ্বাস (প্রখ্যাত লোকশিল্পী, বাংলাদেশ বেতার, খুলনা), ঝিনাইদহ সদর।

৪৪. সাক্ষাৎকার: নিশিকান্ত বৈরাগী (প্রখ্যাত লোকশিল্পী, বাংলাদেশ টেলিভিশন), অভয়নগর, যশোর।

৪৫. সাক্ষাৎকার: কবি পুত্র কাজল কুমার অধিকারী, উত্তর ২৪ পরগনা, ভারত।

৪৬. মহসিন হোসাইন, *কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সঙ্গীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৪। পৃ.– ১৫

৪৭. সাক্ষাৎকার: নিশিকান্ত বৈরাগী, অভয়নগর, যশোর।

৪৮. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার: জীবনী গ্রন্থমালা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৮। পৃ.– ৬২

উপসংহার

মনের পশুত্বকে বিসর্জিত করণের মাধ্যমে সুর আমাদেরকে করেছে পবিত্র। যুগে যুগে মানুষের গ্লানিকে মুছে এক মনোহর জগতের সৃষ্টিদানে মহান মনীষীর বাণী ও সুর সর্বাগ্রে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। গুহাবাসী মানুষের মনের কালিমাকে ঘুচাতে প্রথমত সুর-ই আবিস্কৃত হয়েছে। কালজয়ী সব বাণীর ব্যঞ্জণে যা পেয়েছে প্রাণ রূপে প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান ভু-খণ্ড। সবুজের গন্ধ ভরা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের শেকড়ের সব কালজয়ী বাণীর বন্ধনই জীবন বোধের আলোক বর্তিকা। আর এ বাণীকে সুরের আবর্তে বেঁধে সৃষ্টি হয় গান বা সংগীত। লোকসংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ লোকসংগীত। যা এ সংস্কৃতিকে আবহমান কাল ধরে করে চলেছে সমৃদ্ধ।

লোকসংগীত বলতে লোক মুখে রচিত এবং পরিব্যপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত মনের গানকে বোঝায়। জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতির নানা উপকরণে গঠিত হয় লোকসংগীত। সেজন্য এর বিষয় বৈচিত্র্য অনেক। বাংলাদেশে প্রায় শতাধিক প্রকার লোকগীতি প্রচলিত। এর মধ্যে যশোর জেলায় প্রচলিত কিছু গান যেমন— জারিগান, কবিগান, বাউল গান, ধুয়া গান, জাগগান, অষ্টক গান, বালা গান, পৌষ সংক্রান্তির গান, ফলই গান, হালই গান, এ ছাড়াও রয়েছে নানা ধরণের আঞ্চলিক গান যা আজও এ জেলার লোকসংস্কৃতিকে করে চলেছে সমৃদ্ধ ও বেগবান। গাজীরগান, মানিকপীরের গান, মুর্শিদীগান, কীর্তন গান, ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের গান, ফলই গান, এ্যাঁচড়া পূজার গান, মারফতি গান, দেহতত্ত্ব গান, মতুয়া গান, কাদামাটির গান এ সকল গানগুলো আজ আর তেমন শোনা যায় না। তবে ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের প্রার্থনা সংগীত আজও গাওয়া হয়ে থাকে তাদের প্রার্থনার সময়গুলিতে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এসকল সম্প্রদায়ের লোক তেমন কোনো তথ্যের যোগান দিতে না পারায় গবেষণাকর্মে বেশকিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। প্রতিকূলতার বিষয় বলতে গেলে বলা যায়, সময় স্বল্পতা এবং অর্থনৈতিক বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে যতটুকু সম্ভব ততটুকু উপস্থাপন করা হয়েছে এ গবেষণাকর্মে।

বস্তুতঃ একটি জেলায় প্রচলিত অনেক গান থাকে যে গানগুলো কখনোই সুধী সমাজে স্থান পায় না। উল্লেখ্য, গবেষণার মাধ্যমে তার কিছুটা বিকাশ ঘটানোর প্রত্যয়ে যশোর জেলায় বহুল প্রচলিত আবার কিছু অপ্রচলিত গান নিয়ে এই নিবেদন। বিলুপ্ত প্রায় এই গানগুলো মানসপটে কিছুটা আশা যোগাবে বলে আমার বিশ্বাস। উক্ত গবেষণার মাধ্যমে যশোর জেলার উদ্ভব ও বিকাশসহ লোকসংগীতের ধারার উল্লেখযোগ্য বিলুপ্ত প্রায় গানগুলোর ধারাবাহিকতা, এর সুরবৈশিষ্ট্য এবং লোকবাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার ফলে উঠে এসেছে অনেক তথ্য যা সময়ের আবর্তে হারিয়ে যেতে বসেছে। পরিশেষে বলা যায়, এই গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বদরবারে যশোর জেলার লোকসংগীতকে তুলে ধরাই মূল উদ্দেশ্য। পরবর্তীতে যদি অন্যান্য গবেষকবৃন্দ এ জেলার উপর গবেষণার দৃষ্টি রাখে তাহলে এ জেলার সংগীত অনায়াসে সুধী সমাজে স্থান করে নেবে অতীব গুরুত্বের সাথে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

কাজী আনোয়ারুল ইসলাম : *জেলা ঝিনাইদহের লোক কবি ও লোক গান*, গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩।

অনুপম হীরা মণ্ডল : *ফকির লালন সাঁই: ভাব সাধনা*, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১২।

বুদ্ধদেব রায় (সম্পাদিত) : *শ্রেষ্ঠ কীর্তন স্বরলিপি*, আদিনাথ ব্রাদার্স, কলিকাতা, আগষ্ট, ১৯৯৩।

আবু ইসহাক হোসেন : *বাউল দর্শন ও লালন তত্ত্ব*, প্রচলন প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩।

আবু ইসহাক হোসেন : *বাংলা লোকগান*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮।

আব্দুল ওয়াহাব : *বাংলার বাউল সুফি সাধনা ও সংগীত*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১১।

আবদুল ওয়াহাব সরকার : *বাংলাদেশের লোকগীতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, আগস্ট, ১৯৯৫।

আব্দুল ওয়াহাব : *বাংলাদেশের লোকগীতি: একটি সমাজ তাত্ত্বাতিক অধ্যয়ন*, (প্রথমখণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ২০০৭।

আব্দুল ওয়াহাব : *বাংলাদেশের লোকগীতি: একটি সমাজতাত্ত্বাতিক অধ্যয়ন*, (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮।

মোঃ আব্দুল আজিজ : *বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ইতিবৃত্ত*, অনার্য, ঢাকা, একুশে বইমেলা-২০১১।

আবুল আহসান চৌধুরী : *তিন পাগলের মেলা: লালন, কাঙাল, মোশাররফ*, ডাঙ্গুলিপ্রকাশন, ঢাকা, বইমেলা-২০১৭।

আাহমদ শরীফ : *বাউল তত্ত্ব*,পড়ুয়া প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩।

আতোয়ার রহমান : *উৎসব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৮৫।

আতোয়ার রহমান : *লোককৃতি বিচিত্রা*,বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৯।

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য : *বাংলার লোকসাহিত্য*, কলকাতা-৭০০০৭৩, পঞ্চম সংস্করণ-২০০৪।

ইমাম আহমেদ : *লালনের গান: আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ*, সদর প্রকাশনী, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০০৯।

ওয়াকিল আহমদ : *বাংলা লোকসংগীতঃ ভাওয়াইয়া*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ১৯৯৫।

ওয়াকিল আহমদ : *বাংলা লোকসংগীতের ধারা*, বাতায়ন প্রকাশনা, ঢাকা, আগস্ট, ২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

কনক রঞ্জন দাস : *ব্রত পার্বণে বাঙালি সমাজ*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, একুশে বইমেলা– ২০০৯।

করুণাময় গোস্বমী : *বাংলা গানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৩।

করুণাময় গোস্বমী : *বাংলা গানের কথা*, কলি প্রকাশনী, ঢাকা, একুশে বইমেলা- ২০১৩।

খন্দকার রিয়াজুল ইসলাম : *ভাবসংগীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫।

খন্দকার রিয়াজুল ইসলাম : *মরমী কবি পাঞ্জু শাহ্ জীবন ও কাব্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯০।

জয় কুমার দাস : *বাংলা লোকসাহিত্যে নারী জীবন*, গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮।

তাপস আদিত্য : *কণ্ঠসংগীত (প্রথম খণ্ড)*, সঙ্গীত ভারতী প্রকাশনী, কলিকাতা, মে, ১৯৮৭।

দেবপ্রসাদ দাঁ : *শ্রেষ্ঠ লোক সংগীত স্বরলিপি*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা, জুলাই, ২০০৮।

দেবপ্রসাদ দাঁ : *বাউল সংগীতের নন্দন তত্ত্ব*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা, জুলাই, ২০১২।

দিনেন্দ্র চৌধুরী : *গ্রামীণ গীত সংগ্রহ (১ম খণ্ড)*,তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৯।

দীনেশ চন্দ্র সিংহ : *পূর্ববঙ্গের কবিগান*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৯৩।

দীপিকা ঘোষ : *বাঙালির উৎসব*, গ্রাফোসম্যান, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০১৪।

ননীগোপাল বন্দোপাধ্যায় : *সংগীত দর্শিকা (২য় খণ্ড)*, নাথ ব্রাদার্স, কলিকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ- ১৪০৪।

বাদল অধিকারী (সম্পাদিত) : *বিজয় গীতি*, দি সারদা প্রিন্টার্স, কলিকাতা, ৭ই ফাল্গুন, ১৩৯৩।

বাসন্তী চৌধুরী : *বাংলার বৈষ্ণব সমাজ: সংগীত ও সাহিত্য*, জে এন বসু এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৬৮।

বাসুদেব বিশ্বাস বাবল্া : *দক্ষিণ বঙ্গের লোক সংগীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১২।

শ্রী বুদ্ধদেব রায় : *বাংলা গানে স্বরূপ*, ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৯৯০।

মহসিন হোসাইন : *বৃহত্তর যশোরের লোক কবি ও চারণ কবি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৮।

মাধুরীলতা দাম : *জিতেন্দ্র গীতি*, নড়াইল, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩।

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী : *লোক সংগীত*, প্যাপিরাস, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৯।

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী : বাংলা গানের ধারা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ, ১৯৯৩।

মহসিন হোসাইন : *জীবনী গ্রন্থমালা: বিজয় সরকার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৮।

মহসিন হোসাইন : *কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সংগীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৪।

মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পাদিত) : *লোক সংগীত*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০০৭।

মুস্তাফা মাসুদ : *যশোরের লোক সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৪।

মিলন কান্তি দে : *যাত্রা শিল্পের সেকাল-একাল*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

মুহ. মু'তাছিম বিল্লাহ (মিন্টু) : *চারণ কবি পাগলা কানাই*, বেগবতী প্রকাশনী, ঝিনাইদহ, ১৪২৩বাং।

মোমেন চৌধুরী (সম্পাদিত) : *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৩।

মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী : *তাল তত্ত্বের ক্রম বিকাশ*, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬।

যতীন সরকার : *বাংলাদেশের কবিগান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

রহমান হাবিব : *বাংলা গানের ভাব সম্পদ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ২০০৯।

শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত) : *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: যশোর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ২০১৪।

শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত) : *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: নড়াইল*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ২০১৪।

শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত) : *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমাল: ঝিনাইদহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ২০১৪।

শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত) : *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: মাগুরা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ২০১৪।

শফিকুর রহমান চৌধুরী (সম্পাদিত): *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, অক্টোবর, ১৯৯৪।

শাহিদা খাতুন (সম্পাদিত) : *ফোকলোরসংগ্রহমালা: কবিগান-১*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ২০১০।

সাইমন জাকারিয়া : *কবিগান পরিবেশনাশিল্প*, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭।

সুনীতি ভূষণ কানুনগো : *বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলন*, শান্তি প্রেস, চট্টগ্রাম, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

সুধীন দাস : *লালনগীতি ও স্বরলিপি*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা, মে, ২০০৭।

সুরঞ্জন রায় : *মোসলেমউদ্দিন বয়াতির জারিগান (লোক ধারার পারম্পর্য)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ২০১৩।

সুকুমার রায় : *ভারতীয় সংগীত (ইতিহাস ও পদ্ধতি)*, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫।

মোঃ সোলাইমান আলী সরকার : *বাংলার বাউল দর্শন*, বুক চয়েচ, ঢাকা, ২০০৮।

মোঃ সাইদুর রহমান ও মহসিন হোসাইন (সম্পাদিত) : *কবিয়াল বিজয় সরকারের বিচ্ছেদী ও কবিগান*, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা, মে, ২০১২।

সাইমন জাকারিয়া : *বাংলাদেশের লোকনাটক: বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮।

হাবিবুর রহমান : *বাংলাদেশের লোক সংগীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৮২।

স্বর্গীয় ক্ষিতীশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও ননীগোপাল বন্দোপাধ্যায় : *সংগীত দর্শিকা (১ম খণ্ড)*, তৃতীয় মুদ্রণ, শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম, কলিকাতা, জুলাই, ২০০০।

M.N. MUSTAFA : *OUR MUSIC A HISTORICAL STUDY,* First edition Published by Begum Bula Mustafa, October, 1977.

পত্রিকা ও সাময়িকী

যতীন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদিত) : *শঙ্খ চিল (বিজয় লালন সংখ্যা)*, আড়ংঘাটা, মাস্টারপাড়া, নদীয়া, ভারত, ২০১৪।

স্বরোচিষ সরকার (সম্পাদিত) : *বাংলা একাডেমী বৈশাখী উৎসব ১৪০০*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট– ১

আলোকচিত্র

১. বালাগানের মূল বিষয় পাট ও সন্ন্যাসীগণ (মনিরামপুর, যশোর)।

২. প্রায় দুইশত বছরের পুরানো বাবু অনিল ঘোষের বাড়িরপাট (মনিরামপুর, যশোর)।

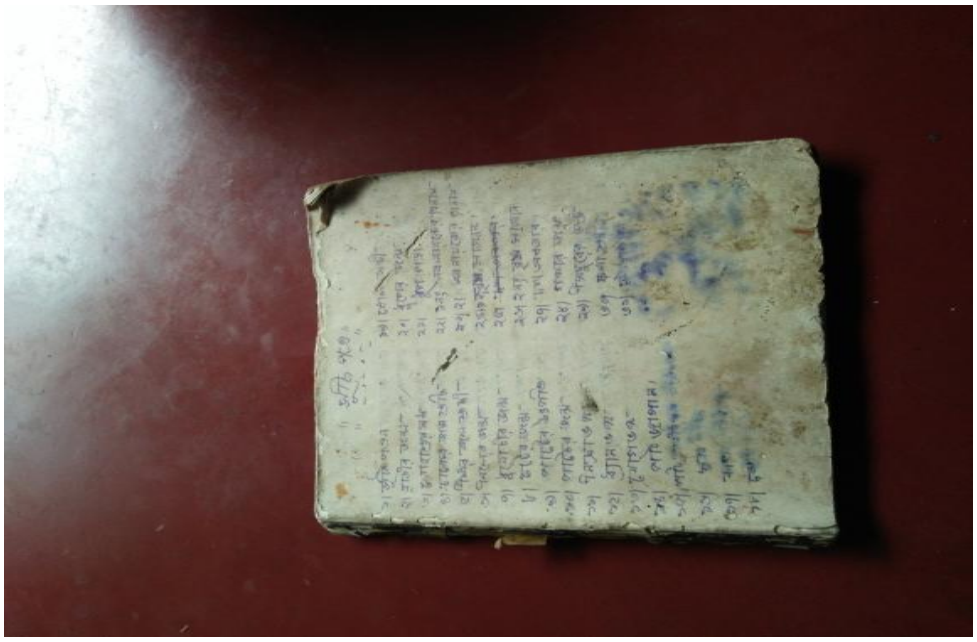

৩. সংগৃহীত বালাগানের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি (আনুমানিক ১৯৬৭ সাল)।

৪.বালা গানের শিল্পী আনন্দ মোহন দত্তের সাথে আলোচনা কালে তার নিজ বাসভবনে।

৫. বালা গানের শিল্পী উৎপল মজুমদার বাচ্চু ও পেছনে অবস্থানরত দেবব্রত ভট্টাচার্য।

৬. ফতেপুর বিশ্বজিৎ বৈরাগীর বাড়িতে হালই গান ও অষ্টক গানের আসরে।

৭. দেবব্রত সরকার এবং প্রদীপ কুমার মল্লিক এর সাথে লোকগান নিয়ে আলাপচারিতার সময়।

৮. লোকশিল্পী অশ্বিনী বৈরাগীর সাথে আলোচনার সময়।

৯. বংশীবাদক বিশ্বজিৎ বৈরাগী এবং দেবব্রত সরকারের সাথে গবেষক।

১০. কাঠি বাদক অসীম বিশ্বাস।

১১. হালই গানের শিল্পী মনোরঞ্জন অধিকারীর সাথে আলাপ কালে।

১২. যাত্রাশিল্পী পূর্ণিমা ভঞ্জ'র সাথে আলাপচারিতার একপর্যায়ে।

১৩. অষ্টক ও হালই শিল্পী ধীরেন্দ্রনাথ মালী গানের আসরের এক পর্যায়ে।

১৪. তবলা শিল্পী অলোক কুমার বসুর সাথে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের একপর্যায়ে গবেষক।

১৫.যাত্রাশিল্পী জ্যোৎস্না দাসের নিজ বাসভবনে সাক্ষাৎ কালে।

১৬. যাত্রাশিল্পী তপন সরকারের সাথে আলাপচারিতার একপর্যায়ে।

১৭. কিংবদন্তী জারি শিল্পী মোঃ মনিরুদ্দিন মোড়ল সাথে প্রবীর দেবনাথ এবং গবেষক।

১৮. স্বপরিবারে যাত্রাশিল্পী অনন্ত দেবনাথ এবং গবেষক।

১৯. জাগগানের শিল্পী চাঁপা রানী দে’ রসঙ্গে পেছনে কৃষ্ণ রায়, ডান থেকে পুলকেশ পাল এবং গবেষক।

২০. মৃদঙ্গ শিল্পী শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ দত্তের মৃত্যুর কিছু কাল পূর্বে গবেষণা কাজে আলাপচারিতা একপর্যায়ে।

২১. বিমল কুমার সরদারের নিজ বাসভবনে আলাপ কালে।

২২. মতুয়া গান এবং লোকগানের শিল্পী চাঁদ সরদার এবং পাশে অবস্থানরত তার কন্যা'র সাথে আলাপ কালে।

২৩. লোকশিল্পী মতলেব ফকিরের ভাব গান পরিবেশনের একপর্যায়ে।

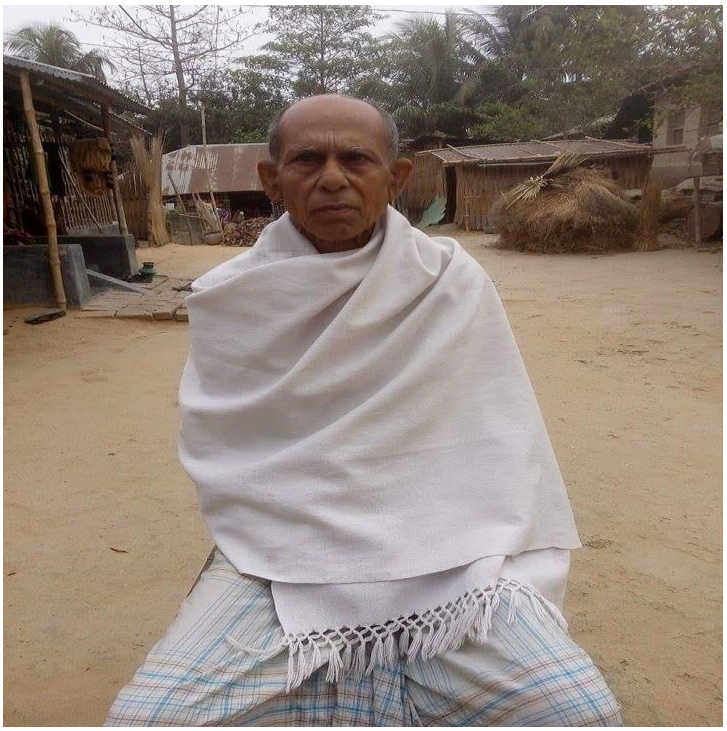

২৪. যাত্রাশিল্পী ও নির্দেশক গিরীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বাড়ির আঙ্গিনায় সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময়।

পরিশিষ্ট-২

সংগৃহীত গান

(১)

বালা গান

বন্দনা

প্রণাম করিলাম ভক্তি আদ্য দেব আদ্য শক্তি
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি দেবা
দিবাকর নিশিপতি, দেবরাজ গণপতি
স্বর্গবাসী দেব পদে সেবা।
প্রণাম করিলাম মনে, কুম্ভু আদি নাগগণে
বলি আদি তলা-তল বাসী
প্রত্যেক দেবতা মত, পৃথিবীতে অবিরত
শিবের চরণে ভক্তি রাখি।
ত্রিগুণ জাতি সতীর বৈষ্ণব নরপতি
জনক জননী দুইজন
গঙ্গা আদি তীর্থ যত, শাস্ত্র আদি ভাগবত
ভক্তি স্তুতি শ্রীগুরু চরণ।
ষোল সাং সন্ন্যাসী বালা লয়ে চরণে ধুলা
সবেমিলে করিয়া বিনয়
শিবের চরণ ধুনি, কেবল বালকের খেলা
শিব পদে প্রণাম নিশ্চয়॥

(২)

সরস্বতীর স্তব

করিয়ে প্রণতি স্তুতি বন্দী দেবী সরস্বতী
বাগীশ্বরী বাক্য প্রদায়িণী।
শ্বেত বর্ণ শ্বেত হাঁস শ্বেত বীণা শ্বেত বাস

শ্বেত জল নিবাসিনী।

বেদ বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র বেণু বীণা আদি যন্ত্র

নৃত্য গীত বাক্যের ঈশ্বরী।

কে আছে ভুবন তিনে তোমার করুণা বিনে

কাহার শক্তি কথা কয়

আমি অতি মূঢ় মতি না জানি ভক্তি স্তুতি

মম প্রতি হও হে সদায়।

(৩)

বালার জন্ম

প্রথম মাসের কালে পড়ে গেল নীর

দ্বিতীয় মাসের কালে নীর হইল স্থির

তৃতীয় মাসের কালে হয় রক্তের গোলা

চতুর্থ মাসের কালে অস্তি সঙ্গে জোড়া

পঞ্চম মাসের কালে পঞ্চ ফুল ফোটে

ষষ্ট মাসের কালে এ জগৎ পাল্টে

সপ্তম মাসের কালে সাতেশ্বরী খায়

অষ্টম মাসের কালে মন পবন যোগায়

নবম মাসের কালে নবগুন স্থিতি

দশম মাসের কালে পিণ্ডের মুক্তি

দশ মাস দশ দিন পূর্ণ হলে পরে

পদ্ম ফুটে তখন ভূমিষ্ঠ হয়ে পড়ে

ভূমিষ্ঠ হয়ে যমের দক্ষিণ দিকে পা

জয় জুপাড় দিয়ে কোলে তুলে নিলেন মা

দাশিনী আসিয়া করে নাড়ীকান ছেদ

নাপিত আসিয়ে করে চূড়া কর্ণ ভেদ

ব্রাহ্মণে আসিয়া করে হোমযজ্ঞ কত

তাহাতে আনিয়া জিলশ্রী ফলের পতি

আমরা বলি শ্রী ফলের পতি বাহ্মণে বলে ফুল।
কাল রুদ্র পূজিয়ে আমার শুদ্ধ মাথার ভুল
মুখ খানি শুদ্ধ আমার গঙ্গার জল পানে
পা দু'খানা শুদ্ধ আমার তীর্থ পজ্ঞাটনে
হস্ত দু'খানা শুদ্ধ আমার দান ধীয়ানে
কর্ণ দু'টি শুদ্ধ আমার দীক্ষামন্ত্র গুণে
চক্ষু দু'টি শুদ্ধ আমার দেব দশাইয়ে
সর্ব শুদ্ধ হইল আমার বারাণসী গিয়ে
আনন্দে শ্রী হরি বল শীব পদ সার
এই বার কর দয়া ভবানী শংঙ্কর।

(৪)

ধুনুচির জন্ম

ঘট কুমার নামে তারা সাতে আটে ভাই
মাটি খানি ছেনে নিয়ে রাখিলেন এক ঠাঁই।
মাটি খানি ছেনে নিয়ে তুলে দিলেন চাকে
ধুনুচি গড়ে দিলাম আড়াইটি পাকে।
ধুনুচির জন্মের কথা শুন মুনিগণ
ধুনুচি শুদ্ধ হইল এখন শ্রী বিষ্ণু স্মরণ॥

(৫)

ধূপের জন্ম

লঙ্কায় জন্মিলেন ধূপ হয়ে গাছের আঠা
হনুমান আনিয়া ধূপ প্রচারিল হেথা।
ধূপ ব্রহ্মা, ধূপ বিষ্ণু, ধূপ মহেশ্বর
লায়েকের কল্যাণে ধূপ হলো দিগম্বর।
ধূপের জন্মের কথা শুন মুনিগণ
ধূপ শুদ্ধ হইল এখন শ্রী বিষ্ণু স্মরণ॥

(৬)

শঙ্খ সৃষ্টি ও শুদ্ধ

ক্ষীরোদ সমুদ্রে জন্মিল শঙ্খ শুন তার কথা

গরুড়ে আনিল শঙ্খ প্রচারিল হেতা॥

শাক জল ভক্ষণ করে শঙ্খথুয়ে থালে

পবন হিল্লোল শঙ্খ রাম নাম বলে॥

শঙ্খ শুনে দেবীর বেড়ে গেল রঙ্গ

বিশ্বকর্মা গড়ে দিল দশকোষী শঙ্খ॥

শঙ্খ পরে মহামায়া হলেন কলেবর

এক শঙ্খের ধ্বনিতে তুষ্ট শঙ্কর ॥

হেন শঙ্খ শুদ্ধ নয় কোনবা নরে বলে

শঙ্খ শুদ্ধ করে বালা ক্ষীর পাত্রের জলে॥

(৭)

ঘন্টার জন্ম

লৌহ কাসা দুই ধাতু করি একোত্তর।

ঘন্টা গড়ে বিশ্বকর্ম্মা হরষিত অন্তর॥

ঘন্টা গড়ে বিশ্ব কর্ম্মা হইলেন সুস্থির।

ঘন্টা পরে তপস্যা করেন গড়ুর মহাবীর॥

বাম করে ধরে বাদ্য করেন দ্বিজবর।

গঙ্গা জলে ঘন্টা শুদ্ধ শুন অতঃপর॥

(৮)

বেতের জন্ম-বেতশুদ্ধ

শুনহ মুণি গণ করি নিবেদন

বেতের জন্ম কথা শুন দিয়া দিয়া মন॥

দক্ষ যজ্ঞ নাশিতে জটা ছেড়েন মহেশ্বর

জটা হতে পড়ে বীচ ধরণী ওপর॥

কৈলাস শিখরে পড়ি বীচ জন্মে দুই পাতা

লতা রূপে বেড়ে যায় নামে বেত লতা॥

লতা রূপে বেড়ে যায় নীল বর্ণ পাতা

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বন্দীলাম তথা॥

সেই বেত কাটি নন্দি গড়িল বেতাসন

ষোল মুটি ষোল কাঠি বেতের বন্ধন॥

বেতের মধ্যে বিষ্ণু অগ্রে স্বরস্বতী

বেত শরীরে বাঁধিলাম হর আর পার্বতী॥

(৯)

মাটি শুদ্ধ

মাটি মায়ের স্থান, মাটি মানবেরে দিয়ে গেলেন বর

পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ ক্ষীরোদ নদী গঙ্গারই সাগর।

মাটিতে উৎপত্তি, মাটিতে নিস্পত্তি, মাটিতে সর্ব শস্য ফলে

মাটি শুদ্ধ করেন বালা নদীকার স্বরে।

গোমূত্র গঙ্গা জল করিয়ে মিশ্রিত

ক্ষীর পাত্র জলে বালা স্থান করে পবিত্র॥

(১০)

টাটের জন্ম

অষ্টধাতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তামা লোকে বলে

তামা-তুলসী হাতে লয়ে মিথ্যা নাইকো বলে॥

তামা দিয়ে বিশ্বকর্ম্মা টাট যে গড়িলো

দেউল হেতু লউ সেন রাজার কাছে দিলো॥

টাট দিয়ে বিশ্বকর্ম্মা বিদায় হয়ে চলে

মহারাজ শিব রাখেন তাম্র টাটের খোলে॥

বালাদার যত্নে কয় ভেবে যোগ পাণি

পাদ পদ্মে স্থান দিও শঙ্কর ভবানী॥

(১১)

ক্ষীর পাত্র শুদ্ধ

শ্রীদেব পালেরা সাতে আটে ভাই
মাটি কাটিয়া তারা থুইল একঠাঁই।
মাটি ছেনিয়া তারা তুলে দিল চাকে
হাঁড়ি, কলসি, ঘট, ধুনুচী গড়িল আড়াইটি পাকে।
সূর্য দিল শুকাইয়া অনলেতে পুড়ি
সে হাঁড়িতে আমরা ক্ষীর-জল ভরি।
এহেন হাড়ি শুদ্ধ নয় কোনবা নরে বলে
হাঁড়ি শুদ্ধ করেন বালা মহেশ্বরের বরে॥

(১২)

জল শুদ্ধ

জল শুদ্ধ, স্থল শুদ্ধ, শুদ্ধ আপন কায়া
ত্রিকোণ পৃথিবী শুদ্ধ, শুদ্ধ মহামায়া।
যখন জল নাহি ছিল এ মহীমণ্ডলে
তখন জল ছিল কেবল ব্রহ্মার কমণ্ডুলে।
ভগীরথ এনে গঙ্গা প্রচার করিল
সেই থেকে গঙ্গা দেবী পৃথিবী ব্যাপীল।
সেই জলে কর এখন ঘট স্থাপন
স্থান প্রণমী আমি সদা শিব পাপং হরং॥

(১৩)

ক্ষীর জল

স্বর্গেতে থাকেন কবিল পর্বতের চরে
নন্দি ভৃঙ্গি দুই ভাই প্রতিপালন করে।
মনুরথ বৎস তার দুগ্ধ করে পান
শুন তবে ক্ষীর জলের জন্মের উপাখ্যান।

মনুরথ বৎস দুগ্ধ পান করে

দুগ্ধ শুদ্ধ হইল তায় বাছুরের মুখে।

গঙ্গা আপন নীর মিশায়ে তখন

ক্ষীরজল করি এখন শ্রী বিষ্ণুর চরণ॥

(১৪)

ঢাকের জন্ম

স্বর্গে ছিল অমৃত ফল রাবণে আনিল

সেই কাষ্ঠ দিয়ে ঢাকের কাড়ী নির্ম্মাইল॥

গোচর্ম দিয়ে ঢাকের করিল ছাউনি

শিবের নিকট বিশ্বকর্মা দিল আনি॥

শিব শক্তি দুই কাঠি তুলে দিলেন হস্তে

জন্মে সাধিল ঢাক শিবায় নমস্তেঃ॥

রাবণে আনিল ঢাক চারি যুগে জানে

ঢাক শুদ্ধ করেন বালা ক্ষীরপাত্রের জলে॥

(১৫)

ঢাক শুদ্ধ

বিশ্বকর্মা কেটে গাছ কুন্দে নির্ম্মাইল

শতেক বাঁধনে ঢাক চামারে ছাইল॥

বাদ্যের কারণে করে স্বরস্বতী জপনি

কবিলের চর্ম দিয়া করিল ছাউনি॥

বাঁশের কুঞ্চি কেটে দিয়াছে তায়

গঙ্গাজলে ঢাক বালা শুদ্ধ করে দেয়॥

(১৬)

শিবের নিদ্রা ভঙ্গ

শিব শিব যোগেশ্বর অনাদি পুরুষ বর

তুমি দেব অখিলের অধিপতি।

অনন্ত আশিক ধর্ম্ম নিরঞ্জন পূর্ণ ব্রহ্ম

তোমা বিনে অন্য নাহি গতি।

কায় মনে এক ভাবে যে জন তোমাকে সেবে

কোনোখানে নাইকো সংশয়

প্রভু রাজ গৃহে রাজ্যেশ্বর ধর্ম রক্ষা চরাচর

লায়েকের হও বরাভয়।

প্রভু যোগনিদ্রা হইল ভঙ্গ সেবকের বাড়িল রঙ্গ

ডাকিয়া কহে নন্দীবরে

তুমি আমার বচন কোনো বৃষটি সাজিয়ে আন

যাব আমি মায়ার সংসারে।

আজ্ঞা পেয়ে নন্দিবর হয়ে অতি শীঘ্রতর

উপহার করি সমস্ত আন

মণিমুক্ত দিয়ে হীরে দিয়ে সব মতিহারে

সাজান বৃষ মনেরই মতন।

ঝালর দিলেন আঁটি করি অতি পরিপাটি

রজতে বাঁধানো চারি খুর॥

(১৭)

শিবের প্রণাম

জয় জয় পশুপতি তুমি অগতির গতি

শশাঙ্কেরে কহে সদা শিব।

সর্বভূত জয় করি মহাযোগী ত্রিপুরারি

তোমার আশ্রয়েতে যত জীব।

তব নামে করি খেলা দেহ ভাসে পদধূলা

অবতীর্ণ হন কাশীশ্বর।

কে বুঝিবে শিবের লীলা জগতে তার খেলা

শিব পদে প্রণাম নিশ্চয়॥

(১৮)

বৃষ সজ্জা

যোগ নিদ্রা হইল ভঙ্গ শিবের বাড়িল রঙ্গ
ডাকিয়া কহে নন্দিবরে।
তুমি আমার বচন শুন, বৃষটি সাজিয়ে আন
যাব আমি শয়ন সংসারে।
আজ্ঞা পেয়ে নন্দিবর হয়ে অতি শীঘ্রতর
উপহার করি স্বস্থান।
মণি মুক্তা দিয়ে হীরে দিয়ে সব মতিহারে
সাজান বৃষ মনেরই মতন।
ঝালর দিলেন আঁটি করি অতি পরিপাটি
রজতে বাঁধানো চারি ক্ষুর।
ধুতুরা পুষ্পের মালা যাতে তুষ্ট হন ভোলা
আর পুষ্প দিলেন প্রচুর।
নন্দি মহা হরষিতে দিলেন বৃষ বিশ্বনাথে
হর্ষ বড় হন মহেশ্বর।
সঙ্গে লয়ে আদ্য শক্তি কার্ত্তিক আর গণপতি
করেন নৃত্য শশাঙ্কের বায়।
শিবের অঙ্গ ঢাকা বাঘ ছালে
হাড়ের মালা গলে ঝোলে।
মাথায় জটা ভুজঙ্গ বেষ্টিত
সঙ্গি গণে যায় ত্বরান্বীত॥

(১৯)

বল্লার চাক

শুন শুন কাল ভোমরা করি নিবেদন।
আজ পাটের উপর আছ তুমি কিসের কারণ॥
এগারো মাস পাট বাণ নিদ্রা শয়ন ঘরে।

চৈত্র মাসে শিবের পূজা ভক্তগণে করে॥

ভোমরা দেখে সন্ন্যাসীগণ ভাবে মনে মন।

বালা বলে সন্ন্যাসীগণ ভাব কি কারণ॥

ভোমরার উপর শিবের সত্য বাণী আছে।

সন্ন্যাসীগণ বল্লার চাক সরাও এক পাশে॥

আনন্দে শ্রী হরি বল শিব পদ সার।

এইবার কর দয়া ভবানী শঙ্কর॥

(২০)

সর্প

শুন শুন কাল ভুজঙ্গ করি নিবেদন

আজ পাটের উপর আছ তুমি কিসের কারণ॥

তুমি তো শিবের সেবক জানে সর্বজন

সন্ন্যাসীরা নিবে পাট এই করেছে পণ॥

তোমাকে দেখিয়ে সন্ন্যাসীদের মনে লাগে ভয়

বালা কে ডেকে তখন সন্ন্যাসীরা কয়॥

সর্প দেখে বালা তখন ভাবে মনে মন

শিব শিব বলে বালা ডাকে যে তখন॥

শিব বলে ওগো বালা চিন্তা কর কিসে

পাট ছেড়ে সর্প এখন চলে যাবে এক পাশে॥

আনন্দে শ্রী হরি বল শিব পদ সার

এই বার কর দয়া ভবানী শঙ্কর॥

(২১)

পাট জাগানো

এই তো চৈত্র মধুমাস নিরামিষ্য হবিষ্য ফলে উপবাস

ষোল সাং সন্ন্যাসী সাজিলো, বালা গেলেন শিবের পাশ।

শিব শিব বলে বালা ডাকে ক্ষণে-ক্ষণ

সমাধি ভাঙ্গিল শিবের নড়িল আসন।

নড়িল আসন শিবের নিদ্রা হইল ভঙ্গ
নর মানবের খেলা দেখে নানা রঙ্গ।
এতো বলি গা তোল গা তোল শুন শূলপাণি
নানাবিধ বাদ্য বাজে পূজার কাহিনী।
সুন্দর জটাধারী তুমি মহামুনি
অখিলের নাথ প্রভু কি বলিতে পারি।
অখিলের ছাড়িলে তোমার অন্য নাই মন
ঝাটু করি আইস প্রভু ত্বরিক শমন।
এতো বলি গা তোল গা তোল শুন শূলপাণি
নানা বিধ বাদ্য বাজে পূজার কাহিনী ॥

(২২)

পাটের জন্ম

নাচিল পাট, নাচিল মাঠ, নাচিল সিংহাসন
কোথা হইতে আইল পাট কাহারই আসন।
মহেশের আসন পাট ছুতারে চাঁচিয়া আনে
দেউল সৃষ্টি নিরঞ্জন ত্রি-জগতে জানে।
ত্রিশুলেতে হানা পাট কাটা তিন সারি
শুষ্ক বস্ত্র দিয়ে পাট বেনারসী ঝাঁপি
পাটবান ঝাঁপি আর ঝাঁপি চৌসারি
সরোবরের কূলে নিয়ে পাটের করি স্নান
স্নানে যাবেন ত্রিজগতের নাথ সদা শিব
পাপং হরং॥

(২৩)

সৃষ্টি পত্তন

নাহি ছিল রবি শশী সন্ন্যাসী তপস্বী ঋষি
নাহি ছিল এমনি সুন্দর।
যত কিছু দেবগণ নাহি ছিল একজন

সর্ব শূণ্য ছিল নৈরাকার।

অঙ্গশূণ্য নিরঞ্জন দিকশূণ্য ত্রিভুবন

সর্ব ছায়া মায়া।

থাকিয়া জলের পরে ভাসিতে নৈরাকারে

মহা প্রভু হইয়ে উপকায়া।

শূন্যতং যুতং যুত হুংকারে মিলিতং নূত

ডিম্বরূপে ভাসেন ভগবান।

উল্লুক জন্মিলেন তাই বিপরীত বিকট কায়

দেখে প্রভু হইলেন সচেতন।

শুনিয়া উল্লুকের বাণী অনুধ্যান মনে গুনি

সমধিক করি সচেতন।

হুংকারে মেখলা চাপি রাখিলেন অঙ্গ চাপি

তাহাতে হইল ত্রিভুবন।

বাম অঙ্গে ভগবতী হইলেন উৎপত্তি

পুরুষ প্রকৃতি নামধরি।

পূর্ব দিকে পূর্বেশ্বর গেলেন দেবী শেষ উত্তর

পশ্চিমে পশ্চাতে বিহারী।

দক্ষিণে ধাইলেন বেগে মহাদেবী মহারাগে

দেখিয়ে দেব ততক্ষণ।

নখাঘাতে অঙ্গ চিরী করিলেন প্রকৃতি ধারী

তাহে হয় যুগল মিলন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন দেব সহোদর

আনন্দেতে করিলেন বিহার।

তিন কোণ হইল স্থিতি নাম হইল বসুমতী

তাহে ধরে এ মেরু সুন্দর।

আনন্দে শ্রী হরি বল শিব পদ সার

এই বার কর দয়া ভবানী শঙ্কর॥

(২৪)

দেউল পত্তন

সমুদ্রের কূলে স্থান তীর্থ বারাণসী
তথায় বসি স্তব করে ষাট সহস্র ঋষি।
স্তব করেন মুনিগণ ভাবিয়ে নিরঞ্জন
ধৃতমুনি করিলেন দেউল মণ্ডপ স্থাপন।
পূর্বে লাওসেন রাজা পূজা করেছিল
সেই হইতে দেউল পূজা প্রচার হইল।
হনুমানে মোড়া মারে দানবে বয় ইটে
স্থলে কোদাল মেরে ভীম বেঁধেছিল ভিটে।
পঞ্চানন আনিয়ে যোগায় বীর হনুমান
বিশ্বকর্মা কেটে তাহা করে মণিমান।
মণ্ডপের চারিদিকে চারটি থাম
তাহে গজ মুক্তার ঝালর দেউল নির্মাণ।
মহাদেবের দেউল করেন ধৃতমুনি
স্বর্গ-মর্ত-পাতালে হইল দেব পূজা জানি।
সত্য যুগে দক্ষমুনি বাশুলী করিল
ত্রেতায় নন্দী বালা তথায় আসিল।
দ্বাপরে বালা দেব কার্ত্তিক কহিলো
কলিতে নর বালা ভক্তিতে পূজিল।
আনন্দে শ্রীহরি বল শিব পদ সার
এই বার কর দয়া ভাবানী শঙ্কর॥

(২৫)

আসন শুদ্ধ

কুম্ভপৃষ্ঠে উপবিষ্টে আছেন ধরণী
মায়ের কোলে মুখে খেলে জগতের প্রাণী।
যে আসনে বসিবেন দেব ত্রিলোচন
মহাদেবের বরে শুদ্ধ হোক সে আসন॥

(২৬)

অভিষেক

ভক্তি যুক্ত হয়ে নর ত্রিভুবন মাঝে।
ভাবিয়ে শিবের দেউল পাদ পদ্মে পূজে॥
তিষ্ট-হৃষ্ট এই গৃহে দেব মহেশ্বর।
যাহার কল্যাণে দেউল তাহার দাও বর॥
সিদ্ধ হোক তাহার মনের মানস।
সেই পূণ্যে হোক তাহার স্বর্গেতে নিবাস॥
শঙ্খ ঘন্টা জয়ধ্বনী বাজে চতুর্দিকে।
অভিষেক করেন শিবের বালা পুরোহিতে॥
মহিমা জানিলাম শিবের ভজিলাম চরণ।
দয়া কর মহাপ্রভু লইলাম স্মরণ॥

(২৭)

চতুর্দিক বন্দনা

ক. পূর্বদিক প্রণাম

পূর্বে প্রণাম হই সূর্যদেব অখিল অধিপতি
সপ্তঅশ্ব বাহন যার অরুণ সারথী।
একদিন গেলেন ব্রহ্মা পর্বত শিখর
সপ্তম দিবসের নিশি না হইল ভোর।
(এই) শ্রী সূর্যদেব দেউলকে দিবেন বর
জন্ম জন্ম রহে ভক্তি শিবের কিংকর॥

খ. উত্তর দিক প্রণাম

উত্তরে প্রণাম হই শ্রী পর্বত হিমালয়
কৈলাস শিখরে যথা শিবের আলয়।
একদিন গেলেন ব্রহ্মা পর্বত শিখর
সপ্তম দিবসে নিশি না হইল ভোর।
একদিন গেলেন ব্রহ্মা পর্বত সাধনে

পঞ্চম রসতে গায় গান পঞ্চাননে।

গান শুনে মহাবিষ্ণুর চরণ ঘামিল

স্রোতস্বতী গঙ্গার জন্ম তখনই হইল।

(এই) শ্রী হিমালয় পর্বত দেউল কে দিবেন বর

জন্ম জন্ম রহে ভক্তি শিবের কিংকর॥

গ. পশ্চিম দিক

পশ্চিমে প্রণাম করি শ্রী ঠাকুর জগন্নাথ

মহাপ্রসাদ বলে নরে কিনে খায় ভাত।

জগন্নাথের লীলা কভু বোঝা নাহি যায়

চণ্ডালে রাঁধিলে অন্ন ব্রাহ্মনেতে খায়।

তার একটি অন্ন যদি কাকে লয়ে যায়

চতুর্মুখী হয়ে ব্রহ্মা পশ্চাতে উড়ায়।

(এই) শ্রী জগন্নাথ দেউল কে দিবেন বর

জন্ম জন্ম রহে ভক্তি শিবের কিংকর॥

ঘ. দক্ষিণ দিক

দক্ষিণে প্রণাম করি শ্রী মায়া গঙ্গা সাগর

যার এক কণিকা স্পর্শিলে উদ্ধার হয় নরগণ।

আপনি সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব মান্ধাতা

যার এক কণিকা স্পর্শিলে ভাগীরথ পায় ব্যথা।

ভাগীরথকে দয়া করিলে শতমুখী হয়ে

এক কণিকা পাবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু রয় চেয়ে।

(এই) শ্রী মায়া গঙ্গা সাগর দেউলকে দিবেন বর

জন্ম জন্ম রহে ভক্তি শিবের কিংকর॥

(২৮)

সর্ব দেবের বন্দনা

আদি-অনাদি বন্দন ধর্ম নিরঞ্জন

গুরু পদে রহে ভক্তি দৃঢ় করি মন।

গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু মহেশ্বর

যে গুরু ভজিলে পাব বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর।

না জানি স্তব, না জানি জপ, না জানি ভক্তি

ঊর্ধ্বে প্রণাম হই শুনুন পশুপতি॥

(২৯)

পাটের নিদ্রা ভঙ্গ

এগারো মাস ছিলেরে পাট শয়ন নিদ্রা ঘরে

চৈত্র মধুমাসে শিব পূজা ভক্তগণে করে।

নিদ্রা ভাঙ্গি উঠ পাট ভক্তের কারণ

বসিবেন তোমার উপর দেব ত্রিলোচন।

আনন্দে শ্রীহরি বল শিব পদসার

এইবার কর দয়া ভবানী শংকর॥

(৩০)

পাটের প্রণাম

শশাংক শেখর দেব গঙ্গাধর

ভূত না'কো প্রজাপতি

পিনাক ধরণী বিঘ্ন বিনাশিনী

তুমি অগতির গতি

সেবক তোমায় ডাকে বারে বার

আশুতোষ কর দয়া

তোমার কিংকর ডাকে বারে বার

দেহ মোর পদ ছায়া॥

(৩১)

সন্ন্যাসী ঘাটানো

পবিত্র তোমার দেহ তুমি মহাশয়া

পাটবাণ জেগে ওঠে শিবের কৃপায়।

সপ্ত জিহ্বা অগ্নি তোমার নাম হুতাশন

হোমযজ্ঞ পাত্র চরু কর গো শোধন।

বড়বা পূজা দাও জলে স্থলে

আনন্দে আকুতি করে মহাদেবের বরে।

দেব করে গাল বাদ্য দেবী জয়ধ্বনি

আনন্দে আহুতি করে নারদ মহামুনি।

মহাদেব যার করিয়া স্মরণ

যত থাকে পাপ মোর হবে তো মোচন॥

(৩২)

ষোল সাং শুদ্ধ

যে জন দেউল করে প্রথমে স্থাপিত তারে

দ্বিতীয়ায় সাং পুরোহিতে

তৃতীয়ায় নন্দি বালা চতুর্থায় সন্ন্যাসী দিলা

বাশুলী হইলো পঞ্চমেতে।

সাং পৃষ্ঠে বেতাসন সপ্তমে ধুনুচী হন

অষ্টমেতে ক্ষীর পাত্র স্থির

শ্রী শ্রী ফলের কাঠ নবমেতে হইল পাট

দশমেতে হইল গাম্ভারি।

একাদশে নীল পূজা দ্বাদশে হাজরা

ত্রয়োদশে বীর হনুমান।

চতুর্দশে পুষ্প কর পঞ্চদশে বানেশ্বর

ষষ্ঠদশে কুন্তির নন্দন।

বগলাক বড়শীবান ষোল সাং সমাধান

সাং শুদ্ধ গুরুর চরণ॥

(৩৩)

বৃষ সাজন

নন্দিকে ডাকিয়া বলে দেব ত্রিলোচন

শীঘ্র করি আন বৃষ, করিয়ে সাজন।

Dhaka University Institutional Repository

এই কথা শুনে তখন নন্দিবীর চলে
বৃষ সাজানো শ্বেত নেত্র চামর গঙ্গা জলে।
বৃষটি সাজায়ে তখন নন্দিবীর নাচে
সাজানো বৃষ এনে দিলেন মহাদেবের কাছে।
সাজানো বৃষ পেয়ে শিব অতি তুষ্টমতি
বৃষ পৃষ্টে আরোহণ করেন পশুপতি।
বৃষেতে উঠিয়া চলেন দেব পরম রঙ্গে
হেন কালে হইল দেখা কুচনীর সঙ্গে।
কুচনীর সাক্ষাৎ করি দেব ত্রিপুরারী
জলকেলি করিতে শিব চলিলেন ত্বরা করি।
আনন্দে শ্রী হরি বল শিব পদসার
এই বার কর দয়া ভবানী শঙ্কর॥

(৩৪)

অষ্টক গান

আসর বন্দনা

(মিলিত কণ্ঠে)

বন্দে মাতা ভগবতী এই আসরের করগো গতি
ওগো মা॥
আমি না জানি সাধন না জানি ভজন
নিজ গুনে করগো কৃপা
ওগো মা॥
নবগঙ্গার দক্ষিণ ধারে বসত করি পণ্ডিতপুর গ্রামে
মাগো তোমার সন্তান গণেশ, কার্ত্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী
ওগো মা॥

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টক পালা

নৌকা বিলাস

তুমি শুনো শুনো ঘাটের নাবিক বলি যে তোমারে
অষ্ট সখী পারে যাবে, নৌকা আনো কিনারে
দধী-দুগ্ধ বিকাইয়ে গো।
আমরা যাব মথুরায়, আমরা যাব মথুরায়॥ (মিলন)
নাবিক ধীরে ধীরে নৌকা নিয়ে এলো কিনারায়
সখী গণের সঙ্গে রঙ্গে হেসে কথা কয়
পারের কড়ি আগে দাও আমায়
নৈলে পারে যাওয়া দায়॥ (মিলন)
আমরা নিত্য যায় মথুরার হাটে করতে বেচাকেনা
অগ্রে নাহি দিয়ে থাকি মোরা পারের দেনা
তুমি আবার কেমন কর্ণধার
কেন কথা রাখ না॥ (মিলন)

কৃষ্ণ কথা : দেখ সখীগণ, এখন আমি তোমাদের পার করতে পারব না। আর আমি বাকিও পার করি না। তবে আমার একটি কথা আছে। একে তো আমার ভাঙ্গা তরী, তাতে তোমরা সঙ্গী ভারি, তাই বলছি, আমার তরীতে এক মণ ছাড়া দুই মণ ধরেনা।

কৃষ্ণ গীত : এক মণেতে ওজন ভারী
দুই মণ দিলে হয় গো ভারী॥

কৃষ্ণ কথা : তাই বলছি, পারের কড়ি দাও, তাহলে পার করে দিচ্ছি।

বৃন্দে গীত : আমরা যতো ব্রজের নারী
পার হতে যমুনা ভারি
আমরা পারের কড়ি দিব পরে
বেচাকেনা করে এসে॥

কৃষ্ণ কথা : দেখ সখীগণ, পারের কড়ি না দিলে কিছুতেই আমি তোমাদের পার করতে পারব না।

বৃন্দে কথা : ওহে নাবিক, আমরা অষ্টসখী, তাই আমাদের কাছে এখন মাত্র আট আনা আছে, তা না হয় তোমাকে দিচ্ছি, তাহলে হবে তো?

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্ণ গীত : আট আনায় হবে না।

টানে টানে না টানিলে,

আট আনায় হবে না॥

বৃন্দে কথা : আচ্ছা নাবিক, আরও না হয় চার আনা দিচ্ছি, তাহলে হবে তো?

কৃষ্ণ কথা : না না না তাতেও হবে না।

বৃন্দে কথা : তাহলে কত হলে হবে? তাই বল।

কৃষ্ণ গীত : ষোল আনা হওয়া চাই

রতি পয়সা কম না পড়ে

ষোল আনা হওয়া চাই॥

বৃন্দে কথা : তাহলে আমাদের পার করবে না?

কৃষ্ণ কথা : হ্যাঁ, পার করতে পারি; তবে তার মধ্যে একটা কথা আছে।

বৃন্দে কথা : আবার কী কথা?

কৃষ্ণ গীত : সব সখীরে পার করিতে নেব আনা আনা

শ্রী রাধিকারে পার করিতে নেব কানের সোনা

সখী গো দিলে পারে কানের সোনা,

পারে যেতে নাইকো মানা॥

বৃন্দে গীত : পার কর হে সুজন নায়ে

হাটের বেলা যাইগো বয়ে

দাওনা ত্বরা পার করিয়ে

দধি দুগ্ধ যাই বেচিতে॥

রাধার কথা : দেখ সখী, আর কি কোনো পারের ঘাট নেই? চল আমরা সেই ঘাটে যায়।

বৃন্দে কথা : কেন রাধে? ঘাট অনেক আছে, কিন্তু থাকলেই কি হবে?

বৃন্দে গীত : কোন ঘাটে পার হবি যেয়ে

সকল ঘাটের একই নেয়ে।

ভবের ঘাটের তরী লয়ে

পার করে দেয় অন্তিম কালে॥

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্ণ কথা : দেখ সখীগণ, যদি পারে যেতে চাও তাহলে নৌকায় উঠে বস।

বৃন্দে কথা : আয় লো সখীগণ, নৌকায় উঠে বসি। এখন চালাও মাঝি তোমার নৌকা।

কৃষ্ণ কথা : দেখ সখীগণ, দেখতে দেখতে আকাশ যে কালো মেঘে ছেয়ে গেল, শেষে কি ঐ যমুনার মাঝে আমার ভাঙ্গা তরী খানি ডুবে যায়! ঐ বুঝি মেঘ এসে পড়ল।

সখীরা : তাহলে এখন উপায়?

কৃষ্ণ কথা : উপায় একটা আছে। ঐ যে নীল শাড়ি পরে নৌকার মধ্যে যে সখী বসে আছে, ওর নীল শাড়ি খুলে যমুনার জলে ভাসিয়ে দাও। তাহলে দেখবে মেঘের অবসান ঘটবে।

রাধা কথা : ওমা! নাবিকের কথার শ্রী শোন। শাড়ি খুলে কি আমি ল্যাংটা হয়ে বসে থাকব? এই লজ্জা পাওয়ার চেয়ে মরাও ভালো।

কৃষ্ণ কথা : রাগ করো না, রাগ করো না সখী। কারণ ল্যাংটা হওয়াতে কোনো দোষ নেই, তাই বলছি শোন—

কৃষ্ণ গীত : আমি ল্যাংটা বড় ভালবাসি
ল্যাংটা আমার এলোকেশী
ল্যাংটা ভবে আশা-যাওয়া
এই তো ভবের লেনা-দেনা॥

বৃন্দে কথা : ওহে নাবিক, শাড়ির রং যদি মেঘের রং হয়, তাহলে তোমারও তো শ্যাম সুন্দর রূপ দেখে আকাশের কালো মেঘ ঢাকতে পারে। বিশ্বাস না হয় নিজের রূপটা নিজের চোখে দেখে নাও, তাহলে বুঝতে পারবে। তাই বলছি নাবিক, তুমি যতোই চতুর হওনা কেন, তুমি হয়তো জাননা, আমার নামও বৃন্দে, হ্যাঁ...।

বৃন্দে গীত : তোমার চিনতে আর বাকি নেই
তুমি যে সেই নন্দের কানাই॥

বৃন্দে কথা : দাঁড়াও চাতুরিয়া। চাতুরিটা ঘুচিয়ে দিচ্ছি। দেখ সখীগণ, তোরা এক কাজ কর।

সখীরা : কি কাজ করতে হবে বৃন্দে?

বৃন্দেগীত : মাথায় দেব ঘোল ঢালিয়ে
শ্যাম রূপ যাক ওর সাদা হয়ে
দেখুক বুঝে কেমন সাজা।

কৃষ্ণ কথা : তাহলে দাঁড়াও সখীগণ, আমি তোমাদের মজা দেখাচ্ছি—

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্ণ গীত : আমার তরী ডুবাইয়া দিব গো
তোমাদেরও জল খাওয়াব
কোনো কথা শুনবো না তো॥

বৃন্দে কথা : সত্য সত্যই তরী যে ডুবে গেল।

বৃন্দে কথা : কেন লো রাই বিনোদিনী, খুলিয়া নীল শাড়ি ঐ যমুনার জলে করে লজ্জা নিবারণ, মোদের আশা হবে পূরণ, যুগল মিলন হবে যমুনায়।

সকলে কর জোড়ে: কোথায় হে প্রাণ কৃষ্ণ কোথায় তুমি প্রাণনাথ, কোথায় তুমি ভবপারের কর্ণধার, আজ যমুনার জলে কর পরিত্রাণ। সেদিন রাধা-কৃষ্ণের হলো যখন যমুনায় মিলন। যুগল পদ গঙ্গা দেবী শিরে করিলেন ধারণ। কেন্দে নিরাপদ বলে গো, অন্তে পায় যেন চরণ।

(৩৫)

অষ্টক পালা

নিধুবনে কৃষ্ণ-কালী

(মিলিত কণ্ঠে)

নিশি হলো ভোর ও বউ খোল দোর

ডাকে বনের পাখি, ডাকে তমাল শাখে।

ভোর লগনে গগণ পরী, তখন শিমুল বরণ শাখে

তখন ধেনু বৎস সাজাইয়া, মোহন বেণু বাজাইয়া রে

চলে নন্দের কানু বৃন্দাবনের পথে রে রাখাল কিশোর

চরায় ধেনু তমাল বনের বাঁকে॥

মিলন গীত : তাতে, মলয় হাওয়ায় ঝরা ফুলের মেলায় রে

সুরের অলি কান্দে ফুল শাখে॥

রাধা গীত : বেলা অবেলা কভু নিরালা

গাঁয়ের রাখাল রে তোর বাঁশি কেনে বাজে॥

ফুল ছাড়িয়া কান্দেরে অলি ফুলের কলি মরে লাজে

বাঁশি জানেনা যে মোর হিয়া কি যেন কি যাই রে॥

আমার ঘুম আসে না মন বসেনা কাজে রে

রাখাল কিশোর অবেলায় তোর বাঁশি কেন বাজে॥

সহিতে না পারিরে রাখাল কহিতে না পারি

আমায় দেওয়ানা করেছে রে তোর বাঁশের বাঁশি॥

কৃষ্ণ গীত : আমি তো গাঁয়ের রাখাল গো সখী, গাঁয়ের পথে আসি যাই।

মাঠে মাঠে চরাই গরু তরু তলে বাঁশরী বাজাই॥

রাধা গীত : চাঁদের সুধা পড়ে ঝরে গো, রাখাল তোরই বাঁশির সুরে।

আমার বনে ফাগুন কান্দে, মাধবীরা মরে ঝরে ঝরে॥

কৃষ্ণ গীত : তোমার চোখে সন্ধ্যা তারা গো, ফুলের হাসি ভুবন জুড়ে।

আমার বুকে মরু তৃষ্ণা, আগুন হাওয়ায় ফাগুন পুড়ে মরে॥

রাধা গীত : কার বা বাড়ি থাকো রাখাল গো, রাখাল কার বা রাখো ধেনু।
কার বা বাড়ির পানতা খেয়ে, কিসের সুখে বাজাও বাঁশের বাঁশি॥

কৃষ্ণ গীত : গোয়াল পাড়ায় থাকি আমি গো, সখী যাই না কারো বাড়ি।
মায়ের বাড়ি খাই দুধ-পানতা, মামার বাড়ি ভাঙ্গি দইয়ের হাঁড়ি॥

রাধা গীত : ষোলশত অষ্টসখী গো, এই বৃন্দাবনবাসী
আর কি বাঁশি নাম জানে না, বলে শুধু রাধা কলঙ্কিনী॥

কৃষ্ণ গীত : কেউ বা শোনে রাধা রাধা গো, সখী কেউ বা মরে লাজে।
আমি তো জানিনা সখী, আমার বাঁশি কার কানে কি বাজে॥

রাধা গীত : আর বাজাইওনা বাঁশের বাঁশি গো, রাখাল সারা দিন-রজনী।
আর খেওনা হাঁড়ি ভেঙ্গে, রোজ সকালে আমি দেব ননী॥

মিলন গীত : ও তুই সর্বনাশা বাঁশের বাঁশি, রাখাল রে বাজাসনে সকাল-সাঁঝে।

রাধা : মেরো না মেরো না ননদী, হতভাগাকে আচ্ছা মতো পিটিয়ে দাও। দেখ না, আমার সাজানো বাগানের ফুলগুলো সব চুরি করে নিয়ে গেল।

কুটিলা : ছোড়া মানুষ, ছিড়তেই তো পারে। ওই ছিড়ে নিল, না তুই ছিড়ে দিলি?

রাধা : আমার সাজানো বাগানের ফুল। আমি ই.....!

কুটিলা : ফুল নয় ফুল নয়, বল তোর জাত কুল। বেহানের সার বেহানে, শাক দিয়ে আর মাছ ঢেকো না।

কুটিলার গীত : ওলো পাকা চোর এ সব নিলা (লীলা) তোর
এই লোক সমাজে কয়দিন (কতদিন) রাখবি ঢেকে।
তিন দিনের চাঁদ দুয়োরে বসে
ও চাঁদ দেখে সর্ব লোকে।
বুঝি এ কথা জানেনা কেউ
গাঙ্গে মরে গাঙ্গের ঢেউ রে॥
আজ সাত সকালে দেখলাম নিজের চোখে রে
কুল মজানী, সাধে কি আর পাড়ার লোকে বলে॥

রাধা : পাড়ার লোকে কি বলে ননদী?

Dhaka University Institutional Repository

কুটিলা : আহ! কচি খুকি, ভাল মানুষ তুলসীর বিচি কিছুই জানে না। কত বড় ঘুঘু দেখেছো, তুই ভাবিস আমি ডুবে ডুবে জল খাই? অমাবস্যার বাবাও টের পায় না?

কুটিলার গীত : চোখ ঢাকা তোর ঘোমটাতে
মন থাকে তোর কোনঠাতে।
তোর মতো বউ দেখিনাই গোকুলে
সাঁতার কাটিস এ কূল ঔ কূল
ভেজে না তোর মাথার চুল।
ভাগ্নের নিয়ে করিস কত নিলা (ও বউ লো...)
তোর মত বউ দেখি নাই গোকুলে॥

রাধা : ননদী, কারও বাড়ি যাই না, কারও পানে চাই না। গোকুল বৃন্দাবনের সারা নগরের কেউ আমাকে মন্দ বলতে পারে না। তোমার চোখে কী এত মন্দ?

কুটিলা : মাগীর কথার ছিরি শোনছো? বলি, আমি মন্দ বলতে যাব কেন? এ পাড়ায় যাই তোর কথা, ও পাড়ায় যাই তোর কথা, ঘাটে-মাঠে যেখানে যাই সেখানেই তোর কেষ্টা পিরিতের কথা।

রাধা : তুমি বাজাও, তুমিই শোন নইলে!

কুটিলা : ঢোক গিলছিস কেন রে? উনোন মুখে মিথ্যা কথা বলতে তোর মুখে একটুও আটকায় না? আর বলিস তোর নামে পাড়ায় পাড়ায় নিন্দে করেছি?

ঝাঁটার বাড়ি.....

রাধার গীত : হাড় হলো মোর গুড়া গুড়া, তাতে নাই মোর দুখ্
কৃষ্ণ কলঙ্কিনী বলে পোড়াইলি মোর মুখ॥

কুটিলা : মা গো মা! বউ দেখেছি কত লোকের, এমন বজ্জাত বউ কারও ঘরে দেখিনি।

কুটিলার গীত : শিকের পরে ননীর হাঁড়ি গো,
সেথায় ঠাকুর নামে রাখি।
সেই ননী তোর নাগরকে
বল চুরি করে আর খাওয়াবি নাকি?

রাধার গীত : কার ননী কার দেবতায় খায় গো
ও তার কি বলিবো আমি

Dhaka University Institutional Repository

কার ঘরে কি হলো চুরি

চুরির কথা জানে অন্তর্যামী॥

কুটিলার গীত : আমি বলি যাসনে জলে গো

করি ঘাটে যেতে মানা।

আর শুনিসনে কালার বাঁশি

তবু, বউয়ের কদম তলায় যানা॥

কুটিলার প্রস্থান.....

রাধার গীত : আমি সুখের লাগিয়া ঘর বাঁধিলাম গো

এই কৃষ্ণ তমাল তলে

অনলে পুড়িলো সে ঘর

প্রাণ বন্ধু এই ছিল যে মোর ভালে॥

মিলন : মরলো আশার তরু করলো উজাড় মোর

আমার জীবন ধারার ঝর্ণাকে॥

কৃষ্ণ গীত : সেজে লুকোচোর খেললাম বেলা ভোর

সেজে চুপিসারে এলাম নিধুবনে

চম্পা কলির হাসি দেখে

পড়ে কার হাসি মুখ মনে।

সে যে চম্পক বরণী রায়

এ রংয়ের যে গন্ধ নাই রে

সে যে আয়ান ভাষায় আয়ান গৃহে

কে নে রাই কমলিনী

প্রাণ বাঁচে না তবু অদরশনে॥

কৃষ্ণ : ও গো তুমি কি চম্পা বনের ফুল? তোমাকে দেখে কেনো আমার মনের কথা মুকুল হয়ে জেগে ওঠে?

কৃষ্ণ গীত : কাঠ ফাটা রোদ বুকেরে তোর, মুখে শুধু হাসি

সূর্যের সাথে এতই কি রে, তোর ভালবাসাবাসি॥

কৃষ্ণ : ও গো চম্পা তুমি কি আমার রাধাকে একটা খবর দিতে পারবে? (না) তুমি পারবে না। কারণ তুমি জড় জগতের বন্দিনী। আমার বাঁশি, তুই কি আমার প্রাণের সুরটাকে তার কানে পৌঁছে দিতে পারবি?

কৃষ্ণ গীত : একবার বাজরে বাঁশি বাজ
আমার রাধা নামের বাঁশি রে
একবার বাজরে বাঁশি বাজ॥

রাধা গীত : ও আর ডেকো না ডেকো না মোরে গো
ও চিরজীবন স্বামী পূজা দিতে
প্রণয় দূতে আমারে আজ এনেছিস যে॥

কৃষ্ণ গীত : এসো লো রাই বিধুমুখী গো
আমার হৃদি নিধুবনে।
শ্যাম চাতকের বাঁচাও জীবন
প্রেম বারির শীতল পরশনে॥

রাধা গীত : তুমি বাহির হতে বাজাও বাঁশি গো
আমি ঘরে বসে শুনি।
কেমনে আসিব বনে
পাহারা দেয় ননদী ভগিনী॥

কৃষ্ণ গীত : দেখিতে এই রূপ মাধুরী গো
আমি কদম তলায় থাকি।
পথ চাহি আর প্রহর গুনি
চেয়ে থাকে যেমন চাতক পাখি॥

মিলন : এলো সৃষ্টি নিথর ঘুমায় নদী সাগর রে
চলে তাই হারিয়ে দুই জনে। (রাধা কৃষ্ণের প্রস্থান)

কুটিলা ও আয়ানের প্রবেশ....

কুটিলার গীত : দাদা দেখে যা, দেখ সে কি মজা
দেখ সে ভর দুপুরে বউ রাণীর কি লীলা
তুই কানা কি আমি কানা

দাদা প্রমাণ নে এই বেলা।
দেখ সে নিধুবনের নির্জনে
মিলে সেই কালার সনে রে
দেখ, অভিসারে জুড়াই অঙ্গ জ্বালা।
অবুঝ দাদা বুজলি কি ছাই
কূল খালো তোর কালা।

আয়ান : জগতের যত হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষার কাজল চোখে দিয়ে তুই আমার বউয়ের লীলা কী দেখবি কুটিলা? তুই যে অযথা সতী-মতি রাধার নামের পাশে একটা কালো ছোড়াকে বসিয়ে দুনিয়াটাকে ভরে দিলি অন্ধকারে। একবার চেয়ে দেখেছিস? সে যুবক নয়, সামান্য একটা বালক।

কুটিলা : তোর চোখে ধুলো দেবার বেলায় সে বালক। নইলে তার মত সুপুরুষ এই পৃথিবীতে কেউ নেই।

আয়ান : তাও যদি হয় তবুও সম্পর্কে ভাগ্নে।

কুটিলা : লম্পটের আবার ধর্ম জ্ঞান। বলি বাঘ কি কোনো গো হত্যা করলে পাপ হয় নাকি?

আয়ান : ছিঃ! ছিঃ! ঘরের কথা পাড়ার লোকের কাছে এমন করে কেও বলতে পারে? তুই মানুষ না একটা জানোয়ার?

কুটিলা : না আমি কুটিলা।

আয়ান : কি বলতে চাস তুই?

কুটিলার গীত : বলতে চাই—
এই ভর-দুপুরে তোর বউ নিল চোরে
এই ব্রজ মণ্ডলে মুখ দেখাবি কি করে॥

আয়ান : অসভ্য। যেখানে ফুল সেখানে কীট। যেখানে দেবতা সেখানেই অসুরের উৎপাত। মানুষ যেখানে আশা নিয়ে গড়তে চায় শান্তির নীড়, সেখানেই বিধাতার আগুন ঝরা অভিশাপ। বল তোদের সেই কুলটা বউ কোথায়?

কুটিলার গীত : সে যে নিধুবনে নির্জনে
মিলেছে কালার সনে॥

আয়ান : আমাকে দেখাতে পারবি?

কুটিলা : দেখালে এক কোপে গলাটা নামিয়ে দিতে পারবি?

আয়ান : বোন হয়ে তুই এতো পারিস। আমি তোর ভাই হয়ে কেন পারব না?

কুটিলা : তুই কি একটা পুরুষ! যে বউয়ের সঙ্গে পারবি? আর ভগবান মিনসেরও বিচার নেই। যার মদনী নেই তার আবার সুন্দরী বউ।

আয়ান : কুটিলা!

কুটিলা : তোকে দাদা না বলে গাধা বলা উচিত। তুই আস্ত একটা ধোপার গাধা।

আয়ান : আমি জীবিত না মৃত চুরাশি নরক এক সঙ্গে জ্বলে ওঠে আয়ান ঘোষের ঘরে।

কুটিলা : দাদা!

আয়ান : ডাকিসনে নাগিনের বিষ। আমার সারা গায়ে বিবক। আমার উত্তেজনার ইস্পর্ধা চুরমার হয়ে গেছে। আমার মনুষ্যত্বের স্ফটিকস্তম্ভ তোর সংসারের মধ্যে।

কুটিলা : বাপরে! যার বিষ নেই তার আবার কুলপনা চক্কোর; ঢঙ দেখে মরে যাই।

মিলন : তোর কুল মর্যাদা গেল ধোপার গাধা রে
দাদা ঘর হলো তোর হাটখোলা॥

আয়ান : চল আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। যদি সেই নন্দ সুত'র পাশে কলঙ্কিনী রাধাকে দেখাতে পারিস, তবে রক্ত দিয়ে ভিজিয়ে দেব নিধুবনের মাটি। আর যদি দেখাতে না পারিস তবে তোকে হত্যা করে মিটাবো আমার জীবনের জ্বালা অবসান। (প্রস্থান....)

কুটিলা : আয় চলে, যেমন ঘুঘু বউ আমিও তেমনি ফাঁদ। সে যদি থাকে ডালে ডালে, আমি থাকবো পাতায় পাতায়। (প্রস্থান....)

বৃন্দাবনের পথে রাধা-কৃষ্ণ....

কৃষ্ণ : কুটিলার কুমন্ত্র পেয়ে দেখ আয়ান খড়্গ নিয়ে ছুটে আসছে। শ্রীমতি তুমি পালাও।

রাধা : কি নিয়ে পালাবো শ্যাম? এখানে এসে আমি যে আমাকে হারিয়ে ফেলেছি।

কৃষ্ণ : না পালালে আয়ান তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

রাধা : কেন আমি কি করেছি?

কৃষ্ণ : ঘর ছেড়ে এসেছো।

রাধা : পর নিয়ে যে ঘর বসতি, সে ঘর কি আমার সুখের ঘর, আমি ভাবতেও পারিনা।

কৃষ্ণ : কথা রাখ, শ্রীমতি।

রাধা : রেখেছি। কুল না রেখে, আমি শ্যাম রেখেছি। এর পরে আমি কোনো কথা রাখতে পারবো না। পালাতে হয় তুমি পালাও।

কৃষ্ণ গীত : রাধে মোর মাথায় ময়ূর পাখা রয়

রাধে তোমার মাথায় কলঙ্কের ডালি

লাঞ্ছনা দেয় ননদী তোমায়

শাশুড়ী দেয় গালি।

পেয়ে তোমারি পরশনে

কালিয়া করলাম দমন রে

করলো গিরিধারী কৃষ্ণ বনমালী

রাই বিধুমুখী নিধুবনে আজকে হলো কালী॥

কালীর মূর্তি ধারণ....

কৃষ্ণ গীত : বাঁশি আজ আমি বনমালা মুণ্ড মালা

গতিহারা আজ নরকে মেঘ মেলা

ছিলেম শ্যাম হয়েছি শ্যামা।

রাধার গীত : কার ভয়ে রে প্রাণের কালা আজকে হলি কালী

কোথায় রাধা মদি রঞ্জন কৃষ্ণ বনমালী।

রাধা : তোমার রাঙ্গা পায়ে রক্ত জবা, কোথায় পাব শ্যাম। আমি কি তোমার পূজা জানি?

পূজার উপবেশন গীত....

রাধার গীত : তুমি আমার আমি তোমার গো

তবু তোমার কি বা জানি।

কী দিয়ে কী করিব পূজা

আমি তোমার জনম ভিখারিনী॥

আমি জানি নাকো তুমি কালা গো

প্রভু তুমি বনমালী।

শ্রী পাদপদ্মে জুড়ায় জীবন

জবা রাই কিশোরী শ্যামের অঞ্জলি ॥

কুটিলা ও আয়ানের প্রবেশ.....

কুটিলা : চেয়ে দেখ চেয়ে দেখ দাদা, তোর বউ কাকে নিয়ে কি করছে।

আয়ান : বিশ্ব বিধাতা এলোকেশীর পদ তলে ধ্যানে মগ্ন রাই সত্যি হারা তপস্বিনী। একি তোদের কলঙ্কিনী রাধিকা?

কুটিলা : ভেলকি দাদা সব ভেলকি, তোকে আসতে দেখে কালা উল্টে কালী হয়েছে।

আয়ান : তবে কি তোদের কালার কালী পূজা করছে?

কুটিলা : নয় তো কি? এই বনের মধ্যে কোথা থেকে কালী এলো?

আয়ান : বনে কেন? ভক্তের ডাকে ভগবান নরকে আসতে বাধ্য হয়।

কুটিলা : তোর বউও যেমন ভক্ত, কালীও তেমনি কালী, সব ভণ্ডামি।

আয়ান : আসলে দিন-দুনিয়াটা নকলে ভরে গেছে কুটিলা। আসল বলবি কাকে, মাটির প্রতিমা সেও তো নকল। কিন্তু ভক্তের গুণে মৃন্ময় সত্যি হয়ে ওঠে তাকি জানি!

কুটিলা : এতো মন্ত্র পড়ছে কেন রে? ঘ্যাট করে কেটে ফেল না।

আয়ান : না, শুধু মন্ত্রপাঠ নয়। নর বলি দেয় আমার এই কালীর পূজায়। আজ পশু বলি হবে। প্রণাম কর এই মূর্তি প্রতিমায়।

(হত্যায় উদ্যত আয়ান.....)

কুটিলা : দোহাই দাদা রক্ষা কর। তোর বউকে আর কোনো দিন কিছুই বলবো না।

আয়ান : বল যে কৃষ্ণ নিষ্পাপ, রাধিকা সতী।

কুটিলা : সতী–সতী–সতী, তোর বউ মহাসতী।

(অন্য দিকে চাহিয়া...)

কুটিলা : মাগী কি ন্যাকামিটাই না করলে। গা ঘেন্নায় আমার মরতে ইচ্ছা করছে। (প্রস্থান....)

আয়ান : এতো দিন আমি বুঝতে পারিনি যে, দু'য়ে এক আর একে দুই। জগতে তোমার মুখে কালী ঢেলে দিলেও আমি তোমাকে ভুল বুঝতে চাইনি। মনে রেখ, তুমি আমার সহধর্মিনী নও, তুমি শুধু ধর্মিনী। তাই তোমার সাধনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ এই নিধুবনের কৃষ্ণ-কালী।

মিলন : ভেবে বীরেন্দ্র এমনি অজ্ঞান অন্তরে, খোঁজে দিনের আলোয় দীপজ্বালি।

(৩৬)

কবিগান

কবিয়াল বিজয় সরকার রচিত গান

তুমি জান না, জাননারে প্রিয়, তুমি মোর জীবনের সাধনা
তোমায় প্রথম যেদিন দেখেছি, মনে আপন মেনেছি
তুমি বন্ধু আমার মন মাননা॥
সেদিন ফাল্গুনী দোল পূর্ণিমায়, মিঠেম মৃদুল বায়,
ফুল বনে পুলকের আল্পনা।
সেই মধুর মাধবী রাতে, বঁধুয়া তোমারি সাথে,
আমি করেছিলাম সে যামিনী যাপনা॥
তুমি চলে গেলে আমায় ফেলে, কি আগুন এ বুকে জ্বেলে
একদিনও দেখিতে তুমি এলে না।
তোমায় পেলে মোর দুঃখেরই কুঠিরে, দেখাইতাম বক্ষ চিরে,
বুকের জ্বালা মুখে বলা চলে না॥
কাষ্ঠ যোগে দাবানল, জ্বালায়ে পোড়ায় বন জঙ্গল
মন পোড়ান আগুন বন্ধু তাহা না
যত বিরহীর অন্তর তলে, বিনা কাষ্ঠে আগুন জ্বলে
জলে গেলে জ্বলে একই যাতনা॥
আমি ঘুরি জনমে জনমে, ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমে
খুঁজে ফিরি তোমারি ঠিকানা
পাগল বিজয় বলে চিত চোর, আসবে কি জীবনে মোর
বুকে রইলো ব্যথা ভরা বাসনা॥

(৩৭)

বিজয় সরকারের সুর ও কণ্ঠে অপ্রচলিত গান

মাঝি নাও ভিড়াও
অভাগারে তরীতে নাও গুরু রে
আমার নাইকো কড়ি দিন ভিখারী

তাই কি যাবে আমায় ফেলে॥

অকূল এই ভব নদী তরঙ্গ ভয়াল

নামটি তোমার দিন বন্ধু তুমি তো দয়াল

আমার এই ভরসায় জাগলো খেয়াল

তাইতো বসে আছি কূলে॥

যাদের ছিল জমিদারী ছিল অর্থ বল

তোমার ঘাটে তাদের অর্থ আজি হয়েছে অচল

আমার সম্বল এখন নয়নের জল

তাই দিবো চরণে ঢেলে॥

বাহাত্তর বছরের পাড়ি বেলা বেশি নাই

যুগের কাজ মুহূর্তে কর সবে বলে তাই

আমার নাইকো কড়ি দীন ভিখারী

তাই কি যাবে আমায় ফেলে॥

বিজয় অবসাদে কাঁদে ভাবে রসময়

একটু পরেই নামবে আঁধার সবে বলে তাই

যদি জায়গা তোমার না রয় নৌকায়

ঠাঁই দিও চরণ তলে॥

(৩৮)

পাগলা কানাই রচিত কবি পর্যায়ের গান

কথা একবার শুনলে লাগে ভয়

আবার শুনলে মনের ধান্দা যায়

ভবেতে সেই যে যুবতী

সে এক পরম সুন্দরী

শূণ্যের উপর ঘর বেঁধেছে রঙিল কাচারি

ঘরের মধ্যে এক রমণী

হস্ত-পদ বান্দা রয়॥

ছিল আর এক জন নারী

আট পা তার ষোল হাঁটু ভবেতে দেখি

পলকেতে লক্ষ ছেলে এই ভুবনে জন্ম দেয়॥

অধম পাগলা কানাই কয় দিয়ে যায় আপন পরিচয়

বাড়ি আমার লেবুতলায় থানা ঝিনেদায়

জেলা হলো যশোহরে কবি গাচ্ছি বৈডাঙায়॥

(৩৯)

পাগলা কানাই বলে ভাইরে ভাই

ছোট্‌কালে দিন আমার নাই

যৈবন পড়ে গেছে ভাঁটি

ঘিঘাটি আর এলাঙ্গি

নড়ে গেছে খিল-কাঠি

যৈবন হয়ে গেছে মাটি॥

ঠেলে-ঠুলে দেখলাম কত

চলে না রথ আগের মত

সোনা রথ হয়ে গেছে ঢাটি(নষ্ট)

হাওয়ায় রথ চলে ফেরে

বসত তার দমের ঘরে

একদিনও দেখলাম নারে রূপটি কি॥

বয়স যখন ছিল বারো

ছয় হাত চুল মাথায় ছিলো

কত জন পাগল হলো

চুলের ফেকম কি

এখন পাপ করে খুঁটিনাটি

হাতে নিছি ধর্ম লাঠি

খুঁটির গুড়ায় নাইরে মাটি

হায় উপায় কি॥

(৪০)

কোনদিন আল্লা অচেতন ছিলো

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে

রূপ দরশন কার হলো॥

আউলামা খালাক নূরী

নিরাকারের নূর চোহায় যদি

অপবিত্র নূর কি শুধি

পবিত্র কিসে হলো॥

নিরাকারে তুমি নূরী

ছিলে ডিম্ব অবতারি

ডিম্বর মধ্যে ছয়জন শুনি

কার সাথে দোসর হলো॥

পাগলা কানাই ভেবে বলে

ডিম্বতে হয় ছয়জন যাতে

কোননাম ধরে ডাকলে পরে

আখিরাতে কর্ম বহন॥

(৪১)

আল্‌জিউ থাকে জিহ্বাতে ভাই

রাসুল থাকে টাকরাতে

একের সৃষ্টি তাই পারি না পাগড়াতে॥

মান্য হলে পুরাণ-কুরআন

জল কে পানি জানি দুইয়েই এক সমান

একের কাদরাতে

হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান

বাঁচিনা ঐ ঝগড়াতে॥

ঘরে ধড় বাইরে মাথা

এগুলো কুরআনের কথা

আদি আদম সৃষ্টি দাতা

চলতেছে এই জগতে॥

এক নামে প্রথা

তিনি কলেমা কলেন দাতা

ঐ দীন পাগলা কানাই নাড়ে মাথা

পড়ে একটা ভোগরাতে॥

(৪২)

আজব এক গাছের কথা বলে যাই সভায়

গাছের ডাল গিয়াছে পাতালে

উব্দ হয়ে রয়েছে গাছ সন্নির উপরে

কি বলবো সে গাছের কথা ভাই

গাছের শিকড়েতে বাও মেলে

সেই না গাছের মাসে মাসে মধ্যে ফুল ফোটে॥

কি বলবো সে গাছের কথা ভাই

লাল জরদ সেই সিয়া সফেদ

ফুল কোনফুলে হয় আওরদ ফুল

কোনফুলেতে পয়দা হলেন মোহাম্মদ রাসুল

কোনফুলে হয় ফলের আকার ভাই

কোনফুলে মওর আঁটে

সহজে কথা জিজ্ঞাস করি বয়াতির কাছে॥

তুমি কইলে কথা শোনোনা

কি বলবো তোর গুনের কথা

গুরুর বাক্য মান না

তুমি করতে চাও মুল্লুকের বাদশাই রে

মণির তেড়া সিঁতে গেল না

পাগলা কানাই বলে মণির পয়সা জোটে না॥

(৪৩)

জারিগান

সুজলা-সুফলা এদেশ বিশ্বপতির দান
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বাংলার জয় নিশান।
ফলে জলে ভরা দেশ, সুখের তার নাইকো শেষ
এমন দেশটি পরমেশ্বর করিয়াছেন দান
এক ফোটাতে হইল সৃজন হিন্দু-মুসলমান॥
ভাল গুড় যশোরে মেলে, রংপুরেতে তামাক ফলে
পদ্মা নদীর ইলিশ খেলে জুড়ায় মন প্রাণ
টাঙ্গাইলের ভালো শাড়ি ভোলে নারীর প্রাণ॥
এই যে চালনা, খুলনা নুয়ার সিটি
বরিশাল আর ঝালকাঠি
ব্যবসা যদি করবে খাঁটি যাবে না লোকসান
চিটাগাঙ আর ঢাকা শহর বাণিজ্য প্রধান॥
এই যে ভাল গঞ্জি নারা'ণ গঞ্জে
শতরঞ্জি ভাল রিপেন গঞ্জে
আবার ছুরি কাঁচি বাখরগঞ্জে দেখে কিনে আন
রসিক বলে গাওরে এবার বাংলাদেশের গান॥

(৪৪)

ওরে প্রথমে বিসমিল্লা বলে জারি করলাম শুরু
ঐ যে অনাথের নাথ আল্লা দোয়া করবেন গুরু
আহা গুরু কল্পতরু তুই সংসারের সার
এই যে পড়িয়াছি অচল ভরা আমায় কর পার গো
লা ইলাহা ইল্লালা মোহাম্মদ রসুল॥
এই সমস্ত বলতে গেলে আমার ক্ষণে হবে দেরি
ভাইরে শোনোগো রুস্তমের জারি
আমি সভায় প্রকাশ করি

তবে কায়কো আজম নামে বাদশা এলো এ শহরে
বড় জবর করতে ছিল দুনিয়ার পরে
সিপাহি শালাতে ছিল যত নওজোয়ান
ওরে তার মধ্যে ছিল বীর সেই রুস্তম পালোয়ান
এই যে মকর উল্লার মকর ভবে কে বুঝিতে পারে
ওরে একদিন গেলেন বীর সেই স্বীকার করিবারে
কথা:
তাই জঙ্গলে জঙ্গলে বীর আশায় ঘুরে বেড়ায়
খোদার খেলায় কোনো বনে শিকার নাহি পায়
ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইছে গাছের ছায়ায়
ওরে বুলগিরি নামে ঘোড়া দেখ গাছে বাঁধা রয়
শাহ্মান বাদশরা কন্যার নাম ছিলো তাহমিনা
পানি আনতে সেই না পথে হইয়াছেন রওনা
আচানক নজর তার দক্ষিণায় পড়িলো
ওরে আছমানের চাঁদ যেন সেই জমিনায় দেখিল
রুস্তমের রূপে মন আর মুগ্ধ হলো তার
মনে ভাবে আমি কেমন করে করিব দেবতার
সঙ্গে ছিল হীরা দাসী ডাক দিয়া কয়
ওরে মনের গোপন কথা দাসী বলিব তোমায়
আরে শুন দাসী প্রাণ দাসী আমায় ভালোবাসো
ওরে ঘোড়া লইয়া তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো
এই বলে ঘোড়া লইয়া দুই জনে চলে
গোপনে রাখিলো ঘোড়া অন্দর মহলে
বাহুলব ঘুম থেকে জাগিয়া উঠিলো
ঘোড়া না দেখিয়া বড় চিন্তান্বিত হলো
বনে বনে তালাশ করে কোথা নারে পাই
বাদশার দরবারে যাইয়া তখন আরজ জানায়॥

(৪৫)

মোসলেম উদ্দিন বয়াতি রচিত জারি গান

ধরা পড়ে গেছরে ইন্দুর বাক্স কলের মাঝে
ছাতুর লোভে ধাতু ক্ষীণ তোর
পড়ে গেছো প্যাচেরে ইন্দুর॥
পরের গোলায় ধান চাউল খাও কাঁথা বালিশ কাট
ঘরের মেঝেয় গর্ত করে তোলা মাটি লোট
তুমি কলা গাছের মাথায় ওঠো ব্যস্ত থাকো কাজে রে॥
এ ঘরে ও ঘরে ঘোরো কথা মান না
সুতা কাটো বস্ত্র কাট স্বভাব গেল না
আর ক্যান এত ভাবনা ডাকতেছে যমরাজে॥
শুনেছি যমরাজ বাবু দুলাভাই পাতাইয়ে
ভগ্নি তাহার মৃত্যু কন্যার সাথে দিবে বিয়ে
তুমি বাসর ঘরে থাকবা শুয়ে তার পিরিতে মজে॥
যেমন বীজ লাগাবে যে জন পাবে তেমন ফল
মোসলেম বলে কর্মক্ষেত্রে ফলবে ফলাফল
ভোলা মন তুই হসনে বেহাল, কর্ম কর বুঝে॥

(৪৬)

যে জন গান জানে না, গান শোনে না
আমি জানি বন্ধুকে সে ভালোবাসে না।
গাওরে বন্ধুর গান শোনো বন্ধুর গান
ঘুচিবে অজ্ঞান, ফুটবে জ্ঞানের জোছনা॥
বারি শূন্য সরোবরে পদ্ম নাহি ফোঁটে
এটো কেন নাহি খায় যদি না পায় মিঠে
হলে প্রেমশূন্য বাক্য, না মেলে মানিক্য
শুধু তার চাকচিক্য কোনো কাজে আসে না।
সুরের সংঘাতে জন্মে ভাব-প্রেম-রস
প্রেম রসে হয় দেহের ইন্দ্র আদি বশ

হলে ভাবেতে বিভোর আসে অসীমের খবর

মুছে যায় যের, যবর, তাতে নোকতা থাকে না॥

গরল ফেলে সরল হইয়ে সরল পথে চলো

মূল শিকড় কাটিয়া কেন উপরে জল ঢালো

তাতে ফল না ফলিবে, বরং ফলে বিফল হইবে

পরিণাম হারাবে কোনো কিনার পাবে না॥

অন সুরেতে মূল্য হারায় কোরআন-বাইবেল-বেদ

মিছেরে তোর মন্ত্র পড়া মিছে করা জেদ

কবি মোসলেমের আরতি, ছাড় রে কুরীতি

সুহৃদের পিরীতি একবার করে দেখনা॥

(৪৭)

বাউল গান

পাঞ্জু শাহ্ রচিত বাউলের ভাব পর্যায়

আল্লাহু মোহাম্মদ আদম

একদমে তিন মিলে দম

জেনে নাও দমের মালা গলে॥

আদমের দমের সমান

এক লাখ চৌত্রিশ হাজার বার

রাত দিন জান খবর চব্বিশ হাজার মূলে

ভুলে আল্লাহু একদম ফেলা ঋষ্দ দলিলে

দম জেনে নাও দমের মালা গলে॥

আদমে সাঁইজির খেলা জগদং দমের মালা

দূর কর তজমি মালা

বায়তুল্লা ঘর কাবাতুল্লা বসাও হৃদ কমলে॥

যেজন করে দমের লিহাজ জানে সে কাবাতুল্লা

বায়তুল্লা ঘর আল্লাতাল্লা দিবেন তাহার দেলে॥

যেজন করে দমের লিহাজ জানে সেই কাবাতুল্লাস

বায়তুল্লা ঘর আল্লাতাল্লা দিবেন তাহার দেলে

তাইনা দেখে অধীন পাঞ্জু ফিরছে বদ হালে॥

(৪৮)

এই মানুষে নবী নূরের ঝলক দেয়

লাল, জরদ, শিয়া, সফেদ নূরের আসন ঘিরে রয়॥

মুকাম, লাহুদ, লাসুদ, জগরুল, মালকুদ

মুকাম চারি কয় চার মুকামে

মুনজিল দ্বারে গুপ্ত কিরণ দেয়

এই মানুষে নবী নূরের ঝলক দেয়॥

নূরের হস্ত,পদ, নাসা, কর্ণ কিছুই নাই

আপন বেগে বেগ ধরে সে ত্রিবিণে যায়

ঘাটে বসে ভ্রমর রূপে, পদ্ম ফুলে মধু খায়

এই মানুষে নবী নূরের ঝলক দেয়॥

কিসে হবে ভ্রমর যতন, এ্যাও ঠেকিলাম বিষম দায়

অধীন পাঞ্জু বলে নূরের যতন জানে কেবল ফাতেমায়

এই মানুষে নবী নূরের ঝলক দেয়॥

(৪৯)

দুদ্দু শাহ্ রচিত গান

যে চেনে আল্লাকে চিনা ফরমায় নবী হাদিসেতে

আপনাকে আপনি চেনা যায় কিসে॥

রোজা কিম্বা নামাজ পড়া

কলমা কি হজ্জ যাকাত দেয়া

তম্বী ভারি পাঞ্জা গানায়

খোদার নিজ পরিচয় কই তাতে

আপনাকে আপনি চেনা যায় কিসে॥

কাবাতে নিয়েত নিরাপন

আপন কাবার নাই অন্বেষণ

Dhaka University Institutional Repository

খলিলুল্লার কাবায় কি মন পাও কি খুদা দেখিতে

আপনাকে আপনি চেনা যায় কিসে॥

আপনাকে আপনি ভুলে পশ্চিম তর খাড়া হলে

দুদ্দু কয় রুপু সিরজা দিলে

খুদার দিদার কই তাতে

আপনাকে আপনি চেনা যায় কিসে॥

(৫০)

দীনের নবী মুরিদ হয় যথাই

জাহেরাতে নাই সে ভেদ আছে পূষিদ্বয়॥

নূরের ছাদনা তলে ছাদরাতুল মুন তাহা বলে

নূরের পিয়ালা খুদা নবীকে দিলেন॥

নূর ছেতারা যাকে বলে

সে ভেদ নবীকে জানাইলেন খোদায়

যথা যজ্ঞ লায়েক জেনে নবীকে দেছেন॥

যে পিয়ালায় নবী মুরিদ

খোদাকে কইলেন শহীদ

অধীন দুদ্দু বলে নবী সেজে তার দাতা হয়॥

(৫১)

সাধক সাদি তাইফ রচিত গান

দেহের মাঝে ফুল ফুটেছে, রাসূল আমার হাল ধরেছে

ভব মায়া দূরে গেছে, চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে॥

মন আকারে আছেন যিনি, রূপের মাঝে অরূপ তিনি

কী প্রকারে তারে চিনি, রংমহলে যে গড়েছে॥

রাসূলের দেখা নাহি পেলে, কি রূপেতে প্রেমিক হলে

গুরুপ্রেমে রাসূল মেলে, সাদি'র মনে ঘুন ধরেছে॥

(৫২)

মন, কবে তোর আর হবে সুমতি
হাতের কাছে থাকতে সে ধন
হলো ক্ষয়-ক্ষতি॥
আসলি একা ভবের পরে,
করতে সদাই রঙ বাজারে
নিজেরে ঠিক কই চিনিলে
কবে হবে আর সতী॥
নিগূঢ় প্রেম জানলে না মন
জানবে কি আর খোদা কেমন
হলো না মোর মন সচেতন
হারালি রে মনের মতি॥
তুমি রাজা আমি প্রজা
ভুল হলে খাটবো সাজা
বয়ে বেড়ায় ভবের বোঝা
সাদি'র কি আর হবে গতি॥

(৫৩)

জাগগান

বন্দনা

স্বর্গের থেকে আইলোরে চাষার এক ছেলে
সোনার কোদাল কাঁধে লয়ে
আমার হরি ঠাকুরের আসন খানা দাওনা চাঁছে-চুঁছে
সকাল বেলায় দুয়ার ঝাঁট, সন্ধ্যা বেলায় বাতি॥

(৫৪)

আসন পাতা

মির্জা নগরের ঝাঁপি আমার ছন্দে-গন্ধে বাঁধন রে
আমার ঝাঁপি খুলিলো কে
ঐ না ঝাঁপির মধ্যে আমার হরি ঠাকুরের আসন রে
আমার ঝাঁপি খুলিলো কে॥

Dhaka University Institutional Repository

(৫৫)

সেকন কাষ্ঠের নৌকাখানি পবন কাষ্ঠের দাড়
ও তার আগা গুড়া তার সেঁচো নৌকার জল।
ভাঙ্গা নৌকা ভাঙ্গা দাঁড় কেমনে হইবো পার
আমার হরি ঠাকুরের পৈতে ধরে হয়ে যাব পার॥

(৫৬)

সমুদ্দুরে ছিল রে শঙ্খ নগরে আনিল কে
মহাদেবের আজ্ঞা পেয়ে গরুল এনে দে
কে কাঁদেরে কে কাঁদেরে কাঁদে শঙ্খর মা
কেমন করে সইবে বাছা করাতের ঘা
করাতে কাটিয়ে শঙ্খ পড়ে খান খান
নর লোকের হাতে শঙ্খ ধুলা-বালি মাখে
স্বর্গ দেবতার হাতের শঙ্খ-সিঁদুর-চন্দন পড়ে॥

(৫৭)

আলির মুড়োয় ফুলের গাছটি কে রুয়েছে
হরি ঠাকুরের ছোটো বুনডি সেই রুয়েছে
গোড়ার ফুল তুলনা তুলনা বালি লেগেছে
আগার ফুল তুলনা তুলনা জালি রয়েছে
মাঝখানে ফুল তুলে নিয়ে যাও মা কালীর বাড়ি
মা কালীর বাড়ি বড় পূজা লেগেছে
আলোচালে পাকা কলায় ধামা ভরেছে
কাঁচা দুধে গঙ্গার জলে আসর ভেসেছে
ধূপ ধুনোর গন্ধে মা গো আমোদ পড়েছে
ঢাক ঢোলের বাজনায় মা গো মাথায় তুলেছে॥

(৫৮)

তারায় করে ঝিকিমিকি চান্দে করে আলো
এমন সুন্দর রাধে তোমার পতি কেন কালো
থাকুক থাকুক পতি কালো আমার সিঁতের সিঁদুর ভালো॥

(৫৯)

চাঁদ উঠেছে গৌরব করে সঙ্গে শত তাঁরা

বিনা সুতায় গেঁথেছি আমি বকুল ফুলের মালা

থাকো থাকো ওরে মালা বকুল ফুলের ডালে

আসবে না মা সর্ব দেবতা তুলে দেবে গলে॥

(৬০)

উঁচু-নীচু দেখে রাধিকা মুড়ার পরে বসে

মুড়ার পরে বসে রে রাধিকা চুল চিরনি করে

চুল চিরনি করে রে রাধিকা তিলক ফুটা কাটে

শীঘ্র করে সাজ রে রাধিকা শীঘ্র করে সাজ

সব সাজনা সাজিলাম সওদাগর বাকি রইল পাটের শাড়ি

বাজার দিয়ে যাব রে রাধিকা কিনে দেব পাটের শাড়ি॥

(৬১)

আসর তোলা গান

নিষ্করমী কাটাইলাম ফুল গাছও রুইলাম

ফুল তোলে কে কাঞ্চন রে ফুল তোলে কে

সাজি পুরা ফুল রে, ফুল তোলে কে

আসবেন আমার হরি ঠাকুর খেলবেন ফুলের বাজারে

ফুল তোলে কে

ঐ পারেতে বেলের গাছটি পাতা ঝরঝর করে

তার তলে হরি ঠাকুর সদা নেত্য করে

কে কাঁদেরে গোপনি কাঁদে কাঁদে তরুলতা

সকল লতায় বেড়ায়ে আসলাম কৃষ্ণ গেছেন কোথায়

কৃষ্ণ গেছেন মথুরায় আমারে না বলিয়া

কোথা হইতে আসলেন কৃষ্ণ পাঁচলি হারাইয়া

ডান হস্তে তেলের বাটি কাঁদে কঙ্কন ফুল

কৃষ্ণ যাবে স্নান করিতে কালিদহের কূল॥

(৬২)

উত্তর হইতে আসলেন মা হাতে রাঙ্গা লাঠি
লাঠির মুড়োই আছে দু'টি পেখম ধরা পাখি
মা যাবেন দক্ষিণ বাইনি আমার লয়ে যাবেন কি
একটু খানি বিলম্ব কর মা সর্ব জিনিস এনে দি'॥

(৬৩)

নাল মুলামের ঢেঁকি আমার পদ্মের পাতা কুলো
রূপ কাটা সে কাটা সোনা বাঁধা গুলো
ভগবতী ভানেন ধান হরি ঠাকুরের পূজো
ভালো করে কাড়ায় চাল হরি ঠাকুরের পূজো
করমুচার তলায় মেয়ে বেড়ায় আলি আলি
করমুচার কাঁটায় বেঁধে ছিড়লো মেয়ের শাড়ি
এত রাত্রে কোথায় পাবো ক্ষীরদার তাঁতি
শীঘ্র করে দাও গো বুনে হরি ঠাকুরের ধুতী॥
পুকুরের চারিপাশে রুয়ে আসলাম ধনে
হরি ঠাকুর স্নান করে চাদোয়া খাটিয়ে
স্নান দান করে ঠাকুর পরেন শুকনো শাড়ি
শুকনো শাড়ি পরে ঠাকুর জল পান করবেন কি
ময়রার বাড়ির মিষ্টি এনে জল পানেতে দি'
জল পান করে ঠাকুর মুখশুদ্ধি করবেন কি
বারুই বাড়ির পান এনে মুখশুদ্ধি দিয়ে দি'॥

(৬৪)

আসর তোলরে ভাঙিয়া
বাসর তোলরে ভাঙিয়া
আমরা আইলামরে হরি ঠাকুরের জাতে
হরি ঠাকুরের কলসি কপিলমুনি ঘাটে ডুবাইছি
চল আমরা ঘরে ফিরে যাই।

স্বর্গের থেকে আইলোরে হিমলেরও কৌট

তার সাথে আইলোরে ষাঠ হাজার নাটো

নাচিতে গাইতে নাটোর গলা হইলো কাষ্ট

জল খাতি গেল নাটো কপিলমুনির ঘাটে

কপিলমুনির ঘাটের কলসী

জয়নগর ঘাটে ডুবাইছি॥

ডান হাতে ধানের নুড়ি বাম কাঁখে ধানের আঁড়ি

ধীরে ধীরে মা তুমি যাবা কার বাড়ি

যাবো দত্তের বাড়ি

দত্তের বাড়ি যেয়ে মা গো বর দিবা কী

ধন ও ধনে অক্ষয় বর কোলের যাদুমণি

ঐ বর চাই মা গো ঐ বর চাই

ঐ বর পাইলে মা গো পূজিবো তোমায়॥

(৬৫)

হালই গান

শুন সবে ভক্তি ভাবে করি নিবেদন (গো)

কৃষ্ণলীলার কথা কিছু শুন দিয়া মন (গো)

ঘোষ গেল বাতানেতে যশোদা গেলেন ঘাটে (গো)

শূন্য গৃহ পেয়ে কৃষ্ণ সকল ননী লোটে। (গো)

ননী খাইছে কে রে গোপাল, ননী খাইছে কে? (গো)

আমি তো খাই নাই ননী বলাই খেয়েছে। (গো)

আমি যদি খাইতাম ননী ফেলতাম আধা আধা (গো)

ননী খাইছে দাদা বলাই ভাণ্ড করে ছেদা। (গো)

ছড়ি হাতে মা যশোদা ফেরেন পিছে পিছে (গো)

লম্ফ দিয়ে ওঠেন কৃষ্ণ কদম্বের গাছে। (গো)

পাতায় পাতায় ফেরেন কৃষ্ণ ডালে না দেয় পা (গো)

তলায় থেকে নন্দরাণী শিরে হানে ঘা। (গো)

নামো নামো ওহে কৃষ্ণ পেড়ে দেব ফুল (গো)

ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ো যদি মজাবে দু'কুল। (গো)

কয়ে বলে মা যশোদা কৃষ্ণকে নামাল (গো)

গাভী ছান্দা দড়ি দিয়ে কৃষ্ণকে বান্ধিল। (গো)

বেঁধো না বেঁধো না মাগো বন্ধন জ্বালায় মরি (গো)

কোমল হস্তে কঠিন বাঁধন সহিতে না পারি। (গো)

সব রাখালে মিলে যবে দিল জয়ধ্বনি (গো)

কৃষ্ণের হাতে কঠিন বন্ধন খুলিলো তখনি। (গো)

(৬৬)

ডেকে আয়ান বলে সাধন বলে আয়ানের কপাল

বর্গা জমি চাষ করে তার লাঙ্গলে নাই ফাল॥

শুন পতি ভাগ্নে প্রতি কেন তুমি বাম

দ্বাপর যুগে সাধনের ধন তোমার ভাগ্নে শ্যাম॥

আয়ান বলে ভাগ্নে বলে কিছু বলি না

মামির সাথে আনাগোনা মোটেই ভালো না॥

বিনা চাষে মেজে ঘসে ফসলের ক্ষতি

যার জমি তার সইবে কেন এসব দুর্গতি॥

জিতেন বলে সাধন বলে নামে জমিদার

মালিক দিল মালিকানা মালের কি দরকার॥

(৬৭)

সখী যমুনাতে জল আনিতে শুনলাম বাঁশির তান

বাঁশির সুরে সজনী মোর উড়িল পরাণ॥

শুনে কালার বাঁশি মন উদাসী ঘরে থাকা দায়

রাধা রাধা বলে কালা বাঁশরী বাজায়॥

জল ফেলে জল নিতে আসি আমি কুলবালা

মনে মনে মন ফুলে গাঁথি প্রেম মালা॥

ভুলি ভুলি ভাবি মনে ভুলতে না পারি

Dhaka University Institutional Repository

মধুমাখা সুরে আমার মন গেল চুরি॥
যে যা বলে বলুক সখী পোড়া পরাণে
কালো কালির দাগ দিয়েছি আমি গোপনে॥
সকল ভুলে আপন বলে সঁপে দিলাম প্রাণ
জিতেন বলে মন না দিলে তারে পাবি কেন॥

(৬৮)

মনের কথা প্রাণের ব্যথা কার কাছে জানাই
মনে বলে পৌষ পার্বণে হিজল ডাঙ্গায় যাই॥
টেডি জামা টেডি কাপড় আলতা দিয়ে পায়
পুরুষ নারী সারি সারি চলেছে মেলায়॥
বারো মাসে তেরো পার্বণ কিছু বলি নাই
এবার বলি নিয়ে চল মেলা দেখতে যাই॥
হাতি ঘোড়া সার্কাস খেলা তেতাসে মেজিক
নাগরদোলা গয়া-কাশী বেজেছে মাইক॥
আলতা-সাবান-স্নো-পাউডার কিনবো কত কি
তোমার জন্যে আনবো কিনে খাব পাতার বিড়ি॥
পান খাই না বিড়ি খাই না কত তোমার লাভ
জিতেন বলে মত না দিলে থাকবে না আর ভাব॥

(৬৯)

শুনে শ্যামের বাঁশি মন উদাসী ঘরে থাকা দায়
রাধা তখন কলসী কাঁখে জল আনিতে যায়॥
কদম তলায় বাঁশি বাজায় চিকন কালা বসে
রান্না ফেলে কলসী নিয়ে রাধা ছুটে আসে॥
কুটিলা কয় দাদা তোমায় বলবো কত আর
নিতি নিতি আসে কালা তোমার রাধার ঘর॥
নিধুবনে রাধা সনে কৃষ্ণ খেলে খেলা
কুটিলা কয় আয়ান দাদা দেখবে এসো মেলা॥
জিতেন বলে মুদগর নিয়ে আয়ান ছুটে যায়
সেই কারণে নিধুবনে কৃষ্ণ-কালী হয়॥

Dhaka University Institutional Repository

(৭০)

এসো কৃষ্ণ বসো কাছে, কও সে জন্মের কথা (গো)

কও সে জন্মের কথা॥

জন্ম আমার মথুরাতে দৈবকের ঘরে (গো)

দৈবকের ও ঘরে॥

বসুদেব রাখিয়া গেলেন নন্দ ঘোষের ঘরে (গো)

নন্দ ঘোষের ঘরে॥

নন্দ গেলেন বাতানেতে (গরু রাখার স্থান) যশোদা গেলেন ঘাটে (গো)

যশোদা গেলেন ঘাটে॥

আমরা তো সব রাখাল ছেলে হাতে সোনার লাঠি (গো)

হাতে সোনার লাঠি॥

গান গা'বো আর কতই গা'বো গাচ্ছি (গান গাওয়া) বাড়ি বাড়ি (গো)

গাচ্ছি বাড়ি বাড়ি॥

বাস্তের নামে যা দেবেন তা আনেন তাড়াতাড়ি (গো)

আনেন তাড়াতাড়ি॥

(৭১)

চারিপাশে গোয়ার কাঁটা মধ্যি রাজার বাড়ি (গো)

মধ্যি রাজার বাড়ি॥

রাজা গেলেন পূজা করতে, নীলকণ্ঠের ঐ বাড়ি (গো)

নীলকণ্ঠের ঐ বাড়ি॥

নীলকণ্ঠের ঐ বাড়ি রে ভাই দু'টো সোনার পাখি (গো)

দু'টো সোনার পাখি॥

পরিশিষ্ট–৩

গান ও স্বরলিপি

অষ্টক গানের আসর বন্দনা

তাল: কাহারবা

নবগঙ্গার দক্ষিণ ধারে বসত করি পণ্ডিতপুর গ্রামে

ওগো মা॥

আমি না জানি সাধন না জানি ভজন

নিজ গুনে করগো কৃপা

ওগো মা॥

মাগো তোমার সন্তান গণেশ, কার্ত্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী

ওগো মা॥

এই আসরের কর গো গতি

ওগো মা॥

II সা সগা গা মা । মা পা পা -া I -া -া -া -া । পনা -া র্সা[না] ধা I
ন ০০ ব ০ গ ঙ্ গা ০ ০ র ০ ০ দ০ ক্ খি ০

I পা পধা পধা নর্সা । ধনা -া -া -া I নর্সা নর্সা ধনা ধপা । পনা ধপা -া -া I
ন ধা০ রে০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০

I পা না না নর্সা । নধা ধর্সা নধা পা I ধা পা মা গমা । গরা রমা গমা রগা I
ব ০ সত ক০ ০০ রি০ ০০ ০ পণ্ ডিত পুর গ্রা০ ০০ মে০ ০০ ০০

I সরা রা সা সরা । -া -া -া -সা I সা রা পা -া । [ধ]পমা মধা পধা মপা I
০০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ও গো মা ০ ০০ ০০ ০০ ০০

I গমা রগা -া -া । -া -া -া -া II
০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

II সা সা সা রা । গা মা গা -া I গা -মা পা ধা । না র্সা না র্সনা I
আ মি না জা নি সা ধ ০ ন ০ না জা নি ভ জ ন০

I -ধনা -পধা -পধা -া । -পা -পধা -া -পা I -া -া পা -না । না নর্সা নধা ধর্সা I
০০ ০০ ০০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ নি ০ জ গু০ ০০ নে০

I নধা -পা ধা পা । মা গমা গরা রমা I -গমা -রগা -সরা -সা । -[স]রসা -সা -া -া I
০০ ০ ক র গো কৃ০ ০০ পা০ ০০ ০০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০

I সা সা সা গা । গা মা পা পা I -া -া পা ধা । না র্সা না -া I
মা গো তো মার সন্ তান গ ণেশ কার্ তিক লক্ খী স্ব র স ০

I র্সনা ধনা পধা পধা । -া -পা -পধা -া I -পা -া -া পা । না -া নর্সা -নধা I
তী০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ এ ই আ স০ ০০

I ধর্সা নধা পা ধা । পা মা গমা গরা I রমা গমা রগা সরা । -া সা সরা -াসা IIII
রে০ ০০ র ক র গো গ০ ০০ তি০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০০ ০০

অষ্টক গান

জেলের মেয়ে

তাল: কাহারবা

তুমি শুন হে ঋষি, আমি চির উদাসী

কেন জীবনের এই জলসাঘরে

শুনি ওপারে বাঁশি॥

আমার দেশে হীরের চেয়ে ওগো জিরের দাম বেশি

কত লাখ কামনায়, বোঝাই আমার নৌকা গো

ওকি ও হারে আমার নৌকায় পার করি না সন্ন্যাসী।

করবো না পার, যাও মুনিবর

যে ঘাটে খুশি॥

সা রা II গমা গরা পা পমা । ধপা মগা -া -া I -া -া সা রা । গমা গরা পা মা I
তু মি শু০ ন০ হে ঋ০ ষি০ ০০ ০ ০ ০ ০ আ মি চি০ র০ উ দা

I ধপা মগা -া -া । -া -া গা গধা I ধা -া ধণা ধপা । -া না না র্সনা I
সী০ ০০ ০ ০ ০ ০ কে ন০ জী ০ ব০ ০০ ০ ০ নের এই

I ধনা ধনা ধা পা । ধণা ধপা ধা ণা I ধা ণধা পা -া । পণা ধণা পধা পমা I
জ০ ০ল সা ০ ঘ০ রে০ শো ন ও ০০ পা ০ ০০ ০০ রের বাঁ০

I গা -া মা -া । গমা গরা সা রা I গা মগা রা রপা । পা ধপা মা পমা I
শি ০ ০ ০ ০০ ০০ শো ন ও ০০ পা ০০ রে ০র বাঁ ০০

I গা -া -া -া । -া -া -া -া II
শি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

মিউজিক:

I র্সঃগাঃ র্সঃগাঃ র্সা -া । নর্সা নর্সা ধণা ধপা I ধঃগাঃ ধঃগাঃ ধা -া । পধা পধা পধা পমা I

I পাঃ -াঃ পাঃ -াঃ । মা গা রা পা I মা ধা পা মগা । -া -া -া -া I

Dhaka University Institutional Repository

II গা -া গা মা । রমা গরা সা -রা I -া [গ]পা -া পা । ধণা ধপা ধা ণা I
আ ০ মা র দে০ ০০ শে ০ ০ হী ০ রের চে০ য়ে০ ও গো

I ধণা ধপা পা -া । পণা ধা পমা গা I গা -া মা পা । মা -া গা রা I
জি০ ০০ ০ রের দা০ ম বে০ ০ শি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I রগা রগা -া -া । -া -া পা ধা I ধা র্সা র্সা ধা । র্সা -া র্সা র্সা I
০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ক ত লা খ কা ম না য় বো ঝাই

I র্রা র্মা র্গা র্রা । র্সর্রা র্সনা র্সনা ধপা I না না র্সা র্রা । র্সা না ধা পা I
আ ০ মা র নৌ০ ০০ কা০ ০য় গো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I না -া র্সর্রা র্সর্রা । নর্সা ধনা -া -া I -া -া -া -া । -া -া পা পা I
০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও কি

I ধণা ধপা ধণা ধণা। পধা মপা গমা গরা I গা -া গা -া । মা -া পা -া I
ও০ ০০ হা০ রে০ আ০ মার নৌ০ কায় পা র ক ০ রি ০ না ০

I -া না [র্স]না ধা । ধর্সা নর্সা ধণা ধপা I পণা ধণা পধা পমা। গপা মগা রসা সরা I
০ সন্ না ০ সী০ ০০ ০০ ০০ ক০ ০০ ০র বো০ না০ ০০ পা০ ০র

I -া গা পা পা । ধা নপা পধা [র্স]না I ধপা ধা পা মা । গমা গরা রমা গমা I
০ যা ও মু নি ০০ ব০ ০ ০র যে ০ ঘা টে০ ০০ খু০ ০০

I রগা সরা রা সা । রা সা -া -া IIII
শি০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

হালই(বাস্তু পূজা) গান

তাল: কাহারবা

এসো কৃষ্ণ বসো কাছে, কও সে জন্মের কথা গো

কও সে জন্মের কথা॥

জন্ম আমার মথুরাতে দৈবকের ও ঘরে গো

দৈবকের ও ঘরে॥

বসুদেব রাখিয়া গেলেন নন্দ ঘোষের ঘরে গো

নন্দ ঘোষের ঘরে॥

নন্দ গেলেন বাতানেতে (গরু রাখার স্থান) যশোদা গেলেন ঘাটে গো

যশোদা গেলেন ঘাটে॥

আমরা তো সব রাখাল ছেলে হাতে সোনার লাঠি গো

হাতে সোনার লাঠি॥

গান গা'বো আর কতই গা'বো গাচ্ছি (গান গাওয়া) বাড়ি বাড়ি গো

গাচ্ছি বাড়ি বাড়ি॥

বাস্তের নামে যা দেবেন তা আনেন তাড়াতাড়ি গো

আনেন তাড়াতাড়ি॥

II গা -া পা -া । পা ধা না র্সা I ধ র্সা না ধা পা । পা গা গা মা I
এ ০ সো ০ কৃ ষ্ ণ ০ ব ০ সো ০ কা ০ ছে ০

I র মা গা রা সা । রা -া গা রা I মা -া গা -া । পা ধা পা মা I
০ ০ কও্ সে জ ন্ মে র ক ০ থা ০ গো ০ ০ ০

I গা রা সা সা । রা -া গা রা I মা -া গা -া । -া -া -া -া II
০ ০ কও সে জ ন্ মে র ক ০ থা ০ ০ ০ ০ ০

II গা -া পা -া । পা ধা না র্সা I ধ র্সা না ধা পা । পা গা গা মা I
জ ন্ ম ০ আ ০ মা র ম ০ থু ০ রা ০ তে ০

I [র]মা গা রা সা । রা -া গা রা I মা -া গা -া । পা ধা পা মা I
০ ০ দৈ ব্ কে ০ র ০ ঘ ০ রে ০ গো ০ ০ ০

I গা রা সা সা । রা -া গা রা I মা -া গা -া । -া -া -া -া II
০ ০ দৈ ব কে ০ র ০ ঘ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

II গা -া পা -া । পা ধা না র্সা I [ধ]র্সা না ধা পা । পা গা গা মা I
ব ০ সু ০ দে ব রা ০ খি ০ য়া ০ গে ০ লে ০

I [র]মা গা রা সা । রা -া গা রা I মা -া গা -া । পা ধা পা মা I
০ ন নন্ দ ঘো ০ ষে র ঘ ০ রে ০ গো ০ ০ ০

I গা রা সা সা । রা -া গা রা I মা -া গা -া । -া -া -া -া II
০ ০ নন্ দ ঘো ০ ষে র ঘ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

II গা পা পা -া । পা ধা না র্সা I [ধ]র্সা না ধা পা । পা গা গা মা I
ন ন্ দ ০ গে ০ লে ন বা ০ তা ০ নে ০ তে ০

I [র]মা গা রা সা । রা -া গা রা I মা -া গা -া । পা ধা পা মা I
০ ০ যশো দা গে ০ লে ন ঘা ০ টে ০ গো ০ ০ ০

I গা রা সা সা । রা -া গা রা I মা -া গা -া । -া -া -া -া II
০ ০ যশো দা গে ০ লে ন ঘা ০ টে ০ ০ ০ ০ ০

II গা পা পা -া । পা ধা না র্সা I [ধ]র্সা না ধা পা । পা গা গা মা I
আ ম রা ০ তো ০ স ব রা ০ খা ল ছে ০ লে ০

I [র]মা গা রা সা । রা -া গা রা I মা -া গা -া । পা ধা পা মা I
০ ০ হা তে সো ০ না র লা ০ ঠি ০ গো ০ ০ ০

I গা রা সা সা । রা -া গা রা I মা -া গা -া । -া -া -া -া II
০ ০ হা তে সো ০ না র লা ০ ঠি ০ ০ ০ ০ ০

II গা পা পা -া । পা ধা না র্সা I [ধ]র্সা না ধা পা । পা গা গা মা I
গা ন গা ০ বো ০ আ র ক ০ ত ই গা ০ বো ০

I [র]মা গা রা সা । রা -া গা রা I মা -া গা -া । পা ধা পা মা I
০ ০ গাচ্ ছি বা ০ ড়ি ০ বা ০ ড়ি ০ গো ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

I গা রা সা সা । রা -া গা রা I মা -া গা -া । -া -া -া -া II
০ ০ গাচ্ ছি বা ০ ড়ি ০ বা ০ ড়ি ০ ০ ০ ০ ০

II গা পা পা -া । পা ধা না র্সা I ধর্সা না ধা পা । পা গা গা মা I
বা স্ তে র না ০ মে ০ যা ০ দে ০ বে ন তা ০

I র্মা গা রা সা । রা -া গা রা I মা -া গা -া । পা ধা পা মা I
০ ০ আ নেন্ তা ০ ড়া ০ তা ০ ড়ি ০ গো ০ ০ ০

I গা রা সা সা । রা -া গা রা I মা -া গা -া । া -া -া -া IIII
০ ০ আ নেন্ তা ০ ড়া ০ তা ০ ড়ি ০ গো ০ ০ ০

বাউল গান

তাল: কাহারবা

দেহের মাঝে ফুল ফুটেছে, রাসূল আমার হাল ধরেছে
ভব মায়া দূরে গেছে, চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে॥

মন আকারে আছেন যিনি, রূপের মাঝে অরূপ তিনি
কি প্রকারে তারে চিনি, রংমহল যে গড়েছে॥

রাসূলের দেখা নাহি পেলে, কি রূপেতে প্রেমিক হলে
গুরু প্রেমে রাসূল মেলে, সাদি'র মনে ঘুন ধরেছে॥

II পা মজ্ঞা পমা জ্ঞা । -া রা সা -া I সা -া সা -া । -া সা সা -া I
দে হে০ ০০ র ০ মা ০ ঝে ফু ল ফু ০ ০ টে ছে ০

I -া -া -া সা । জ্ঞা রা জ্ঞা রা I সা -া সা সা । রা সা ন্‌া -া I
০ ০ ০ রা ছুল আ মা ০ র ০ হা ল ধ রে ছে ০

I -া -া -া সা । গা গা মা -া I মা পা -া -া । -া পা পা র্সা I
০ ০ ০ ভ ব মা য়া ০ দূ রে ০ ০ ০ গে ছে ০

I র্সা (র্স)ণা (র্র)র্সা ণা । -া ধা পা পা I (ম)জ্ঞা -া জ্ঞা -া । -া মা পা -া II
চাঁ দে ০ র ০ গা ০ য়ে চাঁ দ লে ০ ০ গে ছে ০

II -া -া -া মা । (ম)পা (প)না না -া I -া -া র্সা র্সা । না র্রা র্সা -া I
০ ০ ০ মন আ কা রে ০ ০ ০ আ ছে ন যি নি ০

I -া -া -া না । র্সা র্রা -া র্রা I র্সা ণা (র্র)র্সা ণা । -া ধা পা -া I
০ ০ ০ রূ পের্ মা ০ ঝে অ ০ রূ ০ প তি নি ০

Dhaka University Institutional Repository

I -া -া -া [প]র্সা । -া র্সা -া র্সা I ণা -া ণা ধা । পা দা -া -া I
ও ও ও কি প্র কা ও রে তা ও রে ও ও চি নি ও

I -া -া গা গা । মা পা ণা পা I মা জ্ঞা [প]মা জ্ঞা । -া রা সা -া II
ও ও র ঙ্ মহ ও ল যে ও গ ও ও ড়ে ছে ও

II -া -া মা মা । [ম]পা [প]না না -া I -া -া র্সা র্সা । না র্রা র্সা -া I
ও ও রা সূ লের দে খা ও ও ও না হি ও পে লে ও

I -া -া -া না । র্সা র্রা -া র্রা I র্সা ণা [র্র]র্সা ণা । -া ধা পা -া I
ও ও ও কি রূ পে ও তে প্রে ও মি ও ক হ লে ও

I -া -া -া [প]র্সা । -া র্সা -া র্সা I ণা -া ণা ধা । পা দা পা -া I
ও ও ও গু রু প্রে ও মে রা ও ছু ও ল মে লে ও

I -া -া -া গা । মা পা ণা পা I মা জ্ঞা [প]মা জ্ঞা । -া রা সা -া IIII
ও ও ও সা দির্ ম ও নে ঘু ন ধ ও ও রে ছে ও

পরিশিষ্ট– ৪

সাক্ষাৎকার

১. অনন্ত দেবনাথ : পিতা: স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ দেবনাথ, মাতা: স্বর্গীয় রাধারাণী দেবনাথ, স্ত্রী: সবিতা রানী দেবনাথ, পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ জন, সন্তান: ৪ জন, ১ মেয়ে, ৩ ছেলে। বয়স: ৫৮ বৎসর, পেশা: কৃষি ও ব্যবসা, গ্রাম: গাঙড়া, পো.+থানা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর। লোকসংস্কৃতির ধারার মধ্যে যাত্রাগান একটি অন্যতম ধারা। এই ধারার সাথে তিনি ৩০ বৎসর যাবৎ জড়িত আছেন। যাত্রাগানের নিয়মিত শিল্পী হিসেবে অগণিত পালায় অভিনয় করেছেন। নায়ক, সহনায়ক সহ বিভিন্ন চরিত্রেঅভিনয় করেছেন। অভিনয় করেছেন সব সময় প্রতিবাদী চরিত্রে। জনপ্রিয় অভিনীত পালা 'একমুঠো অন্ন চায়'। তার জীবদ্দশায় রয়েছে অসংখ্য সম্মাননা-পদক।

২. অসীম বিশ্বাস : পিতা: পাগল চান বিশ্বাস, মাতা: পাঁচী বিশ্বাস, জন্ম: ৪৮ বৎসর, বৈবাহিক অবস্থান: বিবাহিত, পেশা: কৃষি, গ্রাম: রামনগর চর, পো: ফতেপুর, থানা: কোতয়ালী, জেলা: যশোর, কাঠি বাদ্যযন্ত্র স্রষ্টা।

৩. অচিন্ত কুমার দত্ত : পিতা: মৃত নিত্য গোপাল দত্ত, মাতা: মৃত প্রভাবতী দত্ত, বয়স: ৫৮ বৎসর, পেশা: কৃষি, গ্রাম: পারখাজুরা, পো: পারখাজুরা, থানা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর। লোকসংস্কৃতির ধারায় কীর্তন গান লোকসংগীতের আদিরূপ। এই গানের সাথে তিনি ৩৫-৪০ বৎসর যাবৎ জড়িত আছেন।

৪. অশ্বিনী বৈরাগী : পিতা: স্বর্গীয় অজিত কুমার বৈরাগী, মাতা: স্বর্গীয় বিমলা বৈরাগী, বয়স: ৫২ বৎসর, গ্রাম: কোয়েল বাড়ি, নড়াইল, পেশা: কৃষি, কীর্তন, মতুয়া, হালই, বালা, ফলই গান পরিবেশন করে থাকেন।

৫. অলোক কুমার বসু : পিতা: অজিত কুমার বসু, মাতা: মলিনা রানী বসু, জন্ম: ৩০/১১/১৯৭৮ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ জন, গ্রাম: অনন্ত সড়ক, সাহাপাড়া, পো. + থানা: কেশবপুর, জেলা: যশোর। পেশা: শিক্ষকতা (সংগীত) তার নিজস্ব একটি সংগঠন রয়েছে। নাম মধুসূদন সংগীতালয়। বর্তমানে তিনি সাংবাদিকতার

Dhaka University Institutional Repository

সাথে জড়িত রয়েছেন। রচনা করেছেন লোক ধারার গানসহ বিভিন্ন ধরনের গান। সংগীতের সাথে জড়িত রয়েছেন ৩০ বৎসর যাবৎ। যন্ত্রসংগীতে তার রয়েছে অসামান্য দক্ষতা।

৬. শ্রী আনন্দ মোহন দত্ত : পিতা: মৃত বিমল কৃষ্ণ দত্ত, মাতা: শান্তি বালা দত্ত, বয়স: ৫০ বৎসর, পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭ জন। পেশা: কৃষি ও ব্যাবসা, গ্রাম: পারখাজুরা, পো. পারখাজুরা, থানা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর। লোকসংস্কৃতির মধ্যে বালা গান ও অষ্টক গান দু'টি লোকসংগীতে নতুন মাত্রার সৃষ্টি করেছে। এই গানগুলোর সাথে তিনি প্রায় ৩৩ বৎসর যাবৎ জড়িত আছেন।

৭. উৎপল মজুমদার বাচ্চু : পিতা: রাজকুমার মজুমদার, মাতা: অনিমা মজুমদার, বয়স: ৪৮ বৎসর, পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ জন। পেশা: ব্যাবসা, গ্রাম: হাকোবা, পো.+ থানা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর। তিনি বালা ও অষ্টক গানের শিল্পী। তিনি এই অঞ্চলের যশস্বী বালা ও অষ্টক শিল্পী রামপদ দাসের শিষ্য।

৮. কনক রঞ্জন দাম : পিতা: জিতেন্দ্রনাথ দাম, মাতা: মাধুরীলতা দাম, জন্ম: ১২/০৮/১৯৭৫, বৈবাহিক অবস্থান: বিবাহিত, পেশা: শিক্ষক, গ্রাম: রামনগর চর, পো. আকদিয়া শিমুলিয়া, থানা: নড়াইল সদর, তিনি আঞ্চলিক গান, বালা গান, হালইগান, হরি সংগীত এখনও পরিবেশন করে থাকেন।

৯. গনেশ কুণ্ডু : পিতা: সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, মাতা: হরিদাসী কুণ্ডু, স্ত্রী: নীলিমা রানী কুণ্ডু, পেশা: ব্যবসা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন।গ্রাম: হাকোবা, পো.+ থানা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর। বাংলাদেশের অন্যতম যাত্রাদল প্রতিমা অপেরার কর্ণধার।

১০. গিরীন্দ্র নাথ বিশ্বাস : পিতা: গৌরপদ বিশ্বাস, মাতা: রেবতী বিশ্বাস, জন্ম: ১৯৫০ সাল, পেশা: শিক্ষক (অবসর প্রাপ্ত), পারিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ জন, গ্রাম: বামনাইল, পো. টিকারী, থানা: ঝিনাইদহ, জেলা: ঝিনাইদহ। যাত্রাভিনেতা হিসেবে মঞ্চে কাজ করেছেন অনেক বছর। সম্মাননাও পেয়েছেন অনেক। তবে তার মতে সবথেকে বড় সম্মাননা সরাসরি দর্শকের অভিমত প্রকাশ। তিনি একাধারে

রচয়িতা, নির্দেশক ও পরিচালক হিসেবে আজও যাত্রা এবং নাটকের মঞ্চে সমান ভাবে সমাদৃত। অভিনয় করেছেন ৫০ ঊর্ধ্ব যাত্রাপালায়। এর মধ্যে অভিনীত উল্লেখযোগ্য যাত্রাপালা— নবরাত্র, অকালের দেশ, সতীর ঘাট, বেলোয়াড়ী ঝাড়, সিরাজউদ্দৌলা, গলি থেকে রাজপথ, চণ্ডীতলার মন্দির, কারবালার কান্না প্রভৃতি।

১১.গণেশ বিশ্বাস : পিতা: জিতেন বিশ্বাস, মাতা: সবিতা বিশ্বাস, গ্রাম: নাওলি, পো. ঢাকুরিয়া, থানা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর। পেশা: ব্যবসা, যাত্রাগানের কমেডি চরিত্রে অভিনয় করেছেন সারা জীবন। পেয়েছেন সম্মাননা স্বরূপ পুরস্কার।

১২. চাঁপা রানী দে : স্বামী: বিপুল দে, পিতা: মৃত অজিত কুমার পাল, মাতা: মৃত গুরুদাসী পাল, বয়স: ৫৮ বৎসর, পেশা: গৃহিনী, গ্রাম: পারখাজুরা, পো. পারখাজুরা, থানা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর। লোকসংস্কৃতির ধারার মধ্যে ভাটি পূজার গান, জাগগান, এ্যাঁচড়া পূজার গান। এই গানগুলোর সাথে তিনি ৩৫-৪০ বৎসর যাবৎ জড়িত আছেন।

১৩. জ্যোৎস্না রানী দাস : স্বামী: স্বর্গীয় নারায়ণ চন্দ্র দাস, পিতা: স্বর্গীয় জিতেন্দ্রনাথ ঘটক, মাতা: স্বর্গীয় শুভদ্রা ঘটক, বয়স: ৭০ বৎসর, পেশা: যাত্রাগান, ১৬ বৎসর বয়স থেকে যাত্রাপালায় অভিনয় শুরু করেন। গ্রাম: হাকোবা, পো.+থানা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর। যাত্রাগানের সাথে তিনি ৪০ বৎসর যাবৎ জড়িত আছেন। নায়িকা হিসেবে অগণিত পালায় অভিনয় করেছেন। তার জীবদ্দশায় রয়েছে অসংখ্য সম্মাননা-পদক। প্রথম অভিনয় করেন রয়েল বীনাপাণী অপেরা, এরপর বাবুল অপেরা, প্রতিমা অপেরা, তুষার অপেরাসহ অনেকগুলো অপেরায় কাজ করেছেন এই গুণী শিল্পী।

১৪. জিতেন্দ্রনাথ দাম : পিতা: শ্রী গিরিশ চন্দ্র দাম, মাতা: শ্রীমতি যশোদাময়ী দাম, জন্ম: বাংলা ১৩৪৪ সাল, গ্রাম: রামনগর চর, পো. আকদিয়া শিমুলিয়া, থানা: নড়াইল সদর, পেশা: শিক্ষকতা। তিনি লোকগান যেমন: হালই, বালা, মতুয়া, ও পল্লীগীতি রচয়িতা।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. শ্রীমতি তৃপ্তি শিকদার : স্বামী: সুপ্রীতি রঞ্জন শিকদার, পিতা: স্বর্গীয় কৃষ্ণপদ মন্ডল, মাতা: স্বর্গীয় আয়নামতি মন্ডল, বয়স: ৪৬ বৎসর, পেশা: গৃহিণী, গ্রাম: বামনাইল, পো. টিকারী, থানা: ঝিনাইদহ, জেলা: ঝিনাইদহ।

১৬. শ্রী তপন সরকার : পিতা: স্বর্গীয় মনীন্দ্রনাথ সরকার, মাতা: শৈলবালা সরকার, পেশা: যাত্রাগান, গ্রাম+পো.+থানা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর। যাত্রাগানের সাথে তিনি ৪০ বৎসর যাবৎ জড়িত আছেন। যাত্রাগানের নিয়মিত শিল্পী হিসেবে অগণিত পালায় নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তার জীবদ্দশায় রয়েছে অনেক সম্মাননা-পদক।

১৭. ত্রিনাথ চন্দ্র বিশ্বাস : পিতা: সতীশ চন্দ্র বিশ্বাস, মাতা: গীতা রানী বিশ্বাস, জন্ম: ১৬/০৬/৬৯, পেশা: কৃষি, গ্রাম: রামনগর চর, পো. ফতেপুর, থানা: কোতয়ালী, জেলা: যশোর, লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারার গানের সাথে তিনি বহুবৎসর যাবৎ জড়িত আছেন। নাম কীর্তন, অষ্টক গান, যাত্রাগান, বালা গান, হালই গান প্রভৃতি গান তিনি গেয়েছেন।

১৮. দেবব্রত সরকার : পিতা: আকুল সরকার, মাতা: সবিতা সরকার, জন্ম: ১১/১০/১৯৮২,গোবরা, নড়াইল, তিনভাই বোনের মধ্যে সবার বড় তিনি, বৈবাহিক অবস্থান: বিবাহিত, পেশা: স্কুল শিক্ষক। ধর্মীয় গান পরিবেশনের পাশাপাশি তিনি মৃদঙ্গও বাজান।

১৯. দীপক কুমার বিশ্বাস : পিতা: স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মাতা: ডাগী রানী বিশ্বাস, বয়স: ৫০ বছর, গ্রাম: বামনাইল, পো. মুনুড়িয়া, থানা+জেলা: ঝিনাইদহ, পেশা: কৃষি। কৈশোরে তিনি অষ্টকগান পরিবেশন করতেন বলে আলাপচারিতায় জানিয়েছেন। তৎপরবর্তী সময় থেকে তিনি অষ্টক গানের মাস্টার হিসেবে পালা পরিচালনা করে চলেছেন। গবেষণাকর্মে অষ্টক গান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যসহ লিপিবদ্ধ অষ্টক পালা দিয়ে তিনি সহায়তা করেছেন।

২০. শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ মালী : পিতা: স্বর্গীয় ললিত চন্দ্র মালী, মাতা: স্বর্গীয় কালী মালী, বয়স: ৮০ বৎসর, পেশা: কৃষি, গ্রাম: রামনগর চর, পো. ফতেপুর, থানা: কোতয়ালী, জেলা: যশোর। লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারার গানের সাথে তিনি বহু বৎসর যাবৎ

জড়িত আছেন। অষ্টক, যাত্রা, হরি সংগীত, বালা গান, হালই প্রভৃতি গান তিনি একসময় গেয়েছেন।

২১. নিত্যানন্দ দাম : পিতা: জিতেন্দ্রনাথ দাম, মাতা: মাধুরী লতা দাম, জন্ম: ৩০/১২/১৯৭৯, গ্রাম: রামনগর চর, পো. আকদিয়া শিমুলিয়া, থানা: নড়াইল সদর, বৈবাহিকঅবস্থান: বিবাহিত, পেশা: শিক্ষকতা। আঞ্চলিক গান, বালা গান, হালই গান, হরি সংগীত, কবিগান তিনি পরিবেশন করে থাকেন।

২২. পীযূষ কুমার বৈরাগী : পিতা: প্রবাস চন্দ্র বৈরাগী, মাতা: ঈশ্বর পূর্ণিমা বৈরাগী, জন্ম: ৪৫ বৎসর, পেশা: কৃষি, গ্রাম: রামনগর চর, পো. ফতেপুর, থানা: কোতয়ালী, জেলা: যশোর। লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারার গানের সাথে তিনি বহুবৎসর যাবৎ জড়িত রয়েছেন। অষ্টক গান, যাত্রাগান, বালা গান, হালই গান প্রভৃতি গান তিনি পরিবেশন করেন।

২৩. পূর্ণিমা ভঞ্জ : স্বামী: পরমেশ ভঞ্জ, পিতা: সুধীর কবিরাজ, মাতা: লীলা কবিরাজ, বয়স: ৬৬ বৎসর, পেশা: যাত্রাগান, গ্রাম: পাঁজিয়া, পো.+থানা: কেশবপুর, জেলা: যশোর। যাত্রাগানের সাথে তিনি ৩০ বৎসর যাবৎ জড়িত আছেন। যাত্রাগানের এ্যামেচার শিল্পী হিসেবে অগণিত পালায় অভিনয় করেছেন। তার জীবদ্দশায় রয়েছে অসংখ্য সম্মাননা-পদক।

২৪. প্রদীপ কুমার মল্লিক : পিতা: প্রফুল্ল্য কুমার মল্লিক, মাতা: রানী মল্লিক, জন্ম: ১৫/১১/১৯৭৯, গোবরা, নড়াইল, মোট পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনি বড়, বৈবাহিক অবস্থান: বিবাহিত, পেশা: স্কুল শিক্ষক। আঞ্চলিক ও হালই গানের শিল্পী।

২৫. প্রদীপ কুমার সরকার : পিতা: স্বর্গীয় বাসীরাম সরকার, মাতা: স্বর্গীয় বিরাজ রানী সরকার, বয়স: ৭০ বৎসর, পেশা: শিক্ষকতা (অবসর প্রাপ্ত), গ্রাম: জিথোড়, পো. + থানা: ঝিনাইদহ, জেলা: ঝিনাইদহ। তিনি উক্ত অঞ্চলে অষ্টক গান, ও যাত্রাগানের সাথে জড়িত ছিলেন প্রায় ৩০ বৎসর। এসকল গানের মাস্টার হিসেবে তিনি আজও বিশেষভাবে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. মো. ফারুখ হোসেন : পিতা: মো. মুনসুর হাওলাদার, মাতা: সুন্দরী বিবি, জন্ম: ৪৮ বৎসর, গ্রাম: হাকোবা, পো. + থানা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর, বৈবাহিক অবস্থান: বিবাহিত, স্ত্রী: জাহানারা বেগম, পরিবারির সদস্যসংখ্যা: ৫জন, পেশা: ব্যাবসা, লোকসংগীত শিল্পী (প্রায় ৩৫ বৎসর তিনি সংগীতের সাথে সংযুক্ত), তিনি যশোর জেলার আঞ্চলিক গানের অনবদ্য শিল্পী।

২৭. বিমল কুমার সরদার : পিতা: মৃত কাজেম সরদার, মাতা: নিত্য বালা সরদার, জন্ম: ২৯/০৭/১৯৫৭, গ্রাম: গাংড়া, পো.+থানা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর। পরিবারের সদস্য ৮ জন। পেশা: চাকুরী। লোকসংস্কৃতির মধ্যে ভগবানিয়াসম্প্রদায়ের গান একটি অন্যতম ধারা। লোকসংগীতে এটি নতুন মাত্রার যোগসূত্র তৈরি করেছে। এই গানগুলির সাথে এবং ধর্মীয় আলোচনার সাথে তিনি ৪০ বৎসর যাবৎ জড়িত আছেন। এই ধর্ম প্রচার ও সংগীত প্রচারে তিনি নিবেদিত।

২৮. বিকাশ চন্দ্র শীল : পিতা: মৃত বিজয় কৃষ্ণ শীল, মাতা: গৌরী বালা শীল, বয়স: ৪৫ বৎসর, গ্রাম: উপশহর, থানা: সদর, জেলা: যশোর। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৯ জন। পেশা: যন্ত্রশিল্পী, লোকবাদ্যযন্ত্র দোতারা শিল্পী হিসেবে কাজ করছেন প্রায় ৩০ বৎসর। বিভিন্ন লোকধারার গানের সাথেএই বাদ্যযন্ত্র অতি সাবলীল ভাবে বাজিয়ে চলেছেন আজও।

২৯. বাটুল বিশ্বাস : পিতা: স্বর্গীয় কিরণ চন্দ্র বিশ্বাস, মাতা: বিরজা রানী বিশ্বাস, বয়স: ৭৫ বছর (প্রায়), গ্রাম: বামনাইল, পো. মুনুড়িয়া, থানা+ জেলা: ঝিনাইদহ, পেশা:কৃষি। অষ্টক এবং যাত্রাপালায় কমেডি চরিত্রে যশস্বী অভিনেতা হিসেবে খ্যাত। আলাপচারিতায় কৈশোর ও যৌবনে বিভিন্ন পালায় অভিনীত চরিত্রের সাবলীল বর্ণনা দিয়ে আকৃষ্ট করেছেন যা আমৃত্যু মনে রাখার মতো।

৩০. বিকাশ কুমার মণ্ডল : পিতা: কুমারেশ মণ্ডল, মাতা: দেবী মণ্ডল, বয়স: ৫৭ বছর, গ্রাম: বামনাইল, পো. মুনুড়িয়া, থানা+ জেলা: ঝিনাইদহ, পেশা: কৃষি। অষ্টক গানের শিল্পী হিসেবে যাত্রা শুরু করে পরবর্তীতে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সংগঠক হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেন। এখনো অষ্টক দল পরিচালনা করে চলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. মনোরঞ্জন অধিকারী : পিতা: স্বর্গীয় পঞ্চানন অধিকারী, মাতা: স্বর্গীয় চপলা অধিকারী, বয়স: ৬৫ বৎসর, পেশা: কীর্তন গান, গ্রাম: মূলগ্রাম, পো. নতুন মূলগ্রাম, থানা: কেশবপুর, জেলা: যশোর, লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারার মধ্যে কীর্তন গান একটি ধারা এই ধারার সাথে তিনি ৩০ বৎসর যাবৎ জড়িত আছেন। কীর্তন, অষ্টক গান, পালা কীর্তন, বালা গান প্রভৃতি ধারার লোকগান তিনি গেয়েছেন এবং আজও পরিবেশন করে চলেছেন। বালা গানের শ্লোক রচয়িতা হিসেবে তিনি আজও সুপরিচিত।

৩২. মো. মনিরুদ্দিন মোড়ল: পিতা: মো. রহিম বক্স মোড়ল, মাতা: আমেনা খাতুন , স্ত্রী: জহুরা খাতুন, বয়স: ৭৫ বৎসর, পেশা: জারিগান, গ্রাম: গাংড়া, পো. + থানা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮ জন। লোকসংস্কৃতির ধারার মধ্যে জারিগান একটি অন্যতম ধারা। এই ধারার সাথে তিনি ৪৫ বৎসর যাবৎ জড়িত আছেন। মসলেম বয়াতির পর জীবিত জারি শিল্পী হিসেবে এক জনই জীবিত আছেন তিনিই মনিরুদ্দি বয়াতি।

৩৩. মতলেব ফকির : পিতা: আব্দুর রশিদ বিশ্বাস, মাতা: আনোয়ারা খাতুন, গ্রাম: লেবুতলা, থানা: খাজুরা, জেলা: যশোর। লোকগান পরিবেশন করে জীবন ধারণ করছেন আজ প্রায় ৪০-৪৫ বৎসর যাবৎ। পাঞ্জু শাহ্, দুদ্দু শাহ, পাগলা কানাই'র গান তিনি সংগ্রহ করেছেন ছোটো বেলা থেকে। অসংখ্য গান তার সংগ্রহে রয়েছে। স্বশিক্ষিত হওয়ায় সব গান তার মনের ডাইরিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে বলে তিনি আলাপচারিতায় প্রকাশ করেন।

৩৪. রণজিৎ দেবনাথ : পিতা: সুধীর দেবনাথ, মাতা: লীলা কবিরাজ, বয়স: ৬৫ বৎসর, পেশা: যাত্রাগান, গ্রাম: পাঁজিয়া, পো.+থানা: কেশবপুর, জেলা: যশোর। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। যাত্রাগানের গুরু অমলেন্দু বিশ্বাস, তুষার দাসগুপ্ত। যাত্রাগানের সাথে তিনি ৪০ বৎসর যাবৎ জড়িত রয়েছেন। নিয়মিত শিল্পী হিসেবে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অগণিত যাত্রাপালায়। এখনও অভিনয় করে চলেছেন। তার জীবদ্দশায় রয়েছে অসংখ্য পদক।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. শান্তি বিশ্বাস : স্বামী: নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস, বয়স: ৪০ বৎসর, পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১৪ জন। পেশা: গৃহিণী, গ্রাম: গাঙড়া, পো. মনিরামপুর, থানা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর। ধর্মীয় সংগীত পরিবেশন করছেন প্রায় ২০–২২ বৎসর।

৩৬. সুপ্রীতি রঞ্জন শিকদার: পিতা: স্বর্গীয় সুধন্য শিকদার, মাতা: স্বর্গীয় শ্রীমতি শিকদার, বয়স: ৫৩ বৎসর, গ্রাম: বামনাইল, পো. টিকারী, থানা: ঝিনাইদহ, জেলা: ঝিনাইদহ। পরিবারের সদস্য সংখ্য: ৪ জন, পেশা: শিক্ষকতা। বিশিষ্ট লোকসংগীত সংগ্রাহক। তিনি মাঠপর্যায়ে গান সংগ্রহ এবং আলোচনায় সহযোগিতা করেন।

৩৭. স্বপন চক্রবর্তী : পিতা: স্বর্গীয় তারাপদ চক্রবর্তী, মাতা: মৃত শান্তিলতা চক্রবর্তী, বয়স: ৬৩ বৎসর, পো. নতুন মূলগ্রাম, থানা: কেশবপুর, জেলা: যশোর। পেশা: কীর্তন গান, লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারার মধ্যে কীর্তন গান অন্যতম। এই ধারার সাথে তিনি ৩০ বৎসর যাবৎ জড়িত আছেন। নাম কীর্তন, অষ্টক গান, পালা কীর্তন, রামায়ণ গান প্রভৃতি ধারার লোকগান তিনি গেয়েছেন। তার সৃষ্ট কীর্তন দল গীতগোবিন্দ সম্প্রদায়।

৩৮. সন্ন্যাসী বিশ্বাস : পিতা: মন্মথ বিশ্বাস, মাতা: চিনি বিশ্বাস, বয়স: ৭০ বছর, গ্রাম: শিকারপুর, পো. মুনুড়িয়া, থানা+ জেলা: ঝিনাইদহ, পেশা: শিক্ষকতা (অবসর প্রাপ্ত)।